পরমেশ্বর ! আমি দেবর্ষি নারদ, দেবল, শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন এবং পিতামহ ভীষ্মের কাছে আপনার মাহাত্ম্য জ্ঞান লাভ করেছি। সমস্ত জগৎ আপনাতেই ওতপ্রোত। আপনিই মানুষের একমাত্র অধীশ্বর। জনার্দন ! আপনি কৃপা করে আমাকে যে উপদেশ দিয়েছেন, আমি তা যথাসাধ্য পালন করব। আমাদের মঙ্গলের জন্য আপনি নানা অদ্ভুত কাজ করেছেন এবং ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুর্যোধন যুদ্ধে বধ হয়েছে। কৌরব সেনাদের আপনি নিজ তেজে ভস্ম করেছেন, সেইজন্য আমরা যুদ্ধে বিজয়লাভ করতে পেরেছি। আপনি এমন সব উপায় করেছিলেন, যার জন্য আমাদের জয়লাভ সম্ভব হয়েছিল। দুর্যোধনের সঙ্গে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন আপনার বুদ্ধি এবং আপনার প্রদত্ত শক্তিতে আমাদের জয় হয়েছিল। কর্ণ, পাপী জয়দ্রথ এবং ভূরিশ্রবাকে বধের সঠিক উপায় আপনি জানিয়েছিলেন ; সুতরাং দেবকীনন্দন ! আপনি প্রেমবশত আমাকে যেসব উপদেশ দিয়েছেন, তা আমি অবশ্যই পালন করব। আপনার কোনো কিছু চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। আপনি যদি দ্বারকায় যেতে চান তবে যেতে পারেন, তাতে আমার সম্মতি আছে। ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে আমিও আপনার যাওয়ার কথা বলব। এবার আপনি শীঘ্রই মামা এবং অজেয় বীর বলভদ্র ও অন্যান্য বৃষ্ণীবংশীয় বীরদের সাক্ষাৎ লাভ করবেন।'

এইরূপ কথাবার্তা বলতে বলতে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়ে হস্তিনাপুরে গিয়ে পৌঁছলেন। তাঁরা নগরে প্রবেশ করতেই সেখানকারী নরনারী উল্লসিত হয়ে উঠল। তারপর ইন্দ্রমহলের ন্যায় শোভাযুক্ত রাজমহলে তাঁরা দুজনে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, বুদ্ধিমান বিদুর, রাজা যুধিষ্ঠির, দুর্ধর্ষ বীর ভীমসেন, মাদ্রীনন্দন নকুল ও সহদেব, ধৃতরাষ্ট্রের সেবায় তৎপর অপরাজিত বীর যুযুৎসু, বুদ্ধিমতী গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা প্রভৃতি ভরত বংশীয় সকল নারী-পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। সর্বপ্রথম রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন নিজেদের নাম বলে তাঁর চরণ স্পর্শ করলেন। তারপর গান্ধারী, কুন্তী, যুধিষ্ঠির এবং ভীমসেনের পদস্পর্শ করলেন। বিদুরের কাছে গিয়ে কুশল সমাচার নিলেন। কিছুক্ষণ সকলের সঙ্গে বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে বসলেন। পরে রাত্রি সমাগত হলে বুদ্ধিমান রাজা ধৃতরাষ্ট্র কৌরবদের এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিজ নিজ স্থানে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। রাজার নির্দেশে সকলে নিজ নিজ মহলে ফিরে এলেন। মহাপরাক্রমী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সঙ্গে তাঁর মহলে গেলেন। সেখানে তাঁদের বিধিসম্মতভাবে আদর-আপ্যায়ন করা হলে তাঁরা আহারাদি করে দুজনে একত্রে শয়ন করলেন। রাত্রি প্রভাত হলে তাঁরা দুজনে প্রাতের ক্রিয়াদি এবং সন্ধ্যা-বন্দনা করে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মহলে গেলেন, তিনি সেখানে মন্ত্রীদের সঙ্গে উপবেশন করেছিলেন। সেই সুন্দর ভবনে প্রবেশ করে দুই মহাত্মা ধর্মরাজকে দর্শন করলেন। তাঁরা আসায় মহারাজ যুধিষ্ঠির অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। ধর্মরাজ অনুমতি দিলে তাঁরা দুজন উত্তম আসনে উপবেশন করলেন। রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি এঁদের দুজনকে দেখেই অনুমান করলেন যে এঁরা কিছু বলতে চান। তাই তিনি বললেন—'বীরবরগণ ! মনে হচ্ছে তোমরা আমাকে কিছু বলতে চাও ! যা বলার আছে বলো। আমি নিশ্চয়ই তা পূর্ণ করব। তোমরা মনে কোনো চিন্তা কোরো না।'

তাঁর কথা শুনে বাকপটু অর্জুন ধর্মরাজের কাছে গিয়ে অত্যন্ত বিনীতভাবে বললেন—'রাজন্ ! মহাপ্রতাপশালী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে অনেক দিন ধরে রয়েছেন। এখন তিনি আপনার অনুমতি নিয়ে তাঁর পিতাকে দর্শন করতে যেতে চান। আপনি সানন্দে অনুমতি দিন। তাহলে তিনি দ্বারকাপুরী যেতে পারেন। আমার অনুরোধ আপনি ওঁকে যাওয়ার অনুমতি দিন।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'মধুসূদন ! আপনার কল্যাণ হোক। আপনি শূরনন্দন বসুদেবকে দর্শন করার জন্য আজই দ্বারকায় যাত্রা করুন। মহাবাহু ! আপনার এই যাত্রায় আমার পূর্ণ সম্মতি আছে। আপনি আমার মাতুল এবং দেবকী দেবীকে বহুদিন দেখেননি ; সুতরাং সেখানে গিয়ে সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে মাতুলকে আমার প্রণাম জানিয়ে, ভ্রাতা বলরামকেও নমস্কার জানাবেন। ভক্তকে মান প্রদানকারী শ্রীকৃষ্ণ ! দ্বারকায় গিয়ে আপনি ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেবের সঙ্গে আমাকেও সর্বদা স্মরণে রাখবেন। জনার্দন ! আনর্ত দেশের প্রজা, আপনার মাতাপিতা এবং বৃষ্ণিবংশীয় আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে পুনরায় আমার অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় পদার্পণ করবেন। এই নানাপ্রকার বস্ত্র, ধন ও অন্যান্য বস্তু যা আপনার পছন্দ, সঙ্গে নিয়ে যান। কেশব ! আপনার কৃপাতেই আমাদের শত্রু নিধন হয়েছে

এবং সমগ্র পৃথিবী আমাদের হস্তগত হয়েছে (অতএব এসবই আপনার)।'

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা বলায় পুরুষ শ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'মহাবাহো ! এই রত্ন, ধন এবং সমগ্র পৃথিবী, সবই শুধু আপনার। শুধু তাই নয়, আমার গৃহেও যা ধন-বৈভব আছে, তা-ও আপনারই বলে জানবেন।' তিনি এই কথা বলায় যুধিষ্ঠির 'মহানুভব' বলে তাঁর কথাকে সম্মান জানালেন। এরপর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিসিমাতা কুন্তীর কাছে গিয়ে কথাবার্তা বললেন এবং তাঁর কাছ থেকে যথোচিত আপ্যায়ন পেয়ে তাঁকে প্রণাম এবং প্রদক্ষিণ করে বিদুর ও অন্যান্য সকলের কাছে সম্মান সহকারে বিদায় নিয়ে যুধিষ্ঠির ও কুন্তীর অনুমতি নিয়ে সুভদ্রাকে সঙ্গে করে তাঁর দিব্য রথে আরোহণপূর্বক হস্তিনাপুর থেকে রওনা হলেন। সেই সময় নগরবাসীগণ তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছিল। কপিধ্বজ অর্জুন, সাত্যকি, নকুল, সহদেব, অগাধ বুদ্ধিসম্পন্ন বিদুর এবং গজরাজের ন্যায় পরাক্রমী ভীম—এঁরা সকলেই কিছুদূর পর্যন্ত তাঁর পিছন পিছন গেলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ সব কৌরবদের ফিরে যেতে বলে দারুক ও সাত্যকিকে বললেন—'এবার রথ জোরে চালাও।'

পথে শ্রীকৃষ্ণের কাছে কৌরবদের বিনাশের কথা শুনে উত্তঙ্ক মুনির কুপিত হওয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের তাঁকে শান্ত করে নিজ অধ্যাত্মজ্ঞান বর্ণনা করা

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা যাওয়ার সময় সকল পাণ্ডব তাঁকে বিদায় জানিয়ে আলিঙ্গন করে ফিরে এলেন। অর্জুন বারংবার তাঁকে আলিঙ্গন করলেন এবং যতক্ষণ তাঁরা দৃষ্টির বাইরে না গেলেন, একদৃষ্টে সেইদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। শ্রীকৃষ্ণেরও একই অবস্থা। রথ দূরে চলে গেলো, তখন অর্জুন বহুকষ্টে শ্রীকৃষ্ণের দিক থেকে চোখ সরিয়ে পিছন ফিরলেন। সেইরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণও অতিকষ্টে অর্জুনের দিক থেকে দৃষ্টি সরালেন। ভগবানের যাত্রাপথে নানা অদ্ভুত লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। প্রচণ্ড জোরে হাওয়া এসে তাঁর রথের সামনে থেকে ধুলো, কাঁকর উড়িয়ে দিচ্ছিল। ইন্দ্র পবিত্র, সুগন্ধিত জল ও দিব্য পুষ্প বর্ষণ করছিলেন। সমতল পথ দিয়ে মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ ক্রমশ মারওয়াড়ে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে তিনি অমিত তেজস্বী উত্তঙ্ক মুনিকে দর্শন এবং পূজা করলেন। তারপর মুনিও তাঁকে স্বাগত জানালেন এবং দুজন দুজনকে কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তঙ্ক মুনি ভগবানকে প্রশ্ন করলেন—'শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি কি কৌরব এবং পাণ্ডবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলে ? ওদের মধ্যে অবিচল ভ্রাতৃভাব স্থাপন হয়েছে তো ? তারা তোমার আত্মীয় এবং পরম প্রিয় ; তাদের মধ্যে সন্ধি করেই ফিরে যাচ্ছে তো ? এবার থেকে পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা তোমার সঙ্গে আনন্দে থাকতে পারবে তো ? কৌরবগণ সম্মত হওয়ায় তোমার দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে পাণ্ডবেরা নিজ রাজ্যে সুখে থাকতে পারবে তো ? তাত ! আমি সর্বদা ভাবতাম যে তুমি চেষ্টা করলে কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে অবশ্যই মিলন হবে। আমার সেই চিন্তা অসফল হয়নি তো ?'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—মহর্ষি ! আমি কৌরবদের কাছে গিয়ে তাদের বোঝাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম ; কিন্তু তারা কিছুতেই সন্ধির জন্য রাজি হয়নি। তাই সকলেই পুত্র-আত্মীয়-বান্ধবসহ যুদ্ধে নিহত হয়েছে। কেউ নিজ বুদ্ধি ও বলের দ্বারা প্রারব্ধের বিধান দূর করতে পারে না। আপনি নিশ্চয়ই এসব জানেন। কৌরবেরা আমার, মহামতি ভীষ্ম ও বিদুরের মতকেও সম্মান দেয়নি।

তাই তারা যুদ্ধে বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে। পাণ্ডব-পক্ষেও কেবল যুধিষ্ঠিরাদি পাঁচভাই জীবিত আছে। তাদের সকল পুত্রই যুদ্ধে নিহত হয়েছে। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের মধ্যে (যুযুৎসু ব্যতীত) কেউই বেঁচে নেই। সকলেই তাদের বন্ধু-বান্ধবসহ মারা গেছে।

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে উত্তঙ্ক মুনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—'মধুসূদন ! কৌরবগণ তোমার আত্মীয় এবং প্রিয় ছিল, তোমার শক্তি থাকা সত্ত্বেও তুমি তাদের রক্ষা করোনি ; সুতরাং আজ আমি তোমাকে অবশ্যই শাপ দেব। তুমি জোর করে তাদের থামাতে পারতে, কিন্তু তা করোনি। তাই আমি ক্রোধের বশে তোমাকে শাপ না দিয়ে পারছি না। ওঃ ! কুরুবংশের শ্রেষ্ঠ বীরেরা বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে গেল আর তোমার ক্ষমতা থাকতেও তুমি তা উপেক্ষা করেছ !'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—ভৃগুনন্দন ! আগে আমার কথা শুনুন। আপনি তপস্বী, সুতরাং আপনি একটি অনুরোধ মেনে নিন। আমি আপনাকে অধ্যাত্মতত্ত্ব শোনাচ্ছি। তা শোনার পর যদি আপনার ইচ্ছা হয় তাহলে আমাকে শাপ দেবেন। শুধু স্মরণ রাখবেন যে কোনো ব্যক্তিই তার অল্প তপস্যার জোরে আমাকে অসম্মান করতে পারে না। আপনি তপস্বী শ্রেষ্ঠ, আপনার তপস্যার তেজ অত্যন্ত বেশি, আপনি আপনার গুরুজনদেরও সেবাদ্বারা সন্তুষ্ট করেছেন। বাল্যাবস্থা থেকেই আপনি ব্রহ্মচর্য পালনকারী—এসব আমি ভালোভাবেই জানি ; তাই এত কষ্টে সঞ্চিত আপনার তপ আমি বিনাশ করতে চাই না।

উত্তঙ্ক বললেন—কেশব ! তুমি তোমার কথানুযায়ী উত্তম অধ্যাত্মতত্ত্ব বর্ণনা করো। তা শুনে আমি তোমার মঙ্গলের জন্য আশীর্বাদ করব অথবা অভিশাপ দেব।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—মহর্ষে ! আপনি জানেন যে তমোগুণ, রজোগুণ এবং সত্ত্বগুণ—এই সব ভাব আমারই আশ্রিত। রুদ্র এবং বসুও আমা হতেই উৎপন্ন। আপনি একথা নিশ্চিতভাবে জানবেন যে সমস্ত ভূত আমাতে এবং আমি সমস্ত ভূতে অবস্থিত। সমস্ত দৈত্য, যক্ষ, গন্ধর্ব, রাক্ষস, নাগ এবং অপ্সরাগণের আমার থেকে প্রাদুর্ভাব হয়েছে। বিদ্বানগণ যাকে সৎ-অসৎ, ব্যক্ত-অব্যক্ত এবং ক্ষর-অক্ষর বলেন, সে সবই আমার স্বরূপ। মুনে ! চার আশ্রমের যে চার ধর্ম প্রসিদ্ধ এবং বেদোক্ত যত কর্ম আছে, সেগুলির কোনোটিই আমার থেকে পৃথক নয়। অসৎ, সদসৎ এবং তার অতীত যে অব্যক্ত জগৎ, সেগুলিও আমার সনাতন দেবাধিদেবের থেকে ভিন্ন নয়। ওঁ-কার থেকে শুরু হওয়া চারটি বেদও 'আমি'। যজ্ঞে যূপ (হাড়িকাট), সোম, চরু, দেবতাদের তৃপ্তকারী হোম, হোতা এবং হোমের সামগ্রীও আমি। অধ্বর্যু, কল্পক এবং সংস্কার করা হবিষ্য—এগুলি সব আমারই স্বরূপ। বৃহৎ যজ্ঞের উদ্গাতা উচ্চৈঃস্বরে সামগান করে আমারই স্তুতি করে থাকে। প্রায়শ্চিত্ত কর্মে শান্তি-পাঠ ও মঙ্গলপাঠকারী ব্রাহ্মণ বিশ্বকর্মারূপ আমাকেই স্তব করে। সর্বপ্রাণীতে দয়া করার যে ধর্ম তা আমার জ্যেষ্ঠ মানসপুত্র বলে জানবেন। আমি ধর্ম রক্ষা এবং স্থাপন করার জন্য নানা রূপে অবতার হয়ে জন্মগ্রহণ করি এবং বিভিন্নরূপে ও বেশে ত্রিলোকে বিচরণ করি। আমিই বিষ্ণু, ব্রহ্মা, ইন্দ্র এবং সকলের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ। সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি ও সংহার আমা দ্বারাই হয়ে থাকে। যখনই যুগের পরিবর্তন হয়, তখনই আমি প্রজাদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন রূপে জন্ম নিয়ে ধর্ম-মর্যাদা স্থাপন করি। যখন দেব যোনিতে জন্ম নিই, তখন আমি দেবতার ন্যায় সমস্ত আচার পালন করি। গন্ধর্বরূপে অবতার জন্ম নিলে সমস্ত আচরণ গন্ধর্বের মতোই হয়। এইভাবে নাগজন্মে নাগেদের ন্যায়, যক্ষ-রাক্ষস জন্মে তাদের মতো আচরণ করি। এখন মনুষ্য-অবতার ধারণ করেছি, তাই কৌরবদের ওপর শক্তি প্রয়োগ না করে দীনভাবে তাদের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলাম ; কিন্তু তারা মোহগ্রস্ত হওয়ায় আমার কথা মেনে নেয়নি। তারপর ক্রুদ্ধ হয়ে আমি ভীষণ ভয় দেখিয়েছি এবং ধমক দিয়েছি, কিন্তু তারা অধর্মযুক্ত এবং কালগ্রস্ত হওয়ায় আমার কথায় রাজি হয়নি। তাই যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন করে তারা স্বর্গগমন করেছে। বিপ্রবর ! আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমি সমস্ত বিষয় আপনাকে সবিস্তারে জানালাম।

শ্রীকৃষ্ণের উত্তঙ্ক মুনিকে বিশ্বরূপ দর্শন করানো এবং মরুদেশে জল প্রাপ্ত হওয়ার বরপ্রদান

উত্তঙ্ক বললেন—জনার্দন ! আমি জানি আপনি সমস্ত জগতের অধীশ্বর। আপনি যে জ্ঞানের উপদেশ আমাকে দিলেন, এ আমার প্রতি আপনার অশেষ কৃপা। আমার চিত্ত প্রসন্ন হয়ে আপনার প্রতি ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়েছে, সুতরাং আমার শাপ দেওয়ার চিন্তা আর নেই। জনার্দন ! আমি যদি আপনার সামান্য কৃপালাভের অধিকারী হয়ে থাকি, তবে আপনি আমাকে আপনার ঈশ্বরীয় রূপ প্রদর্শন করুন, আমি সেটি দেখতে অত্যন্ত আগ্রহী।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! মুনি এইভাবে প্রার্থনা জানানোতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হয়ে তাঁকে তাঁর সনাতন বৈষ্ণব স্বরূপ প্রদর্শন করলেন, যুদ্ধের প্রারম্ভে যা তিনি অর্জুনকে দেখিয়েছিলেন। উত্তঙ্ক মুনি সেই বিরাট বিশ্বরূপ দর্শন করলেন, যাঁর বিশাল লম্বা হাত, তিনি হাজার সূর্যের মতো দেদীপ্যমান, অগ্নির ন্যায় তেজস্বী এবং সমস্ত আকাশ ব্যাপ্ত করে দণ্ডায়মান। তাঁর সবদিকে মুখ দেখা যাচ্ছিল। সেই ব্যাপক পরমাত্মার বৈষ্ণব রূপ দর্শন করে উত্তঙ্ক মুনি অত্যন্ত বিস্মিত হলেন, তিনি তখন স্তুতি করতে লাগলেন—'বিশ্বকর্মন্ ! আপনাকে নমস্কার, বিশ্বাত্মন্ ! আপনার থেকেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি হয়েছে। পৃথিবী আপনার দুটি চরণে এবং আকাশ আপনার মস্তকে ব্যাপ্ত, এর মধ্য স্থল আপনার উদর দিয়ে পরিবেষ্টিত। সমস্ত দিকগুলি আপনার বাহুতে মিশে আছে। অচ্যুত ! এই সমগ্র দৃশ্য প্রপঞ্চ আপনারই স্বরূপ। দেবেশ্বর ! এবার আপনি আপনার এই উত্তম এবং অবিনাশী স্বরূপ সংহত করুন। আমি আবার আগের মতোই আপনাকে আপনার পূর্ব রূপে দেখতে ইচ্ছা করি।'

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! মুনির কথা শুনে সদা প্রসন্নচিত্ত শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'মহর্ষি ! আপনি আমার কাছে বর চেয়ে নিন।' তখন উত্তঙ্ক বললেন—'পুরুষোত্তম ! আপনার যে স্বরূপ আজ আমি দেখলাম, তাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় বরপ্রদান।' তা শুনে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'মুনিবর ! এতে আপনি অন্য কিছু ভাববেন না, আমার দর্শন অমোঘ হয় ; সুতরাং আপনার আমার কাছ থেকে বর প্রার্থনা করাই উচিত।'

উত্তঙ্ক বললেন—প্রভু ! যদি বর নেওয়া আমার পক্ষে প্রয়োজন বলে মনে করেন, তাহলে এই বর দিন যেন আমি এখানে প্রচুর জলের সন্ধান পাই ; কারণ এই মরুভূমিতে জল অত্যন্ত দুর্লভ।

তারপর ভগবান নিজ তেজ সংহত করে উত্তঙ্ক মুনিকে বললেন—'মহর্ষি ! যখনই জলের প্রয়োজন হবে আমাকে স্মরণ করবেন।' বলে তিনি দ্বারকায় চলে গেলেন। পরে একদিন উত্তঙ্ক মুনি অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হয়েছেন, তিনি জলের জন্য চতুর্দিকে ঘুরছেন, ঘুরতে ঘুরতে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করলেন। সেইসময় তিনি একজন অপরিচ্ছন্ন উলঙ্গ প্রায় চণ্ডালকে দেখতে পেলেন, যার দেহ কাদামাটিতে আবৃত এবং একপাল কুকুর তাকে ঘিরে ছিল। তার কোমরে তলোয়ার, হাতে তীরধনুক, তাকে দেখতে অত্যন্ত ভয়ংকর লাগছিল। সেই চণ্ডালের উপস্থ থেকে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছিল। মহর্ষিকে তৃষ্ণার্ত দেখে সেই চণ্ডাল হেসে বলল—'উত্তঙ্ক ! এসো, আমার এই জল নিয়ে পান করো। তোমাকে তৃষ্ণায় কষ্ট পেতে দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।'

চণ্ডালের কথায় উত্তঙ্ক মুনি সেই জল নিতে অস্বীকার করলেন এবং বরপ্রদানকারী শ্রীকৃষ্ণকে কঠোর বাক্য বললেন। উত্তঙ্ক ক্রুদ্ধ হয়ে সেই জল তো গ্রহণ করলেনই না, উপরন্তু নিজ সিদ্ধান্তে অটল থেকে চণ্ডালকে তিরস্কার

করতে লাগলেন। তিনি জল নিতে অস্বীকার করায় চণ্ডাল কুকুরসহ অন্তর্ধান করল। তা দেখে উত্তঙ্ক মুনি মনে মনে লজ্জিত হয়ে ভাবতে লাগলেন যে শ্রীকৃষ্ণ আমার সঙ্গে ছলনা করেছেন। এরমধ্যে সেই পথে শঙ্খ-চক্র-গদা ধারণ করে মহাবুদ্ধিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হলেন। তখন উত্তঙ্ক তাঁকে বললেন—'পুরুষোত্তম ! ব্রাহ্মণকে চণ্ডালের প্রস্রাব দেওয়া আপনার উচিত হয়নি।' তাঁর কথা শুনে ভগবান জনার্দন উত্তঙ্ক মুনিকে মধুর স্বরে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—মুনিবর ! এস্থানে যেমন রূপ ধারণ করে আপনাকে জল দেওয়া উচিত ছিল, সেইভাবেই দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আপনি তা বুঝতে পারেননি। আমি আপনার জন্য বজ্রধারী ইন্দ্রকে বলেছিলাম জলের রূপে আপনাকে অমৃত প্রদান করতে। আমার কথা শুনে ইন্দ্র বারংবার বলতে থাকেন—'মানুষ অমর হতে পারে না, সুতরাং আপনি তাঁকে অমৃত না দিয়ে অন্য কোনো বর দিন।' কিন্তু আমি জোর করি যে উত্তঙ্ক মুনিকে অমৃতই দিতে হবে। তখন দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে প্রসন্ন করে বলেন—'মহামতে ! যদি উত্তঙ্ক মুনিকে অমৃত দেওয়া প্রয়োজন হয়, তবে আমি চণ্ডালের রূপ ধারণ করে তাঁকে অমৃত প্রদান করব, যদি তিনি এইভাবে গ্রহণ করতে স্বীকার করেন, তাহলে আমি এখনই যাচ্ছি। কিন্তু তিনি যদি অস্বীকার করেন, তবে আমি আর কিছুতেই তাঁকে অমৃত দান করতে রাজি হব না।' এইভাবে শর্ত করে সাক্ষাৎ ইন্দ্র চণ্ডালরূপে উপস্থিত হয়েছিলেন, তিনি আপনাকে অমৃত দান করছিলেন। কিন্তু আপনি তিরস্কার করে তাঁকে বিমুখ করেছেন, এ আপনার খুব অপরাধ হয়েছে। যাইহোক সে ঘটনা এখন অতীত। এখন আমি আপনার তৃষ্ণা দূর করার জন্য অন্য বর প্রদান করছি। ব্রহ্মন্ ! যখনই আপনার জলপান করার ইচ্ছা হবে তখনই মরুভূমির আকাশ জলপূর্ণ মেঘে ভরে যাবে, সেই মেঘ আপনাকে সুমিষ্ট জলপ্রদান করবে এবং সেটি 'উত্তঙ্ক মেঘ' নামে পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ হবে।

জনমেজয় ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে বিপ্রবর উত্তঙ্ক মুনি অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। এখনও মরুভূমিতে উত্তঙ্ক নামের মেঘে বর্ষা হয়ে থাকে।

উত্তঙ্কের গুরুভক্তির বর্ণনা—গুরুপত্নীর নির্দেশে উত্তঙ্কের সৌদাসের কাছে গিয়ে তাঁর রানির কুণ্ডল যাচনা করা

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্মন্ ! মহামনা উত্তঙ্ক মুনি এমন কী তপস্যা করেছিলেন যে তিনি তার শক্তিতে ভগবান বিষ্ণুকেও শাপ দিতে উদ্যত হয়েছিলেন ?

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! উত্তঙ্ক মুনি অত্যন্ত বড় তপস্বী, তেজস্বী এবং গুরুভক্ত ছিলেন। (তিনি যখন গুরুর কাছে ছিলেন, সেই সময় তাঁকে দেখে) সমস্ত ঋষি-কুমারদের মনে এরূপ ইচ্ছা হত যে আমাদেরও যেন উত্তঙ্কের ন্যায় গুরুভক্তি লাভ হয়। মহর্ষি গৌতমের অনেক শিষ্য ছিলেন ; কিন্তু তিনি উত্তঙ্ককেই সর্বাধিক স্নেহ করতেন। তাঁর ইন্দ্রিয় সংযম, আচার ব্যবহার, পুরুষার্থ এবং উত্তম সেবাপরায়ণতা দেখে গৌতম তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। গৌতমের কাছে হাজার হাজার শিষ্য এসেছিল এবং (গুরুকুলবাসের কাল পূর্ণ করে) তাঁর অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে নিজ নিজ গৃহে চলে গিয়েছিল ; কিন্তু উত্তঙ্কের ওপর স্নেহ বেশি থাকায় তিনি তাঁকে গৃহে ফেরার অনুমতি দেননি। ধীরে ধীরে মহামুনি উত্তঙ্ক বৃদ্ধাবস্থায় গিয়ে পৌঁছলেন, কিন্তু গুরু-ভক্তিতে মগ্ন থাকায় তিনি তা অনুভব করতে পারলেন না। একদিন, তিনি জঙ্গলে কাঠ আনতে গেলেন এবং কাঠের মস্ত বড় ভারী বোঝা মাথায় করে ফিরে এলেন। বোঝাটি খুব ভারী থাকায় তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছিলেন। আশ্রমে এসে তিনি যখন বোঝাটি মাটিতে ফেলতে গেলেন তখন তাঁর পাকা চুলের জটা কাঠের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়ায়, তিনিও কাঠের সঙ্গে মাটিতে পড়ে গেলেন। উত্তঙ্ক মুনি সেই কাঠের নীচে চাপা পড়ে গেলেন, তিনি তখন অত্যন্ত ক্ষুধার্তও ছিলেন। সেই সময় তিনি পাকাচুলের জটা দেখে নিজের বৃদ্ধাবস্থার কথা ভেবে মনের দুঃখে কাঁদতে লাগলেন। তখন মহর্ষি গৌতম এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—'পুত্র ! আজ তোমার মন দুঃখে ব্যাকুল হয়েছে কেন ? আমি তার কারণ জানতে চাই। তুমি নিঃসঙ্কোচে সব কথা আমাকে বলো।'

উত্তঙ্ক বললেন—গুরুদেব ! আমার মন আপনাতেই নিবিষ্ট থাকে। আপনার প্রিয় কাজ করার জন্য আমি সর্বদা

আপনার সেবাতে ব্যস্ত থাকি। আপনাকে শ্রদ্ধা করি এবং আপনাকেই ভক্তি করি। তাই আমি বুঝতেই পারিনি যে আমি কবে বৃদ্ধ হয়ে গেলাম। আমি কখনো সুখ ভোগ করিনি, এখানে থাকতে থাকতে একশত বছর পার হলেও আপনি আমাকে গৃহে ফেরার অনুমতি দেননি। আমার পর শত সহস্র শিষ্য এখানে এসেছে এবং আপনার অনুমতি নিয়ে ফিরে গেছে (শুধু আমিই এখানে পড়ে আছি)।

গৌতম বললেন—ভৃগুনন্দন ! তোমার গুরুসেবা দেখে তোমার ওপর আমার অত্যন্ত ভালোবাসা জন্মেছিল ; তাই এতো বছর যে কেটে গেছে তা আমার মনেই হয়নি। ঠিক আছে, এখন তুমি যদি যেতে চাও তবে যেতে পারো আমি আনন্দের সঙ্গে অনুমতি দিচ্ছি, শীঘ্র যাও, দেরি কোরো না।

উত্তঙ্ক বললেন—গুরুদেব ! আমি আপনাকে কী গুরুদক্ষিণা দেব ? কৃপা করে বলুন। আপনার সেবায় তা অর্পণ করে, আপনার অনুমতি নিয়ে গৃহে যাব।

গৌতম বললেন—পুত্র ! সৎপুরুষদের মত হল গুরুজনদের সন্তুষ্ট করাই তাদের পক্ষে সবথেকে বড় দক্ষিণা। তুমি যা সেবা করেছ, তাতে আমি যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি, তাতে কোনো সন্দেহই নেই।

তারপর উত্তঙ্ক যৌবনাবস্থা লাভ করে গুরুর নির্দেশে

গুরুপত্নীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'মাতা ! আমাকে অনুমতি দিন, গুরু দক্ষিণা হিসাবে আপনাকে কী দেব ? আমি ধন ও প্রাণ দিয়েও আপনার প্রিয় ও হিত কাজ করতে চাই। ইহলোকে যা অত্যন্ত দুর্লভ, অদ্ভুত এবং বহুমূল্য রত্ন, তাও আমি নিজ তপস্যার দ্বারা আনতে সক্ষম, এতে কোনো সংশয় নেই।

অহল্যা বললেন—পুত্র ! তোমার ভক্তিতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি, সেটিই আমার কাছে পর্যাপ্ত দক্ষিণা। তোমার কল্যাণ হোক। এবার তুমি যেখানে যেতে চাও যেতে পারো।

তাঁর কথা শুনে উত্তঙ্ক আবার বললেন—'মাতা ! আপনার জন্য কিছু একটা প্রিয় কাজ করবই ; অতএব আদেশ করুন, কী করব।'

অহল্যা বললেন—পুত্র ! রাজা সৌদাসের রানি তাঁর কানে মণিমণ্ডিত দুটি দিব্য কুণ্ডল পরে আছেন। সেদুটি আমাকে এনে দাও। তাইতে তোমার গুরুদক্ষিনা পূর্ণ হবে। যাও তোমার কল্যাণ হোক।

জনমেজয় ! উত্তঙ্ক 'যথা আজ্ঞা' বলে গুরুপত্নীর আদেশ মেনে নিলেন এবং তাঁর প্রিয় কাজ করার জন্য কুণ্ডল আনতে তাড়াতাড়ি রওনা হলেন। তিনি ক্রমশ নরমাংসাহারী সৌদাসের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন।

এদিকে উত্তঙ্ক মুনিকে আশ্রমে না দেখে গৌতম তাঁর পত্নীকে জিজ্ঞাসা করলেন—'আজ উত্তঙ্ককে দেখছি না কেন ?' অহল্যা বললেন—'সে আমার জন্য কুণ্ডল আনতে গেছে।' তা শুনে মহর্ষি বললেন—'এ তুমি ভালো করোনি। রাজা সৌদাস ব্রাহ্মণদের শাপে নরমাংসাহারী রাক্ষস হয়ে গেছে ; সুতরাং সে অবশ্যই এই ব্রাহ্মণকে হত্যা করবে।'

অহল্যা বললেন—'স্বামীন্ ! আমি একথা জানতাম না ; তাই তাকে এমন কাজে পাঠিয়েছি। আমার বিশ্বাস আপনার কৃপায় তার কোনো বিপদ হবে না।'

পত্নীর কথা শুনে গৌতম বললেন—'আচ্ছা, তবে তাই হোক।' ওদিকে উত্তঙ্ক নির্জন বনে রাজা সৌদাসের দেখা পেলেন—তাঁর বড় ভীষণ আকৃতি। লম্বা লম্বা দাড়ি-গোঁফ, সমস্ত দেহ নর রক্তে রঞ্জিত। কিন্তু তাঁকে দেখে উত্তঙ্ক একটুও ভয় পেলেন না। তাঁকে দেখেই যমরাজের মতো ভয়ংকর রাজা সৌদাস উঠে তাঁর কাছে এসে বললেন—'বিপ্রবর ! কী ভাগ্য যে দিনের ষষ্ঠ ভাগে আপনি নিজেই আমার কাছে এসেছেন। আমি এখন আহারেরই সন্ধান করছিলাম।'

উত্তঙ্ক বললেন—রাজন্ ! আমি গুরুদক্ষিণা দেওয়ার

জন্য ঘুরে ঘুরে এইখানে এসেছি। যে ব্যক্তি গুরু-দক্ষিণা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে, তাকে হিংসা করা উচিত নয়—মনীষী ব্যক্তিরা একথা বলেন।

রাজা বললেন—বিপ্রবর ! আমি দিনের ষষ্ঠভাগে আহার করা নিয়ম করেছি এবং সেইক্ষণ উপস্থিত, আমি ক্ষুধায় কাতর হয়ে আছি ; তাই আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি না।

উত্তঙ্ক বললেন—মহারাজ ! ঠিক আছে, তাই হবে ; কিন্তু আমার একটি শর্ত মেনে নিন। আমি গুরুদক্ষিণা দিয়ে আপনার কাছে আসব। আমি গুরুকে যা দেবার প্রতিজ্ঞা করেছি, সেটি আপনার কাছে আছে ; সুতরাং আপনার কাছে সেটি ভিক্ষা চাইছি। আপনি প্রত্যহ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের বহু রত্ন দান করেন। এই পৃথিবীতে আপনি একজন শ্রেষ্ঠ দাতারূপে পরিচিত, আমাকে দান গ্রহণের উত্তম পাত্র বলে জানবেন। আমি গুরুকে যা দিতে চাই, তা আপনার কাছেই আছে ; অতএব আমার অভীষ্ট বস্তু আমাকে দিয়ে দিন। মহারাজ ! আমি আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি যে ওই বস্তু গুরুকে প্রদান করে শর্ত অনুসারে আপনার কাছে ফিরে আসব। আমার এই কথা কখনো মিথ্যা হবে না। আমি কখনো পরিহাস করেও মিথ্যা বলিনি, তাহলে এখন কেন বলব।

সৌদাস বললেন—ব্রহ্মন্ ! যদি আপনার গুরুদক্ষিণা আমার কাছে থাকে, তবে তা পেয়ে গেছেন মনে করুন। আপনি যদি কোনো বস্তু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা রাখেন তাহলে বলুন আমি আপনাকে কী দেব ?

উত্তঙ্ক বললেন—পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আপনার প্রদত্ত দান আমি সর্বদাই যোগ্য মনে করি। এখন আপনার রানির দুটি মণিমণ্ডিত কুণ্ডল চাইতে আপনার কাছে এসেছি।

সৌদাস বললেন—ব্রহ্মর্ষি ! ওই মণিমণ্ডিত কুণ্ডল আমার রানিরই যোগ্য। আপনি অন্য কোনো বস্তু চান, আমি অবশ্যই তা দেব।

উত্তঙ্ক বললেন—রাজন্ ! আপনার যদি আমার ওপর বিশ্বাস থাকে এবং আমাকে উত্তম পাত্র বলে মনে করেন, তবে অন্যথা করবেন না, ওই কুণ্ডল দুটি দিয়ে সত্য রক্ষা করুন।

উত্তঙ্ক এই কথা বলায় রাজা বললেন—'বিপ্রবর ! আপনি রানির কাছে গিয়ে তাঁকে আমার নির্দেশ জানিয়ে কুণ্ডল চেয়ে নিন। তিনি উত্তম ব্রতপালনকারী। আপনার কাছে আমার কথা শুনে নিঃসন্দেহে কুণ্ডল দিয়ে দেবেন।'

উত্তঙ্ক বললেন—মহারাজ ! আমি আপনার পত্নীকে কোথায় খুঁজতে যাব ? তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে কী প্রকারে ? আপনি নিজেই কেন তাঁর কাছে যাচ্ছেন না ?

সৌদাস বললেন—ব্রহ্মন্ ! আপনি তাঁকে জঙ্গলের মধ্যে কোনো ঝর্নার পাশে পাবেন। এখন দিনের ষষ্ঠভাগ (আমি আহারের সন্ধানে ব্যস্ত)। এখন আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারব না।

রাজার কথা শুনে উত্তঙ্ক মুনি তাঁর রানি মদয়ন্তীর কাছে গিয়ে তাঁকে নিজের আগমনের প্রয়োজন জানালেন। রাজার কথা শুনে বিশাল নয়না রানি মহাবুদ্ধিমান উত্তঙ্ক মুনিকে বললেন—'ব্রহ্মন্ ! মহারাজ যে আপনাকে কুণ্ডল দিতে বলেছেন, তা ঠিক কথা। আপনি মিথ্যাকথা বলছেন না, তবুও আমার বিশ্বাসের জন্য আপনার তাঁর কাছ থেকে কোনো চিহ্ন নিয়ে আসা উচিত। আমার এই মণিমণ্ডিত কুণ্ডল অত্যন্ত দিব্য, দেবতা, যক্ষ এবং মহর্ষিগণ এটি নানাভাবে চুরি করার চেষ্টা করেন। এটি মাটিতে রাখলে নাগ নিয়ে নেবে, অপবিত্র অবস্থায় ধারণ করলে যক্ষ নিয়ে যাবে এবং এটি পরে নিদ্রা গেলে দেবতারা জোর করে ছিনিয়ে নেবেন। এভাবে এটি সর্বদা হারাবার ভয় থাকে। দেবতা, রাক্ষস এবং নাগেদের থেকে সাবধানে থাকা মানুষই এটি ধারণ করতে পারে। এর থেকে রাত-দিন সোনা ঝরে পড়ে। রাত্রে নক্ষত্রের ন্যায় এটি চকমক করে। এটি পরিধান করলে বিষ, অগ্নি অথবা অন্য ভয়প্রদ জন্তু থেকে কখনো ভয় হয় না। ক্ষুধা-তৃষ্ণার ভয় তো থাকেই

না। ছোটো মাপের মানুষ এটি পরলে এটি ছোটো হয়ে যায় আর বলিষ্ঠ মানুষ পরলে এটি তার মতো বড় হয়ে যায়। এরূপ গুণযুক্ত হওয়ায় আমার এই কুণ্ডল দুটি সকলেরই প্রশংসার পাত্র। ত্রিলোকে এটি প্রসিদ্ধ, সুতরাং আপনি যদি রাজার আদেশে এটি নিয়ে যাওয়ার জন্য এসে থাকেন, তাহলে রাজার কোনো পরিচয়পত্র নিয়ে আসুন।

কুণ্ডল নিয়ে উত্তঙ্কের ফেরা, পথে সেই কুণ্ডলগুলি অপহৃত হওয়া এবং অগ্নিদেবের কৃপায় তা ফিরে পেয়ে গুরুপত্নীকে প্রদান করা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয়! রানি মদয়ন্তীর কথা শুনে উত্তঙ্ক মুনি মহারাজ মিত্রসহের (সৌদাসের) কাছে এসে তাঁর কোনো অভিজ্ঞান চাইলেন। তখন ইক্ষ্বাকু-বংশীয়দের শ্রেষ্ঠ নরেশ তাঁর চিহ্নরূপে রানিকে শোনাবার জন্য নিম্নলিখিত সংবাদ দিলেন।

সৌদাস বললেন—প্রিয়ে! আমি যে দুর্গতিতে পড়েছি, তা আমার পক্ষে কল্যাণকর নয়, কিন্তু এছাড়া আমার অন্য কোনো গতি নেই। আমার এই চিন্তা জেনে তুমি তোমার কুণ্ডল দুটি এই ব্রাহ্মণ দেবতাকে দান করো।

তাঁর কথা শুনে মহর্ষি উত্তঙ্ক রানির কাছে গিয়ে রাজার বলা কথাগুলি পুনরাবৃত্তি করলেন। মহারানি মদয়ন্তী স্বামীর কথা শুনে তখনই তাঁর মণিখচিত কুণ্ডল উত্তঙ্ক

মুনিকে দিয়ে দিলেন। কুণ্ডল পেয়ে উত্তঙ্ক মুনি পুনরায় রাজার কাছে গিয়ে বললেন—'মহারাজ! আপনার গূঢ় বচনের অর্থ কী, আমি শুনতে চাই।'

সৌদাস বললেন—ব্রহ্মন্! ক্ষত্রিয়েরা সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই ব্রাহ্মণদের পূজা করে আসছে তবুও কখনো কখনো ব্রাহ্মণদের কাছে ক্ষত্রিয়ের বহু দোষ প্রকাশ হয়ে যায়। আমি সর্বদাই ব্রাহ্মণদের প্রণাম করতাম; কিন্তু ব্রাহ্মণের শাপেই এই দোষ—আমি এই দুর্গতি প্রাপ্ত হয়েছি। আমি মদয়ন্তীর সঙ্গে এখানে থাকি। আমার এই দুর্গতি থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় দেখছি না। এখন ইহলোকে থেকে সুখ পাবার অথবা পরলোকে স্বর্গীয় সুখ ভোগ করার আর কোনো পথ দেখছি না। কোনো রাজা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিরোধ করে ইহলোকে সুখে থাকতে পারে না এবং পরলোকেও সুখ পায় না (আমার গূঢ় সন্দেশের এই তাৎপর্য)। আপনার ইচ্ছানুসারে এই মণিময় কুণ্ডল আমি আপনাকে দিয়েছি। এবার আপনি যা প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা সফল করুন।

উত্তঙ্ক বললেন—রাজন্! আমি আমার প্রতিজ্ঞা পালন করে আবার আপনার অধীন হব; কিন্তু এখন একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্য এখানে এসেছি।

সৌদাস বললেন—বিপ্রবর! আপনি যেমন ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করুন, আমি তার উত্তর দেব। আপনার মনে যে সন্দেহ হবে, আমি তা নিবারণ করব। এতে আমার কোনো কিছু চিন্তা করার প্রয়োজন নেই।

উত্তঙ্ক বললেন—রাজন্! ধর্মজ্ঞ বিদ্বানগণ তাঁকেই ব্রাহ্মণ বলেন যিনি নিজ বাক্য সংযম করেন, সত্যবাদী হন। যে ব্যক্তি মিত্রের সঙ্গে বিষম ব্যবহার করে, তাকে চোর বলা হয়। এখন আপনার সঙ্গে আমার মিত্রতা হয়েছে, আপনি আমায় সুপরামর্শ দিন। আপনি বলুন, আপনার ন্যায় পুরুষের কাছে আমার ফিরে আসা উচিত কি না?

সৌদাস বললেন—বিপ্রবর! আপনি যদি আমাকে দিয়ে উচিত বাক্য বলাতে চান, তাহলে আমার বক্তব্য হল, আপনি কিছুতেই আর আমার কাছে আসবেন না, তাতেই

আপনার কল্যাণ। এখানে এলে নিঃসন্দেহে আপনার মৃত্যু হবে।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! উত্তঙ্ক মুনি এইভাবে বুদ্ধিমান রাজা সৌদাসের কাছ থেকে উচিত ও হিতবাক্য শুনে, তাঁর অনুমতি নিয়ে অহল্যার কাছে চলে গেলেন। গুরুপত্নীর প্রিয়কাজ করার জন্য দুটি দিব্য কুণ্ডল নিয়ে অত্যন্ত দ্রুত গৌতমের আশ্রমের দিকে রওনা হলেন। রানি মদয়ন্তীর কথা অনুযায়ী তাঁর কুণ্ডলদুটি রক্ষা করার কথাও মনে ছিল, তাই তিনি সেদুটি মৃগচর্মের মধ্যে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে তাঁর খুব ক্ষুধার উদ্রেক হল। তিনি কাছেই একটি বেলগাছ দেখলেন, সেটি ফলের ভারে ঝুঁকে পড়েছিল। মহর্ষি উত্তঙ্ক সেই বেলগাছে চড়ে, মৃগচর্মটি তার শাখায় বাঁধলেন ; তারপর বৃক্ষ থেকে মাটিতে বেল ফেলতে লাগলেন। সেই সময় তিনি বেলের দিকেই লক্ষ্য রেখেছিলেন, সেগুলি কোথায় পড়ছে তার খেয়াল ছিল না। সব বেলই মৃগচর্মের ওপর পড়ছিল, সেখানেই কুণ্ডল দুটি বাঁধা ছিল। বেলের আঘাতে মৃগচর্মের বাঁধন খুলে কুণ্ডল দুটি মাটিতে গিয়ে পড়ল। সেখানে ঐরাবত কুলের এক নাগ উপস্থিত ছিল। সে সেই কুণ্ডলদুটি নিয়ে তৎক্ষণাৎ মুখে পুরে দিল এবং একটি গর্তের মধ্যে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কুণ্ডলদুটি সাপে চুরি করেছে ভেবে উত্তঙ্ক মুনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলেন, তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে গাছ থেকে লাফিয়ে পড়লেন। নীচে এসে তিনি একটি লাঠির সাহায্যে সেই গর্তটি খুঁড়তে লাগলেন, তিনি একটুও ভয় পেলেন না। এক নাগাড়ে পঁয়ত্রিশ দিন ধরে তিনি সেই কাজে ব্যাপৃত থাকলেন, সেই অসহ্য বেগ পৃথিবী সহ্য করতে পারল না, লাঠির আঘাতে ব্যাকুল হয়ে পৃথিবী টলমল করে উঠল। ব্রহ্মর্ষি উত্তঙ্ক নাগলোকে যাওয়ার রাস্তা তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়ে মাটি খুঁড়তেই লাগলেন, তা লক্ষ্য করে মহাতেজস্বী ইন্দ্র হাতে বজ্র নিয়ে রথে করে সেখানে এসে বিপ্রবর উত্তঙ্কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি উত্তঙ্কের দুঃখে দুঃখিত হয়ে ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে বললেন—'ব্রহ্মন্ ! একাজ তোমার নয়, নাগলোকে এই স্থান থেকে হাজার হাজার যোজন দূরে। এই কাঠের লাঠি দিয়ে সেখানে যাবার রাস্তা করা সম্ভব নয়। আমার মনে হয় তোমার পক্ষে একাজ অত্যন্ত অসাধ্য।'

উত্তঙ্ক বললেন—ব্রহ্মন্ ! আমি যদি নাগলোকে গিয়ে কুণ্ডল না আনতে পারি, তবে এখনই আপনার সামনে

আমি প্রাণত্যাগ করব।

বজ্রধারী ইন্দ্র যখন কিছুতেই উত্তঙ্ককে তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে সরাতে পারলেন না, তখন তিনি সেই কাঠের অগ্রভাগে তাঁর ব্রহ্মাস্ত্র জুড়ে দিলেন। বজ্রের আঘাতে পৃথিবী বিদীর্ণ হয়ে নাগলোকের রাস্তা তৈরি হল। সেই পথ দিয়ে গিয়ে উত্তঙ্ক দেখলেন নাগলোক হাজার হাজার যোজন বিস্তৃত। তার চারদিকে মণিমুক্তা দ্বারা অলংকৃত বহু প্রাকার। সেখানে স্ফটিক নির্মিত সিঁড়ি, নির্মল জলভরা অনেক নদী এবং বিহঙ্গ-কূজনে ভরা সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ। নাগলোকের বাইরের দরজা শত যোজন উচ্চ এবং পাঁচ যোজন বিস্তৃত। নাগলোকের এই বিশাল ব্যাপার দেখে উত্তঙ্ক মুনি হতোদ্যম হয়ে পড়লেন, কুণ্ডল ফিরে পাবার আশা তাঁর আর থাকল না। সেই সময় তাঁর কাছে একটি ঘোড়া এল, তার লেজটির রং সাদা এবং কালো আর চোখ ও মুখ লাল রং এর। সে নিজ তেজে প্রজ্বলিত ছিল। সেই ঘোড়া উত্তঙ্ককে বলল—'পুত্র ! আমার গুহ্য দ্বারে ফুঁ দাও, তাহলেই তুমি কুণ্ডল পেয়ে যাবে। ঐরাবতের পুত্র তোমার কুণ্ডল চুরি করে এনেছে। আমার গুহ্যদ্বারে ফুঁ দিতে তুমি ঘৃণা কোরো না ; কারণ তুমি গৌতমের আশ্রমে থাকার সময় বহুবার এই কাজ করেছ।'

উত্তঙ্ক জিজ্ঞাসা করলেন—গুরুদেবের আশ্রমে আমি যে কখনো আপনাকে দেখেছি, তা আমার মনে নেই। আর আপনার কথা অনুযায়ী সেখানে থাকার সময় আগে আমি যে কাজ বহুবার করেছি, সেটি কী ? আমি তা শুনতে চাই।

ঘোড়া বলল—ব্রহ্মন্ ! আমি তোমার গুরুরও গুরু

জাতবেদা অগ্নি। তুমি সর্বদা পবিত্রভাবে থেকে গুরুর জন্য আমাকে যথাবিধি পূজা করেছ, তাই আমি তোমার কল্যাণ করব। এখন তুমি আমার কথানুযায়ী কাজ করো, দেরি কোরো না।

অগ্নিদেবের কথা শুনে উত্তঙ্ক তাঁর নির্দেশ পালন করলে, তাতে প্রসন্ন হয়ে নাগলোককে ভস্ম করার জন্য অগ্নি প্রজ্বলিত হল। ব্রাহ্মণ যেই ফুঁ দিলেন, তখনই অশ্বরূপধারী অগ্নির রোমকূপ থেকে তীব্র ধোঁয়া উঠতে লাগল, তাতে নাগলোক ভীত হয়ে পড়ল। ঐরাবতের গৃহে শোরগোল উঠল। বাসুকি প্রভৃতি প্রধান নাগেদের ঘর ধূমাচ্ছন্ন হয়ে গেল। ঘর অন্ধকার হয়ে গেল, মনে হচ্ছিল যেন কুয়াশা ঢাকা পর্বত। ধোঁয়ায় নাগেদের চোখ লাল হয়ে গেল। তারা অগ্নিতেজে সন্তপ্ত হতে লাগল। তখন সকলে মহামুনি উত্তঙ্কের সিদ্ধান্ত জানতে তাঁর কাছে এল। তারা সেই তেজস্বী মুনির দৃঢ় সিদ্ধান্ত জেনে ভয়ে কাতর হয়ে তাঁর বিধিমতো পূজা করল। শেষে সমস্ত নাগ তাঁর কাছে এসে মাথা নত করে প্রণাম জানিয়ে বলল—'মুনিবর! এর ওপর প্রসন্ন হোন (আমরা আপনার কুণ্ডল ফিরিয়ে দিচ্ছি)।' ব্রাহ্মণ দেবতাকে এইভাবে প্রসন্ন করে নাগেরা তাঁকে পাদ্য-অর্ঘ্য নিবেদন করে কুণ্ডল ফেরত দিল। তারপর নাগেদের দ্বারা সম্মানিত হয়ে উত্তঙ্ক মুনি অগ্নিদেবকে প্রণাম করে গুরু

আশ্রমের দিকে রওনা হলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি গুরুপত্নীকে কুণ্ডল প্রদান করলেন এবং বাসুকি প্রভৃতি নাগেদের কথা সবিস্তারে গুরু মহর্ষি গৌতমকে জানালেন। জনমেজয়! মহাত্মা উত্তঙ্ক এইভাবে ত্রিলোক ঘুরে এই দিব্য মণিমণ্ডিত কুণ্ডল লাভ করেছিলেন। তিনি এমনই প্রভাবশালী এবং মহান তপস্বী ছিলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় পৌঁছে সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা এবং বসুদেব জিজ্ঞাসা করায় মহাভারত যুদ্ধের বৃত্তান্ত শোনানো

জনমেজয় বললেন—বিপ্রবর! উত্তঙ্ককে বরপ্রদান করে মহাযশস্বী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তারপর কী করলেন?

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্! উত্তঙ্ককে বর প্রদান করে নিজ শীঘ্রগামী ঘোড়ার সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণ নিজ গৃহের দিকে চললেন। পথে বহু সরোবর, নদী, বন, পর্বত পার হয়ে পরম রমণীয় দ্বারকাপুরীতে গিয়ে পৌঁছলেন। সেইসময় রৈবতক পর্বতে কোনো এক বড় উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সাত্যকিকে সঙ্গে নিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই উৎসবে গেলেন। রৈবতক পর্বতকে নানাপ্রকার অদ্ভুত বস্ত্র, সুন্দর স্বর্ণমালা, নানাপ্রকার পুষ্প, বস্ত্র এবং কল্পবৃক্ষদ্বারা অলংকৃত করা হয়েছিল। বৃক্ষাকারে সজ্জিত স্বর্ণদীপগুলি সেই স্থানের শোভা আরও বৃদ্ধি করছিল। গুহা এবং ঝর্নাগুলি দিনের আলোর মতো প্রকাশিত হচ্ছিল। দীন, অন্ধ এবং অনাথ ব্যক্তিদের নিরন্তর দান দেওয়া হচ্ছিল। সেইজন্য পর্বতের পরম কল্যাণময় সেই উৎসব অতি সুন্দরভাবে শোভাবর্ধন করছিল। সেই পুণ্য উৎসবে পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদের নিবাসের নিমিত্ত পর্বতে অনেক ঘর নির্মিত হয়েছিল। সেই গৃহগুলির জন্য রৈবতক গিরি দেবলোকের মতো সুন্দর দেখাচ্ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আসায় সেই অনুষ্ঠান ইন্দ্রভবনকে ছাপিয়ে গেল।

পরে সকলে মিলে এবং সকলের দ্বারা সম্মানিত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি নিজেদের ভবনে গেলেন। বহুদিন পর গৃহে ফিরে আসায় ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। সেইসময় ভোজ, বৃষ্টি এবং অন্ধকবংশী বীরেরা সাক্ষাৎ

করতে এলেন। শ্রীকৃষ্ণ সকলকে আদর-আপ্যায়ন করে কুশল সংবাদ নিলেন এবং প্রসন্নচিত্তে পিতামাতার চরণে প্রণাম জানালেন। তাঁরা পুত্রকে আলিঙ্গন করে মিষ্ট বাক্যে সম্ভাষণ জানালেন। পরে সব বৃষ্ণিবংশীয় তাঁকে ঘিরে বসলেন। তারপর পিতা জিজ্ঞাসা করলে মহাতেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে মহাভারতের সমস্ত ঘটনা জানালেন।

বসুদেব জিজ্ঞাসা করলেন—পুত্র ! আমি প্রত্যহ লোকের মুখে কথাপ্রসঙ্গে শুনতাম যে মহাভারতের যুদ্ধ

অত্যন্ত অদ্ভুত ; তুমি তো তা স্বচক্ষে দেখেছ এবং তার স্বরূপও ভালোমত জানো, অতএব আমাকে তার বর্ণনা করো। মহাত্মা পাণ্ডবরা ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য ও শল্যের সঙ্গে কীভাবে যুদ্ধ করল ? অন্য সব দেশের অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ ক্ষত্রিয় বীরেরা কেমনভাবে যুদ্ধ করল ?

পিতা জিজ্ঞাসা করায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মাতার সামনেই কৌরব বীরদের মৃত্যু সম্বন্ধীয় ঘটনাবলি বলতে লাগলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—পিতা ! মহাভারত যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ক্ষত্রিয় মহাত্মাদের কর্ম অত্যন্ত অদ্ভুত। বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে একশত বৎসরেও তা সমাপ্ত হবে না। তাই আমি মুখ্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে বলছি। শুনুন। ইন্দ্র যেমন দেবসেনার অধিনায়ক, ভীষ্মও তেমন কৌরবসেনার সেনাপতি হয়েছিলেন। তাঁর অধীনে এগারো অক্ষৌহিণী সেনা ছিল। পাণ্ডবপক্ষের সাত অক্ষৌহিণী সেনার অধিনায়ক ছিলেন শিখণ্ডী। সব্যসাচী অর্জুন তাঁর রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। কৌরব এবং পাণ্ডবদের মধ্যে দশদিন ধরে ভয়ানক রোমাঞ্চকর যুদ্ধ হয়েছিল। দশম দিনে শিখণ্ডী অর্জুনের সহায়তায় ভীষ্মকে বহু বাণ দ্বারা বিদ্ধ করে। আহত হয়ে ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত হন। যতদিন দক্ষিণায়ন ছিল, তিনি ঊর্ধ্বরেত পালন করে শর-শয্যায় শায়িত ছিলেন। উত্তরায়ণ এলে তিনি দেহত্যাগ করেন।

ভীষ্ম আহত হওয়ার পর শ্রেষ্ঠ অস্ত্রবিদ আচার্য দ্রোণ কৌরব সেনাপতি নির্বাচিত হন। সেইসময় জীবিত নয় অক্ষৌহিণী সেনা তাঁকে ঘিরে রেখেছিল। দ্রোণ নিজে তো যুদ্ধে পারদর্শী ছিলেনই, কৃপাচার্য এবং কর্ণও তাঁকে সতর্ক হয়ে রক্ষা করতেন। পাণ্ডবদের দিকে মহা অস্ত্রবিদ ধৃষ্টদ্যুম্ন অধিনায়ক হলেন, ভীম তাঁর রক্ষার্থে রইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের দ্বারা তাঁর পিতার অপমানের কথা স্মরণ করে তাঁকে বধ করার জন্য যুদ্ধে অত্যন্ত পরাক্রম দেখালেন। তাঁদের দুজনের সেই ভীষণ সংগ্রামে নানা দিক থেকে আগত বহু রাজা নিহত হলেন। এই যুদ্ধ পাঁচদিন ধরে চলে। শেষে দ্রোণাচার্য ক্লান্ত হয়ে পড়লে ধৃষ্টদ্যুম্নের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

দ্রোণের মৃত্যুর পর কর্ণ হলেন কৌরব সেনার অধিপতি। তিনি জীবিত পাঁচ অক্ষৌহিণী সেনা পরিবেষ্টিত হয়ে যুদ্ধে এলেন, পাণ্ডবদের তখন মাত্র তিন অক্ষৌহিণী সেনা ছিল, অর্জুন তাদের রক্ষা করছিলেন। কর্ণ দুদিন যুদ্ধ করেছিলেন, দ্বিতীয় দিনে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে জ্বলন্ত অগ্নিতে ধাবমান পতঙ্গের ন্যায় নিহত হলেন। কর্ণের মৃত্যুতে কৌরবদের সব উৎসাহ নষ্ট হয়ে গেল, তাদের সব শক্তি নিস্তেজ হল। পরে মদ্ররাজ শল্যকে সেনাপতি করে তিন অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে তারা যুদ্ধে অগ্রসর হল। পাণ্ডবদেরও বহু সৈন্যবাহন বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাঁদের আর যুদ্ধে উৎসাহ ছিল না, তা সত্ত্বেও তাঁরা বাকি এক অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে যুধিষ্ঠিরকে সামনে রেখে শল্যের সম্মুখীন হলেন। কুরুরাজ যুধিষ্ঠির দ্বিপ্রহরে অত্যন্ত পরাক্রম দেখিয়ে মদ্ররাজ শল্যকে বধ করলেন।

শল্যের মৃত্যুর পর অমিতপরাক্রমী সহদেব কলহের গুরু শকুনিকে যমলোকে পাঠালেন। তাঁর মৃত্যুতে দুর্যোধন অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হলেন। তাঁর বহু সৈন্য যুদ্ধে নিহত

হয়েছিল ; তাই দুর্যোধন একাকী গদাহস্তে রণভূমি থেকে পলায়ন করলেন। মহাপ্রতাপশালী ভীম তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করলেন। দ্বৈপায়ন হ্রদের জলে লুক্কায়িত দুর্যোধনের সন্ধান পেয়ে ভীম সৈন্য নিয়ে সেই হ্রদ ঘিরে ফেললেন। পঞ্চপাণ্ডব প্রসন্ন মনে সেই হ্রদের কাছে গেলেন, তখন ভীম তাঁকে বাক্যবাণে জর্জরিত করতে লাগলেন। ভীমের কটুবাক্যে ক্রোধান্বিত হয়ে দুর্যোধন জল থেকে উঠে এলে মহাবলী ভীম সব রাজাদের সামনে গদাযুদ্ধে তাঁকে পরাস্ত করলেন। তারপর, সমস্ত পাণ্ডব সৈন্য যখন রাত্রে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছিল তখন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা তাঁর পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে নিদ্রারত পাণ্ডব সৈন্যদের হত্যা করেন। সেই সময় পাণ্ডবদের পুত্র ও মিত্রবর্গ সকলেই নিহত হয়। আমি ও সাত্যকি বাদে শুধু পঞ্চপাণ্ডব জীবিত আছে। কৌরব পক্ষে কৃপাচার্য, কৃতবর্মা ও অশ্বত্থামা জীবিত। পাণ্ডবদের আশ্রয় নেওয়ায় ধৃতরাষ্ট্র পুত্র যুযুৎসু জীবিত আছেন। বন্ধু ও আত্মীয়সহ দুর্যোধন নিহত হওয়ায় বিদুর ও সঞ্জয় ধর্মরাজের আশ্রয়ে আছেন। মহাভারতের যুদ্ধ আঠারো দিন ধরে হয়েছিল। এই যুদ্ধে যেসব রাজা মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁরা সব স্বর্গলাভ করেছেন।

বৈশম্পায়ন বললেন—মহারাজ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখে রোমাঞ্চকর এই বর্ণনা শুনে বৃষ্ণিবংশীয়েরা দুঃখে ও শোকে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

বসুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের অভিমন্যুর মৃত্যুর ঘটনা শোনানো এবং ব্যাসদেবের উত্তরা এবং অর্জুনকে বুঝিয়ে যুধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করার নির্দেশ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! পিতার সামনে মহাভারত যুদ্ধের বর্ণনা করার সময় মহাবুদ্ধিমান শ্রীকৃষ্ণ জেনেশুনেই অভিমন্যু-বধের প্রসঙ্গ বাদ দিয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, পিতা অভিমন্যুর মৃত্যুর মহা অমঙ্গলজনক ঘটনা শুনে দুঃখ-শোকে কাতর হবেন। যাতে তাঁর কোনো অনিষ্ট না হয়, তাই তিনি সেই প্রসঙ্গ তোলেননি ; কিন্তু সুভদ্রা যখন দেখলেন তাঁর পুত্রের মৃত্যুর ঘটনা বলা হয়নি তখন তিনি স্মরণ করিয়ে বললেন—'ভ্রাতা ! আমার অভিমন্যু-বধের কথাও বলো।' এই বলে তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। অভিমন্যুর মৃত্যুর বৃত্তান্ত শুনে বসুদেবও দুঃখ ও শোকে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'পুত্র ! তুমি আমার প্রিয় অভিমন্যুর মৃত্যুর কথা কেন বলোনি ? তার চোখ তোমার মতো সুন্দর ছিল। হায় ! তুমি থাকতে সে কীভাবে শত্রু হাতে মারা পড়ল ? মনে হচ্ছে সময় না হলে মানুষের মৃত্যু হওয়া অত্যন্ত কঠিন, তাই এই দারুণ সংবাদ শুনে দুঃখে আমার হৃদয় শত টুকরো হল না। সে যুদ্ধের থেকে পালাতে গিয়ে নিহত হয়নি তো ? মৃত্যুকালে তার মুখাকৃতি ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যায়নি ? কৃষ্ণ ! সেই মহাতেজস্বী বালক তার বালক-স্বভাব অনুসারে আমার কাছে বিনীতভাবে তার বীরত্বের প্রশংসা করতো। দ্রোণ, ভীষ্ম ও মহাবলী কর্ণের সম্মুখীন হওয়ারও ক্ষমতা সে রাখতো। এমন হয়নি তো যে দ্রোণ, কর্ণ, কৃপাচার্য ইত্যাদি সকলে মিলে সেই বালককে কপট যুদ্ধে মেরে ফেলেছে ?'

জনমেজয় ! এইরূপ দুঃখিত হয়ে বসুদেব যখন বিলাপ করতে লাগলেন, তাঁর সেই অবস্থা দেখে শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় ভারাক্রান্ত হল। তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—'পিতা ! অভিমন্যু সংগ্রামে সম্মুখে থেকে অত্যন্ত পরাক্রম দেখিয়েছে, সে কখনো ভীত হয়নি, কখনো পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেনি। লক্ষ লক্ষ রাজাকে বধ করে সে দ্রোণ ও কর্ণের সম্মুখীন হয়েছিল। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর সে ক্লান্ত হয়ে পড়লে দুঃশাসন পুত্র তাকে পরাস্ত করে। সে একাকী ব্যূহমধ্যে যুদ্ধ করেছিল। যদি একের পর এক বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হত, তাহলে ইন্দ্রও তাকে পরাস্ত করতে পারতেন না। কিন্তু ওখানে অন্য ব্যাপার ছিল। অর্জুন সংশপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে রণক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এই বালককে দ্রোণাচার্য প্রভৃতি কয়েকজন বীর চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছিল। সেই পরিস্থিতিতেও ভয়ানক যুদ্ধের পর বহু সৈন্য বধ করে সে দুঃশাসনকুমারের হাতে মৃত্যু বরণ করে। মহামতি ! অভিমন্যু অবশ্যই স্বর্গলোক লাভ করেছে, সুতরাং তার জন্য শোক করবেন না। পবিত্রবুদ্ধি সাধুগণ সংকটে

পড়লেও শোকের অধীন হন না। ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমী দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি বীরদের সঙ্গে যে সমানভাবে যুদ্ধ করে, তার কেন স্বর্গপ্রাপ্তি হবে না ? অতএব আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। তার মৃত্যুতে আমার ভগিনী সুভদ্রা যখন দুঃখে ব্যাকুল হয়ে বিলাপ করছিল তখন কুন্তী তাকে বুঝিয়ে বলেন—'সুভদ্রে ! শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি এবং অর্জুনের প্রিয় অভিমন্যু কালের প্রেরণাতেই যুদ্ধে নিহত হয়েছে। মৃত্যুলোকে জন্ম নেওয়া মানুষের এই ধর্ম—তাকে একদিন মৃত্যুর বশ হতেই হয়, তাই শোক কোরো না। যদুনন্দিনী ! তোমার দুর্জয় পুত্র পরম উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়েছে। পুত্রী ! তুমি ক্ষত্রিয়দের উত্তমকুলে জন্মলাভ করেছ, অতএব শোক ত্যাগ করো। তোমার পুত্রবধূ উত্তরা গর্ভবতী। তার দিকে তাকিয়ে চিন্তা ত্যাগ করো। সে শীঘ্রই অভিমন্যুর পুত্রের জন্ম দেবে। তাকে এইভাবে বুঝিয়ে কুন্তী অভিমন্যুর শ্রাদ্ধ-তর্পণ করলেন। তিনি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন এবং নকুল-সহদেবকে নির্দেশ দিয়ে নানাপ্রকার দান করালেন, ব্রাহ্মণদের গাভী দান করলেন এবং বিরাটনন্দিনী উত্তরাকে বললেন—'পুত্রী ! তোমার পতির জন্য আর অধিক শোক কোরো না। নিজ গর্ভের সন্তানের রক্ষার দিকে লক্ষ্য দাও।' এখন তার নির্দেশেই আমি সুভদ্রাকে আমার সঙ্গে নিয়ে এসেছি। পিতা ! মহান যোদ্ধা অভিমন্যু এইভাবে মৃত্যুবরণ করেছে। আপনি এখন আর তার জন্য শোক সন্তপ্ত হবেন না।'

পুত্র শ্রীকৃষ্ণের কথায় ধর্মাত্মা বসুদেব শোক পরিত্যাগ করে উত্তম বিধি অনুসারে অভিমন্যুর শ্রাদ্ধ করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও এইভাবে তাঁর ভাগিনেয়ের শ্রাদ্ধক্রিয়া পূর্ণ করলেন। তিনি ষাট লক্ষ তেজস্বী ব্রাহ্মণকে উত্তমরূপে আহার করালেন এবং তাঁদের এতো বস্ত্র ও ধন দিলেন যাতে তাঁদের ধনতৃষ্ণা দূর হয়ে গেল। তাঁরা প্রচুর সুবর্ণ, গাভী, শয্যা, বস্ত্র দান পেয়ে আশীর্বাদ করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বলভদ্র, সাত্যকি এবং সত্যকও অভিমন্যুর শ্রাদ্ধ করলেন।

অন্যদিকে, হস্তিনাপুরে বিরাটকুমারী উত্তরা পতি-বিয়োগ দুঃখে বহুদিন পর্যন্ত আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছিলেন, তাতে সকলেই অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছিলেন। তাঁর সন্তান গর্ভে ক্ষীণ হয়ে যেতে লাগল। দিব্যদৃষ্টিতে তাঁর এই

অবস্থা জেনে মহর্ষি ব্যাসদেব সেখানে এসে কুন্তী ও উত্তরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন—'মা উত্তরা ! শোক পরিত্যাগ করো। তোমার পুত্র মহা তেজস্বী হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব এবং আমার আশীর্বাদে সে পাণ্ডবদের পরে পৃথিবী পালন করবে।' তারপর ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে শুনিয়ে অর্জুনকে বললেন—'ধনঞ্জয় ! শীঘ্রই তোমার পৌত্র হবে, সে অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী এবং মহা-মনস্বী হবে। আসমুদ্র পৃথিবী সে ধর্মানুসারে পালন করবে। অতএব অভিমন্যুর শোক পরিত্যাগ করো। এবিষয়ে চিন্তার কোনো প্রয়োজন নেই। আমার কথা সত্য হবে। বৃষ্ণিবংশের বীরপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আগে যা বলেছেন, সেসবই সেইরূপ হবে। অভিমন্যু তার পরাক্রমে প্রাপ্য দেবতাদের অক্ষয় লোকে গমন করেছে। তোমার বা অন্য কুরুবংশীয়দের তার জন্য শোক করা উচিত নয়।'

পিতামহ ব্যাসদেবের এরূপ সান্ত্বনা প্রদান করায় ধর্মাত্মা অর্জুন শোক ত্যাগ করলেন। জনমেজয় ! সেই সময় তোমার পিতা পরীক্ষিৎ শুক্লপক্ষের চন্দ্রকলার ন্যায় উত্তরার গর্ভে বৃদ্ধি পাচ্ছিলেন। ব্যাসদেব তারপর ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করার নির্দেশ দিলেন এবং সেখান থেকে অন্তর্ধান করলেন। ব্যাসদেবের কথা শুনে পরম বুদ্ধিমান রাজা যুধিষ্ঠির হিমালয় থেকে সম্পদ-সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

ভ্রাতাদের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের হিমালয় গমন এবং সেখান থেকে সুবর্ণরাশি আনয়ন

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্মন্ ! মহাত্মা ব্যাসদেবের কথা শুনে রাজা যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পর্কে কী করলেন ? রাজা মরুত যে স্বর্ণময় রত্নসমূহ পৃথিবীতে রেখেছিলেন, তা তিনি কী করে পেলেন ?

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! মহর্ষি ব্যাসদেবের কথা শুনে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীম-অর্জুন-নকুল-সহদেব—সকল ভাইদের ডেকে বললেন—'ভ্রাতাগণ ! মহাত্মা ব্যাসদেব, মহাপরাক্রমশালী ভীষ্ম এবং পরম বুদ্ধিমান শ্রীকৃষ্ণ সৌহার্দ্যবশত যে কথা বলেছেন, তোমরা সেসব শুনেছ। আমি এখন সেই অনুসারে কাজ আরম্ভ করতে চাই, তাতে বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে আমাদের সকলের মঙ্গল হবে। ব্যাসদেব ব্রহ্মবাদী মহাত্মা, সুতরাং তাঁর কথা পরিণামে আমাদের কল্যাণকর হবে। এখন সমগ্র পৃথিবী ধনরত্নহীন হয়ে গেছে। তাই আমাদের আর্থিক সমস্যা দূর করার জন্য ব্যাসদেব আমাদের মরুতের ধনের খবর জানিয়েছেন। তোমরা যদি সেই ধন পর্যাপ্ত বলে মনে করো এবং তা আনার সামর্থ্য আছে বলে মনে করো, তাহলে ব্যাসদেবের নির্দেশ মেনে ধর্মত তা সংগ্রহ করার চেষ্টা করো অথবা ভীমসেন ! তুমি বলো, তোমার এই বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত ?

রাজার কথা শুনে ভীমসেন করজোড়ে বললেন—'মহাবাহু ! ব্যাসদেবের বলা সম্পদসমূহ আনার বিষয়ে আপনি যা বলেছেন, তা আমার পছন্দ হয়েছে। মহারাজ ! আমরা যদি মরুতের ধন পেয়ে যাই, তবে আমাদের সমস্ত কাজই সিদ্ধ হবে। আমরা ভগবান শংকরকে প্রণাম করে সেই ধন নিয়ে আসব। দেবাদিদেব মহাদেব এবং তাঁর অনুচরদের পূজা করে মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা তাঁকে প্রসন্ন করব। তাহলে আমরা নিশ্চয়ই সেই ধন লাভ করব। বিকটাকার ধারণ করে যে কিন্নর তার রক্ষায় নিযুক্ত, ভগবান শংকর প্রসন্ন হলে, সেও আমাদের অধীন হবে।'

ভীমের কথা শুনে যুধিষ্ঠির প্রসন্ন বোধ করলেন। অর্জুন, নকুল ও সহদেবও তাঁর কথা সমর্থন করলেন। তারপর সকল পাণ্ডব রত্ন আনয়নের সিদ্ধান্ত করে শুভদিন ও ধ্রুবসংজ্ঞক নক্ষত্রে সেনাদের তৈরি হতে নির্দেশ দিলেন। তারপর ব্রাহ্মণদের দিয়ে স্বস্তিবাচন করিয়ে দেবশ্রেষ্ঠ মহেশ্বরের পূজা করে প্রসন্নতা সহকারে সকলে যাত্রা করতে উদ্যত হলেন। তাঁদের যাত্রার সময় নগরবাসী শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরা প্রসন্নচিত্তে মঙ্গলপাঠ করলেন। তারপর পাণ্ডবরা অগ্নিসহ ব্রাহ্মণদের প্রণাম করে তাঁদের প্রদক্ষিণ করলেন, গান্ধারীসহ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও কুন্তীর অনুমতি নিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্র পুত্র যুযুৎসুকে রাজধানী রক্ষার ভার দিয়ে প্রস্থান করলেন। পথে বহু মানুষ প্রসন্ন হয়ে রাজা যুধিষ্ঠিরকে বিজয় লাভের জন্য আশীর্বাদ জানাচ্ছিলেন, তাঁরাও তা যথোচিত সম্মানের সঙ্গে স্বীকার করছিলেন। রাজাকে বহু সৈন্য অনুসরণ করছিল, তাদের কোলাহলে সমস্ত আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। বহু সরোবর, নদী, বন-উপবন পার হয়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির সেই পর্বতের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন, যেখানে রাজা মরুতের সঞ্চিত দ্রব্য রাখা ছিল। সেই স্থানে সমতল এবং সুন্দর স্থান দেখে রাজা যুধিষ্ঠির তপ, বিদ্যা এবং ইন্দ্রিয় সংযমী ব্রাহ্মণ এবং বেদ-বেদান্ত পারদর্শী বিদ্বান রাজপুরোহিত ধৌম্যকে সামনে রেখে সৈনিকদের সঙ্গে তাঁবু ফেললেন। তারপর ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদের সঙ্গে ক্ষত্রিয়েরা শাস্ত্রীয় রীতিতে শান্তিপাঠ করলেন এবং রাজা ও মন্ত্রীদের মধ্যস্থলে রেখে সকলে চারদিক ঘিরে রইলেন। সকলের থাকার ব্যবস্থা হওয়ার পর রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের বললেন—'দ্বিজেন্দ্রগণ ! এই কাজের জন্য শুভদিন এবং শুভ নক্ষত্র দেখে যা করা উচিত তাই করুন।' রাজার কথা শুনে তাঁর প্রিয় কাজ করার ইচ্ছায় পুরোহিত এবং ব্রাহ্মণরা বললেন—'রাজন্ ! আজই পরম পবিত্র এবং শুভ নক্ষত্রযুক্ত দিন ; সুতরাং আজ থেকেই আমাদের শুভ কার্য করার চেষ্টা করা উচিত।' পাণ্ডবরা রাত্রে উপবাস করে কুশাসনে উপবেশন করে শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্রাহ্মণদের উপদেশ শুনতে শুনতে রাত্রি কাটালেন। পরদিন নির্মল প্রভাতে সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'রাজন্ ! এবার আপনি ভগবান শংকরের পূজা করুন। তাঁকে নৈবেদ্য অর্পণ করে আমাদের কাজের উদ্যোগ করা উচিত।'

ব্রাহ্মণদের নির্দেশে রাজা যুধিষ্ঠির প্রথমে শাস্ত্রবিধি অনুসারে ভগবান শিবকে নৈবেদ্য অর্পণ করলেন। তারপর তাঁর পুরোহিত শিবের পার্ষদ, যক্ষরাজ কুবের, মণিভদ্র এবং অন্যান্য যক্ষ ও ভূতাদির অধিপতিদের নানাপ্রকার নৈবেদ্য অর্পণ করলেন। রাজা ব্রাহ্মণদের হাজার গোধন

দান করলেন। দেবাদিদেব মহাদেবের সেই স্থান ধূপের সুগন্ধ ও পুষ্পে অলংকৃত হওয়ায় অত্যন্ত মনোরম হয়ে উঠেছিল। ভগবান শিব এবং তাঁর পার্ষদদের পূজা করে মহর্ষি ব্যাসদেবকে সঙ্গে নিয়ে রাজা যুধিষ্ঠির সেই স্থানে গেলেন, যেখানে সেই সুবর্ণরাশি সঞ্চিত ছিল। সেই স্থানে তাঁরা নানা ফুল ও নৈবেদ্যর দ্বারা ধনপতি কুবেরের পূজা করে তাঁকে প্রণাম করলেন। তারপর সেই সামগ্রীর দ্বারা শঙ্খ ইত্যাদি নিধি এবং সমস্ত নিধিপালদের পূজা করে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের দিয়ে স্বস্তিবাচন করালেন।

ব্রাহ্মণদের পুণ্যাহ ঘোষণার দ্বারা মহাতেজ প্রাপ্ত হয়ে রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত প্রসন্নতাপূর্বক সেই ধন খনন করতে আরম্ভ করলেন। কিছুক্ষণ খনন করার পরই সেখান থেকে স্বর্ণনির্মিত নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর বিচিত্র বাসন বেরিয়ে পড়তে লাগল। তাঁরা সেগুলি আনার জন্য বড় বড় সিন্দুক নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই সিন্দুকগুলিতে স্বর্ণনির্মিত বাসনগুলি রাখা হতে লাগল। সেইগুলি বহন করে আনার জন্য রাজার সঙ্গে অনেক ভারবহনকারীরাও এসেছিল। ষাট হাজার উট, এক কোটি বিশ লক্ষ ঘোড়া, এক লক্ষ হাতি, এক লক্ষ রথ ইত্যাদি এসেছিল। মানুষ তো অসংখ্য এসেছিল। যুধিষ্ঠির সেখানে কত সম্পদ খননে উদ্ধার করেছিলেন, এইভাবে তার কিছুটা অনুমান করা যায়। তিনি প্রত্যেক উটে আট হাজার, প্রত্যেক গাড়িতে ষোলো হাজার, প্রত্যেক হাতিতে চব্বিশ হাজার সুবর্ণের ভার

চাপিয়েছিলেন। (এইভাবে ঘোড়া, গাধা এবং মানুষের ওপরও যথাসম্ভব ভার দিয়েছিলেন)। এইসব ভার বাহনে উঠিয়ে পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির পুনরায় মহাদেবের পূজা করে, ব্যাসদেবের অনুমতি নিয়ে পুরোহিত ধৌম্য মুনিকে অগ্রে রেখে হস্তিনাপুর রওনা হলেন। তিনি (বাহনদের বোঝা বেশি হওয়ায়) দু ক্রোশ অন্তর বিশ্রাম দিচ্ছিলেন। দ্রব্যের ভারে কষ্ট পেতে থাকা সেই বিশাল সৈন্যদল পাণ্ডবদের আনন্দবর্ধন করতে করতে অত্যন্ত কষ্টে নগরের দিকে এগিয়ে চলল।

—o—

শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুরে আগমন এবং উত্তরার মৃত পুত্রকে জীবনদানের জন্য তাঁর কাছে কুন্তী ও অন্য সকলের প্রার্থনা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এর মধ্যে বৃষ্ণিবংশীয়দের নিয়ে হস্তিনাপুরে এলেন। তিনি দ্বারকায় যাওয়ার সময় ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির যে কথা বলেছিলেন, সেই অনুসারে অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রারম্ভের বহু পূর্বেই তিনি এসে উপস্থিত হলেন। ভগবানের সঙ্গে রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন, সাত্যকি, চারুদেষ্ণ, শাম্ব, গদ, কৃতবর্মা, সারণ, নিশঠ, উল্মুক, বলদেব এসেছিলেন যাদের পতি যুদ্ধে মারা গিয়েছিল সেই ক্ষত্রিয়ানিদের মনের জোর বাড়াবার জন্য তিনি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের আসার খবর পেয়ে রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং মহামনা বিদুর এগিয়ে গিয়ে তাঁদের সম্মানে স্বাগত জানালেন। মহাতেজস্বী পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বন্ধু-বান্ধবসহ যুযুৎসু ও বিদুরের সঙ্গে সেখানে থাকতে লাগলেন। জনমেজয় ! বৃষ্ণিবংশীয়গণ সেখানে থাকার সময়ই তোমার পিতা পরীক্ষিতের জন্ম হয়। ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকায় মৃত অবস্থায় তার জন্ম হয়। প্রথমে পুত্র-জন্মের সংবাদ শুনে সকলেই আনন্দিত হন, কিন্তু তাঁর মধ্যে জীবনের লক্ষণ না দেখে সকলেই শোকসাগরে

নিমজ্জিত হলেন।

শ্রীকৃষ্ণ এই সংবাদ শুনে সাত্যকিকে সঙ্গে নিয়ে তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে গেলেন। সেখানে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন তাঁর পিসিমাতা কুন্তী অত্যন্ত দ্রুত তাঁর দিকে তাঁর নাম করতে করতে আসছেন। তাঁর পিছনে দ্রৌপদী, সুভদ্রা এবং অন্যান্য নারীগণও করুণ সুরে বিলাপ করতে করতে আসছেন। শ্রীকৃষ্ণের কাছে এসে কুন্তী করুণভাবে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—"বাসুদেব! তোমার জন্য তোমার মাতা দেবকীকে উত্তম পুত্রবতী বলে মানা হয়, তুমিই আমাদের অবলম্বন এবং আধার। আমাদের এই কুলরক্ষার ভার তোমারই ওপর ন্যস্ত। দেখো, এই শিশু তোমার ভাগিনেয় অভিমন্যুর পুত্র, মৃত অবস্থাতেই জন্মেছে। কেশব! এর জীবন-দান করো। অশ্বত্থামার জন্যই এ মারা গেছে, অশ্বত্থামা যখন বাণ প্রয়োগ করেছিল, তখন তুমি কথা দিয়েছিলে যে উত্তরার মৃত পুত্রকে জীবন-দান করবে। পুত্র! এই সেই বালক, সে মৃতই জন্মেছে; এর ওপর দৃষ্টিদান করো। একে জীবিত করে উত্তরা, সুভদ্রা এবং দ্রৌপদীসহ আমাকে রক্ষা করো। যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল এবং সহদেবেরও প্রাণ রক্ষা করো। আমার এবং পাণ্ডবদের প্রাণ এই বালকেরই অধীন। আমার পতি এবং তাঁর কুলের সকলের পিণ্ডের উত্তরাধিকারী এই বালকই। এর জীবন-দান করে পরলোকবাসী অভিমন্যুরও প্রিয় কাজ করো। শ্রীকৃষ্ণ! আমার পুত্রবধূ উত্তরা অভিমন্যুর বলা একটি কথা বারবার বলত, অভিমন্যু কোনো সময় স্নেহবশত উত্তরাকে বলেছিল—'কল্যাণী! তোমার পুত্র আমার মাতুলের কাছে বৃষ্ণি এবং অন্ধক কুলে গিয়ে ধনুর্বেদ, নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র এবং সম্পূর্ণ নীতিশাস্ত্র শিক্ষা করবে।' তার বলা এই কথা সত্য হওয়া উচিত। মধুসূদন! এই কুলের মঙ্গলের জন্য আমরা তোমার কাছে নতজানু হয়ে ভিক্ষা চাইছি; এই বালককে প্রাণদান করে কুরুবংশের কল্যাণ করো।"

এই বলে কুন্তী শোকে ব্যাকুল হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁকে ধরে বসালেন এবং সান্ত্বনাপূর্ণ বাক্যে তাঁকে ধৈর্য ধরতে বললেন। কুন্তী উঠে বসলে সুভদ্রা তাঁর ভ্রাতার দিকে তাকিয়ে কাঁদতে লাগলেন, আর্তস্বরে তিনি বললেন—"ভাই! তোমার সখা পার্থের পৌত্রের কী দশা দেখ। অভিমন্যুর পুত্র জন্মেই মারা গেছে—একথা শুনে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কী বলবেন? ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেবও কী ভাববেন? দ্রোণপুত্র আজ পাণ্ডবদের সর্বস্ব হরণ করেছে। শ্রীকৃষ্ণ! অভিমন্যু যে পাঁচ ভাইয়েরই প্রিয় ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তার পুত্রের এই খবর জেনে অশ্বত্থামার অস্ত্রে পরাজিত পাণ্ডবরা কী বলবেন? অভিমন্যুর মৃত পুত্র জন্ম নেবে, এর থেকে বেশি দুঃখের কথা আর কী হতে পারে? ভ্রাতা! আমি তোমার চরণে পড়ে তোমাকে প্রসন্ন করতে চাই। কুন্তী এবং দ্রৌপদীও তোমার পায়ে পড়েছেন, তাঁদের দেখো। দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা যখন এই গর্ভের সন্তানকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল, তখন তুমি ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বলেছিলে—'ব্রাহ্মণাধম! তোমার এই ইচ্ছা পূর্ণ হবে না। অর্জুনের পৌত্রকে আমি আমার প্রভাবে জীবিত করে দেব'—এই কথা আমি শুনেছি এবং তোমার শক্তিও আমি ভালোভাবে জানি। তাই আমার ইচ্ছা, তুমি প্রসন্ন হও যাতে অভিমন্যুর পুত্র জীবন লাভ করে। প্রতিজ্ঞা করেও যদি তা রক্ষা না করো, তবে জানবে আমি অবশ্যই প্রাণত্যাগ করব। তুমি থাকতে যদি অভিমন্যুর পুত্র জীবন ফিরে না পায়, তাহলে আমার জীবনে কী লাভ? মেঘ যেমন জলবর্ষণ করে ধূসর জমিকে সবুজে পরিণত করে, তেমনই তুমি অভিমন্যুর মৃত পুত্রকে জীবিত করে দাও। কেশব! তুমি ধর্মাত্মা, সত্যবাদী, সত্যপরাক্রমী, সুতরাং তোমার নিজের দেওয়া কথা তুমি অবশ্যই পূর্ণ করবে। শ্রীকৃষ্ণ, তুমি ইচ্ছা করলে মৃত্যুমুখে পতিত ত্রিলোকের প্রাণীদের বাঁচাতে পারো। সুতরাং তোমার ভাগিনেয়ের এই পুত্রকে রক্ষা করা তোমার পক্ষে এমনকি বড়ো ব্যাপার? আমি তোমার প্রভাব জানি। তাই প্রার্থনা করছি, পাণ্ডবদের অনুগ্রহ করো। ভ্রাতা! তুমি মনে করো যে, এ আমার ভগিনী অথবা যার পুত্র মারা গেছে সে দুঃখিনী মা অথবা শরণাগত এবং অসহায় অবলা আমাকে দয়া করো।"

উত্তরার বিলাপপূর্ণ প্রার্থনা এবং শ্রীকৃষ্ণের পরীক্ষিৎকে জীবন-দান

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! সুভদ্রার কথা শুনে ভগবান তাঁকে প্রসন্ন করার জন্য বললেন—'ভদ্রে, শান্ত হও, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে'। রৌদ্রস্নাত মানুষ যেমন ঠাণ্ডা জলে স্নান করে শান্তি পায় তেমনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই অমৃতময় কথা শুনে অন্তঃপুরের রমণীরা অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। শ্রীকৃষ্ণ তারপর শীঘ্র তোমার পিতার জন্মস্থান সেই সূতিকাগারে গেলেন। সেখানে তিনি দেখলেন সেই ঘরটি সাদা ফুলের মালায় বিধিপূর্বক সজ্জিত। তার চার দিকে জলপূর্ণ কলস রক্ষিত, নিন্দুক নামক কাঠের আগুন জ্বলছে, তাতে ঘিয়ের আহুতি দেওয়া হয়েছে। যত্র তত্র সরিষা ছড়ানো। অস্ত্রশস্ত্র সাজিয়ে রাখা হয়েছে এবং সবদিকে আগুন জ্বালানো হয়েছে। সেবা করার জন্য বৃদ্ধা ও যুবতী মহিলাগণ এবং কার্যকুশল কয়েকজন চিকিৎসক সেখানে উপস্থিত। এতদ্ব্যতীত রাক্ষসভয় নিবারণের জন্য নানাদ্রব্যও সেখানে সংগ্রহ করা হয়েছে। সূতিকাগৃহ এইরূপ প্রয়োজনীয় সামগ্রী দ্বারা সজ্জিত দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে এই সব ব্যবস্থার প্রশংসা করলেন।

তখনই অতি দ্রুত দ্রৌপদী সেখানে এসে উত্তরাকে বললেন—'কল্যাণী ! দেখো, তোমার শ্বশুরতুল্য, অচিন্ত্যাত্মা, অপরাজিত এবং সনাতন ঋষি ভগবান মধুসূদন এখানে আসছেন।' তাঁর কথা শুনে উত্তরা কান্না বন্ধ করে কাপড় দিয়ে সমস্ত দেহ ঢেকে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর ভগবদ্ বুদ্ধি ছিল, তাই তাঁকে আসতে দেখে সেই তপস্বিনী নারী ব্যথিত হৃদয়ে করুণ স্বরে গদগদ কণ্ঠে বললেন—'জনার্দন ! দেখুন, আজ আমি এবং আমার পতি উভয়েই সন্তানহীন হলাম। অভিমন্যু তো আগেই মৃত্যুবরণ করেছে, এখন আমাকেও পুত্রশোকে মৃত বলে মনে করুন। মধুসূদন ! আপনার শ্রীচরণে মাথা রেখে প্রার্থনা করছি যে আমার ওপর প্রসন্ন হয়ে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে দগ্ধ আমার পুত্রের জীবন-দান করুন। হায় ! এই গর্ভস্থ শিশুকে ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা মারার মতো ক্রূরতাপূর্ণ কর্ম করে দুর্বুদ্ধি অশ্বত্থামা কী পেল জানি না। জনার্দন ! আমি আপনার পায়ে পড়ে এই বালকের প্রাণভিক্ষা করছি। যদি সে জীবিত না হয়, তাহলে আমিও প্রাণত্যাগ করব। একে নিয়ে আমি অনেক আশা করেছিলাম ; কিন্তু অশ্বত্থামা সবকিছুর ওপর জল ঢেলে দিয়েছে। আমার আর বেঁচে থাকার কী প্রয়োজন ? আমার ইচ্ছা ছিল যে পুত্রকে কোলে নিয়ে আপনাকে প্রণাম করব, কিন্তু সবই বৃথা হয়ে গেল। মধুসূদন, অভিমন্যুর আপনার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ছিল, তাঁরই পুত্র আজ ব্রহ্মাস্ত্রের আঘাতে মৃত ; ওকে একবার চেয়ে দেখুন। আমি পতির কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে তাঁর যদি যুদ্ধে মৃত্যু হয়, তাহলে আমিও প্রাণত্যাগ করে তাঁর অনুগামিনী হব। কিন্তু আমি এতো কঠিন হৃদয় ও জীবনের প্রতি মোহকারী যে আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে পারিনি। এখন দেহত্যাগ করে তাঁর কাছে গেলে তিনি আমাকে কী বলবেন ?'

তপস্বিনী উত্তরা পুত্রশোকে উন্মাদিনীর ন্যায় করুণ স্বরে বিলাপ করতে করতে অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে এলে মৃত পুত্রকে কোলে নিয়ে বলতে লাগলেন—'পুত্র ! তুমি তো ধর্মজ্ঞ পিতার পুত্র, তাহলে বৃষ্ণিবংশের শ্রেষ্ঠ বীর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দেখে প্রণাম করছ না কেন ? উঠে দাঁড়াও আর কমলনয়ন জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মুখশোভা দেখ। আমি যেমন তোমার পিতার মুখশোভা দেখতাম, তেমন করে।' এইভাবে বিলাপ করতে করতে মৎসরাজকুমারী উত্তরা হাত জোড় করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করলেন। তাঁর ভীষণ বিলাপ শুনে শ্রীকৃষ্ণ আচমন করে অশ্বত্থামার নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র শান্ত করে দিলেন। তারপর বালককে বাঁচিয়ে তোলার প্রতিজ্ঞা করে তিনি সম্পূর্ণ জগৎকে শুনিয়ে উত্তরাকে বললেন—'পুত্রী ! আমি মিথ্যা বলি না, আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি, তা অবশ্যই সত্য হবে, দেখো ! আমি সকলের সামনে এখনই এই বালকের জীবন দান করব। আমি খেলাচ্ছলেও কখনো মিথ্যা বলিনি এবং যুদ্ধে কখনো পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিনি। এই সত্যের প্রভাবে অভিমন্যুর পুত্র যেন জীবিত হয়ে ওঠে। যদি ধর্ম ও ব্রাহ্মণ আমার বিশেষ প্রিয় হয়, তাহলে অভিমন্যুর এই পুত্র, যে জন্মেই মৃত্যুবরণ করেছে ; পুনরায় জীবন লাভ করুক। যদি আমার মধ্যে সত্য এবং ধর্মের নিরন্তর স্থিতি বজায় থাকে তাহলে এই মৃত বালক বেঁচে উঠবে। যদি কংস এবং কেশীকে আমি ধর্মপূর্বক বধ করে থাকি, তাহলে সেই সত্য প্রভাবের দ্বারা এই বালকের দেহে পুনরায় প্রাণসঞ্চার হোক।'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই কথাগুলি বলায় সেই বালকের চেতনা ফিরে এল এবং সে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস নিতে আরম্ভ করল।

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অভিমন্যুপুত্রের নামকরণ, পাণ্ডবদের হস্তিনাপুরে আগমন এবং যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞ আরম্ভ করার জন্য ব্যাসদেব ও শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ প্রদান

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ভগবান ব্রহ্মাস্ত্রকে ফিরিয়ে দেওয়ায় তোমার পিতার তেজে সূতিকাগৃহ দেদীপ্যমান হয়ে উঠল। বিঘ্নপ্রদানকারী রাক্ষসেরাও তৎক্ষণাৎ গৃহত্যাগ করে অন্তর্ধান করল। সেই সময় আকাশবাণী হল—'কেশব ! তুমি ধন্য।' সেই সঙ্গে প্রজ্বলিত অস্ত্র ব্রহ্মলোকে চলে গেল। তোমরা পিতা এইভাবে পুনর্জীবন প্রাপ্ত হলেন। উত্তরার শিশুপুত্র হাত-পা নাড়াতে লাগল, তাই দেখে ভরত বংশের রমণীগণ আনন্দে আপ্লুত হলেন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ করে স্বস্তিবাচন করালেন। তারপর সকলে আনন্দে মগ্ন হয়ে শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করতে লাগলেন। কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা এবং অন্যান্য নারীগণ নবজাতক জীবিত হওয়ায় অপার হর্ষান্বিত হলেন। সূত এবং মাগধেরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তব করলেন। উত্তরা অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে পুত্রকে ক্রোড়ে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করলেন এবং শ্রীকৃষ্ণও প্রসন্ন হয়ে নবজাতককে বহু উপহার দিলেন। যদুবংশীয়গণও শিশুকে নানাবস্তু উপহার দিলেন। তারপর সত্যপ্রতিজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ তোমার পিতার নামকরণ করলেন—"কুরুকুল পরিক্ষীণ হয়ে যাওয়ার পর অভিমন্যুর এই সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, তাই এর নাম 'পরীক্ষিৎ' হওয়া উচিত।"

জনমেজয় ! নামকরণ হওয়ার পর তোমার পিতা পরীক্ষিৎ কালক্রমে বেড়ে উঠতে লাগলেন। তাঁর দিকে তাকালে সকলেরই মন প্রসন্ন হয়ে উঠত। তোমার পিতা যখন একমাসের তখন পাণ্ডবরা বহু ধনরত্ন নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন। যদুবংশীয়েরা যখন শুনলেন পাণ্ডবরা নগরের কাছাকাছি এসেছেন, তখন তাঁরা তাঁদের স্বাগত জানাতে নগরের বাইরে গেলেন। হস্তিনাপুরের পুরবাসীগণ নানা সুন্দর ফুল ও পতাকায় হস্তিনাপুর নগরীকে সাজালেন। তাঁরা নিজেদের ঘরও সাজালেন। বিদুর দেবমন্দিরগুলিতে বিশেষ পূজার নির্দেশ দিলেন।

পাণ্ডবদের আসার খবর পেয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বন্ধু এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। সকলে একত্র হলে ধর্মানুসারে প্রণাম ও আলিঙ্গন করলেন, তারপর পাণ্ডব এবং যদুবংশীয় বীররা একসঙ্গে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করলেন। ধনরাশি তাঁদের অগ্রে ছিল। পাণ্ডবগণ তাঁদের মিত্র এবং মন্ত্রীসহ অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। তাঁরা একত্রে সর্বপ্রথম রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গেলেন এবং সকলে নিজ নিজ নাম বলে তাঁকে প্রণাম করলেন। এরপর তাঁরা গান্ধারী, কুন্তী এবং বিদুরকে সম্মান জানিয়ে তারপর যুযুৎসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁরা তোমার পিতার জন্মের অত্যন্ত অদ্ভুত এবং আশ্চর্যজনক সংবাদ এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক কর্মের কথা শুনে তাঁর প্রশংসা করলেন।

এর কিছুদিন পর মহাতেজস্বী সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেব হস্তিনাপুরে পদার্পণ করলেন। পাণ্ডবরা তাঁর যথোচিত পূজা ও আপ্যায়ন করলেন এবং বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় বীরদের সঙ্গে তাঁর সেবায় রত হলেন। নানা কুশল সংবাদ আদান-প্রদানের পর ধর্মনন্দন যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবকে বললেন—'মুনিবর ! আপনার কৃপায় যে রত্ন আনয়ন করা হয়েছে, অশ্বমেধ যজ্ঞে তা ব্যবহার করতে চাই। এরজন্য আপনার আদেশের অপেক্ষা করছি। আমরা সকলে আপনার ও শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রিত।'

ব্যাসদেব বললেন—রাজন্ ! আমি তোমাদের যজ্ঞ করার জন্য অনুমতি প্রদান করছি। এরপর যা প্রয়োজনীয় কর্ম, তা আরম্ভ করো। যথাযথ দক্ষিণা দিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করো। অশ্বমেধ যজ্ঞ সব পাপ থেকে মুক্তিদান করে। সেই যজ্ঞ করে তুমি নিঃসন্দেহে পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

ব্যাসদেবের কথা শুনে ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। মহর্ষি ব্যাসের অনুমতি নিয়ে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়ে বললেন—'পুরুষোত্তম ! আমরা আপনার জন্যই এই সব উত্তম ভোগ উপভোগ করছি। আপনি নিজ পরাক্রম এবং বুদ্ধির সাহায্যে এই সম্পূর্ণ পৃথিবী জয় করেছেন। সুতরাং আপনি যজ্ঞের দীক্ষা নিয়ে শুভকাজ আরম্ভ করুন ; কারণ আপনি আমাদের পরম গুরু। আপনি যজ্ঞ করলে আমাদের সব পাপ অবশ্যই বিনাশপ্রাপ্ত হবে। আপনিই যজ্ঞ, অক্ষর, সর্বরূপ, ধর্ম, প্রজাপতি ও সমস্ত প্রাণীদের গতি—এ আমার নিশ্চিত ধারণা।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—মহারাজ ! এরূপ বলা আপনার

পক্ষেই যোগ্য। আমার বিশ্বাস যে আপনিই সমস্ত প্রাণীকে সাহায্য প্রদান করবেন ; কারণ আপনি ধর্মের দ্বারা সুশোভিত। আমরা সকলে আপনার অঙ্গ বা সহায়ক, আপনাকে আমাদের রাজা ও গুরুজন বলে মনে করি। সুতরাং আপনি আমাদের সম্মতিতে নিজেই এই যজ্ঞ করুন এবং আমাদের যাকে যে কাজের ভার দিতে চান, তার জন্য নির্দেশ প্রদান করুন। আমি আপনার কাছে সত্য প্রতিজ্ঞা করছি যে আপনি যা বলবেন, তাই করব। আপনি যজ্ঞ করলে সেই যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবও প্রাপ্ত হবে।

—০—

ব্যাসদেবের নির্দেশে অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য মনোনীত অশ্বের রক্ষার জন্য অর্জুনকে নিয়োগ করা এবং অশ্বকে সেনাসহ অর্জুনের অনুগমন

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবকে সম্বোধন করে বললেন—মুনিশ্রেষ্ঠ ! আপনি যখন যজ্ঞ আরম্ভ করার উপযুক্ত সময় বুঝবেন, তখন আমাকে যজ্ঞের দীক্ষা দেবেন। কারণ আমার যজ্ঞ আপনারই অধীন।

ব্যাসদেব বললেন—রাজন্ ! যজ্ঞের সময় যখন হবে, তখন আমি, যাজ্ঞবল্ক্য সকলে এসে পূর্ণমর্যাদায় তোমার যজ্ঞ সম্পন্ন করাব। চৈত্র পূর্ণিমায় তোমাকে যজ্ঞের দীক্ষা প্রদান করা হবে, ততদিন তুমি তার জন্য জিনিসপত্র একত্রিত করো। অশ্ববিদ্যা জ্ঞাত সূত এবং ব্রাহ্মণ যজ্ঞের জন্য পবিত্র অশ্ব পরীক্ষা করবেন। যে অশ্ব মনোনীত হবে, শাস্ত্রবিধি অনুসারে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং সে তোমার দেদীপ্যমান যশ ছড়াতে ছড়াতে আসমুদ্র হিমাচল ঘুরে আসবে।

সেই কথা শুনে রাজা যুধিষ্ঠির সম্মত হয়ে ব্যাসদেবের কথা অনুসারে সমস্ত কর্ম সম্পাদন করলেন। তিনি মনে মনে যেসব সামগ্রী একত্রিত করার সংকল্প করেছিলেন, সেসব এনে মহর্ষি ব্যাসকে সংবাদ দিলেন। তখন ব্যাসদেব বললেন—'রাজন্ ! আমরা যথাসময় উত্তম যোগে তোমাকে দীক্ষা দিতে প্রস্তুত। এর মধ্যে তুমি সোনার 'স্ফ্যা' এবং 'কূর্চ' তৈরি করিয়ে নাও, এছাড়া আরও যা সোনার জিনিস প্রয়োজন, তা-ও তৈরি করে ফেলো। শাস্ত্রবিধি অনুসারে আজ যজ্ঞসম্পর্কীয় অশ্বকে পৃথিবীতে ছেড়ে দিতে হবে, সেইসঙ্গে এমন ব্যবস্থা করা উচিত যাতে সেই অশ্ব সুরক্ষিতভাবে সর্বত্র বিচরণ করতে পারে।'

যুধিষ্ঠির বললেন—মুনিবর ! অশ্ব এসে গেছে, একে কীভাবে ছাড়া হবে, যাতে এ তার ইচ্ছানুসারে সমগ্র পৃথিবী ঘুরে আসতে পারে, আপনি সেই ব্যবস্থা করুন এবং বলুন এই ইচ্ছানুযায়ী ঘুরে বেড়ানো ঘোড়াটির রক্ষার জন্য কাকে নিযুক্ত করা যায় ?

জনমেজয় ! যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসার উত্তরে মহর্ষি ব্যাস বললেন—'রাজন্ ! সমস্ত ধনুর্ধারীর মধ্যে অর্জুন শ্রেষ্ঠ, সে বিজয়লাভে উৎসাহী, সহনশীল এবং ধৈর্যবান। সুতরাং সে-ই এই অশ্ব রক্ষা করতে সক্ষম। সে নিবাত কবচ বিনাশ করেছে, সম্পূর্ণ ভূমণ্ডল জয় করার শক্তি তার আছে, তার কাছে দিব্য অস্ত্র, দিব্য কবচ, দিব্য ধনুক ইত্যাদি আছে, সুতরাং অর্জুনেরই অশ্বের রক্ষক হিসাবে যাওয়া উচিত। সে ধর্ম ও অর্থ কুশল এবং সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী, সুতরাং সে শাস্ত্রবিধি অনুসারে অশ্ব সঞ্চালন করবে। অত্যন্ত তেজস্বী পরম পরাক্রমী ভীমসেন এবং নকুল—এই দুই বীর রাজ্য রক্ষায় পূর্ণ সক্ষম, সুতরাং এরা রাজকার্য দেখাশোনা করবে এবং পরম বুদ্ধিমান সহদেব আত্মীয়কুটুম্ব, মিত্র-বন্ধুদের দেখাশোনা করবে।

ব্যাসদেবের কথা শুনে যুধিষ্ঠির সেইমতো সব কাজ করলেন এবং অর্জুনকে ডেকে অশ্বের বিষয়ে জানালেন—'বীর অর্জুন ! তোমার ওপর এই অশ্বটির রক্ষার ভার অর্পণ করা হচ্ছে, পরম নিষ্ঠায় একে সংরক্ষণ করো। তুমিই একে রক্ষা করতে সক্ষম অন্য কারো দ্বারা এই কাজ হওয়া অসম্ভব। মহাবাহু ! তুমি অবশ্যই স্মরণ রেখো, অশ্বকে রক্ষা করার সময় যে রাজা তোমার সম্মুখীন হবেন, তাদের সঙ্গে যেন ভীষণ যুদ্ধ না করতে হয়, সেই চেষ্টা করবে এবং সেইসব রাজাদের আমার যজ্ঞের সংবাদ জানিয়ে তাঁদের যথাসময়ে যজ্ঞে আসার আমন্ত্রণ জানাবে।'

ভ্রাতা সব্যসাচী অর্জুনকে এইভাবে সবকিছু বুঝিয়ে

ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির ভীম ও নকুলকে নগর রক্ষার ভার সমর্পণ করে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি নিয়ে সহদেবকে আত্মীয়স্বজনের দেখাশোনার ভার অর্পণ করলেন। তারপর দীক্ষা প্রদানের সময় হলে ব্যাসদেব এবং মহান ঋত্বিকেরা রাজাকে বিধিপূর্বক যজ্ঞের দীক্ষা দিলেন এবং যজ্ঞের জন্য নির্দিষ্ট অশ্বকে স্বয়ং ব্রহ্মবাদী ব্যাসদেব শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে ছেড়ে দিলেন। ধর্মরাজের নির্দেশে অর্জুন ঘোড়াকে অনুসরণ করতে লাগলেন। অশ্বটি কৃষ্ণসার মৃগের ন্যায় শ্যাম বর্ণের ছিল। অশ্বের পিছনে চলার সময় অর্জুন গাণ্ডীব ধনুকে টংকার দিচ্ছিলেন। তিনি তাঁর হাতে বৃষের চামড়ার দস্তানা পরেছিলেন এবং অত্যন্ত প্রসন্নতা

সহকারে অশ্বকে অনুসরণ করছিলেন। অর্জুনের রওনা হওয়ার সময় আবালবৃদ্ধ বণিতা তাঁকে দেখবার জন্য হস্তিনাপুরের পথে এসে দাঁড়াল। সেই সময় কলরব কোলাহলে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছিল। উদারবুদ্ধি অর্জুন শুনতে লাগলেন—'ভারত ! তোমার কল্যাণ হোক, তুমি সুখে গমন করো এবং কুশলপূর্বক ফিরে এসো।' অন্যেরা বলতে লাগল—'অর্জুন ! তোমার যাত্রা সুখময় হোক, পথে যেন কোনো কষ্ট না হয়, কোনো ভয় না থাকে, তুমি নিশ্চয়ই কুশলে ফিরবে এবং আমাদের দর্শন দেবে।' অর্জুন যেতে যেতে এইভাবে মিষ্ট কথা শুনতে লাগলেন। যাজ্ঞবল্ক্য মুনির এক বিদ্বান শিষ্য, যিনি যজ্ঞকর্মে চতুর এবং বেদ-পারঙ্গম, তিনি বিঘ্ন শান্তির জন্য অর্জুনের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। তিনি ছাড়াও বহু বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ধর্মরাজের নির্দেশে পার্থকে অনুসরণ করলেন। সেই অশ্ব পাণ্ডবদের অস্ত্রবলে বিজিত পৃথিবীর নানা দেশ ইচ্ছানুযায়ী বিচরণ করতে লাগল। সেই সব দেশগুলিতে শত্রুদের সঙ্গে অর্জুনকে যেসব যুদ্ধ করতে হল, তার বৃত্তান্ত শোনাচ্ছি। যজ্ঞের অশ্ব পৃথিবী পরিভ্রমণ করতে করতে সর্বপ্রথম উত্তর দিকে গেল। তারপর বহু রাজ্য ভ্রমণ করে পূর্ব দিকে গেল। মহারথী অর্জুন তাকে অনুসরণ করছিলেন। সেই সময় কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবদের হাতে যাদের বন্ধুবান্ধব মারা পড়েছিল, সেইসব অসংখ্য রাজাদের সঙ্গে অর্জুনকে যুদ্ধ করতে হল। বহু কিরাত, যবন, ম্লেচ্ছ, যারা আগে পাণ্ডবদের হাতে পরাজিত হয়েছিল, তারা অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এল। এইরূপ বিভিন্ন দেশের রাজাদের সঙ্গে অর্জুনকে অনেক বার যুদ্ধ করতে হল।

অর্জুন কর্তৃক ত্রিগর্তাদির পরাজয়

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যেসব ত্রিগর্তবীর মারা গিয়েছিলেন, তাঁদের মহারথী পুত্র এবং পৌত্রগণ অর্জুনের সঙ্গে শত্রুতা করতে লাগলেন। অর্জুন ত্রিগর্ত দেশে গেলে তাঁদের সঙ্গে ভয়ানক যুদ্ধ হল। পাণ্ডবদের যজ্ঞের অশ্ব তাঁদের রাজ্য সীমায় উপস্থিত জেনে ত্রিগর্ত বীরেরা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে রথে করে যজ্ঞের ঘোড়াটিকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরবার চেষ্টা করতে লাগলেন। অর্জুন তাঁদের মনোভাব বুঝে তাঁদের নিরস্ত করার জন্য চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁরা অর্জুনের কথায় গুরুত্ব না দিয়ে তাঁর ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। অর্জুন বারবার নিষেধ করে তাঁদের ফিরে যেতে বললেন। তিনি প্রথমে যুদ্ধ করতে চাইছিলেন না কারণ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁকে এই বলে নিষেধ করেছিলেন যে, 'যে সব রাজাদের আত্মীয়স্বজন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত হয়েছেন, তাঁদের বধ

করা উচিত নয়।' ধর্মরাজের নির্দেশ মেনেই অর্জুন ত্রিগর্তদের ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তাঁরা ফিরে যেতে প্রস্তুত ছিলেন না। তখন ত্রিগর্তরাজ সূর্যবর্মাকে বাণ বিদ্ধ করে অর্জুন হাসতে লাগলেন। তা দেখে ত্রিগর্তদেশের বীরেরা রথের গুঞ্জনে সমস্ত দিক গুঞ্জরিত করে ধনঞ্জয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সূর্যবর্মা তাঁর হস্তকৌশল দেখাবার জন্য অর্জুনকে একশত বাণ মারলেন এবং তাঁর যেসব মহান ধনুর্ধারী বীর অনুচর ছিল, তারাও অর্জুনকে বধ করার ইচ্ছায় তাঁর ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগল। কিন্তু অর্জুন তাঁর ধনুক থেকে বাণ নিক্ষেপ করে সমস্ত বাণ কেটে ফেললেন। সেই সব বাণ টুকরো টুকরো হয়ে মাটিতে পড়তে লাগল।

সূর্যবর্মা পরাজিত হলে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা তেজস্বী নবযুবক কেতুবর্মা যশস্বী অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। কেতুবর্মাকে আক্রমণ করতে দেখে বীরবর অর্জুন তীক্ষ্ণ বাণে তাঁকে বধ করলেন। তাঁর মৃত্যু হলে মহারথী ধৃতবর্মা রথে করে শীঘ্রই সেখানে এসে অর্জুনের ওপর বাণের ঝড় বইয়ে দিলেন। ধৃতবর্মা বয়সে বালক হলেও, তাঁর এই দক্ষতা দেখে অর্জুন অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। ধৃতবর্মা যে কখন বাণ হাতে নিচ্ছেন আর কখন তা নিক্ষেপ করছেন—অর্জুন তা বুঝতেই পারছিলেন না। শুধু বাণের বর্ষণই বুঝতে পারছিলেন। তিনি রণক্ষেত্রে মনে মনে কিছুক্ষণ ধৃতবর্মার প্রশংসা করলেন এবং তাঁর উৎসাহ বৃদ্ধি করতে লাগলেন। ধৃতবর্মা যদিও সাপের মতো ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু কৌরববীর অর্জুন ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে রক্ষা করছিলেন, তাঁর প্রাণ হরণ করেননি। অমিত তেজস্বী অর্জুন তাঁকে জেনে শুনে ছেড়ে দেওয়ায় ধৃতবর্মা তাঁর ওপর এক প্রজ্বলিত বাণ নিক্ষেপ করলেন, তাতে অর্জুন হাতে অত্যন্ত আঘাত পেলেন। অর্জুনের মাথা ঘুরে গেল এবং গাণ্ডীব ধনুক হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেল। ধৃতবর্মা তা দেখে অট্টহাস্য করে উঠলেন। অর্জুন হাতের রক্ত মুছে ক্রোধে রক্তচক্ষু হয়ে ধনুক হাতে নিয়ে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। তখন ত্রিগর্ত দেশের যোদ্ধারা চারদিক দিয়ে অর্জুনকে ঘিরে ধরল। তা লক্ষ্য করে অর্জুন বজ্রসম লৌহ বাণবর্ষণ করে আঠারো জন যোদ্ধাকে মৃত্যুমুখে পাঠালেন। তখন ত্রিগর্তের যোদ্ধারা পালাতে লাগল। অর্জুন তখন হাসতে হাসতে তাদের সর্পাকার বাণে মারতে লাগলেন। তাঁর বাণে আহত হয়ে ত্রিগর্ত বীরদের সাহস দূর হয়ে গেল, তারা চতুর্দিকে পালিয়ে গেল। বহু যোদ্ধা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে অর্জুনকে বলল—'পার্থ ! আমরা তোমার আদেশবহনকারী সেবক এবং সর্বদা তোমার অধীন থাকব। কৌরবনন্দন ! আমরা বিনীত দাসের মতো তোমার সামনে রয়েছি, আদেশ করো, কী করব ? আমরা তোমার সমস্ত প্রিয় কাজ করতে প্রস্তুত।' তাদের কথা শুনে অর্জুন বললেন—'রাজাগণ ! যদি জীবন রক্ষা করতে চাও, তাহলে আমাদের শাসন মেনে নাও।'

—০—

প্রাগজ্যোতিষপুরে বজ্রদত্তের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ এবং বজ্রদত্তের পরাজয়

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! তারপর যজ্ঞের অশ্ব প্রাগজ্যোতিষপুরের কাছাকাছি বিচরণ করতে লাগল। ভগদত্তের পুত্র বজ্রদত্ত সেখানে রাজত্ব করতেন। তিনি যখন শুনলেন যে পাণ্ডবদের ঘোড়া তাঁর রাজ্য সীমানায় এসেছে, তিনি নগরের বাইরে বেরিয়ে সেই ঘোড়া ধরলেন এবং সেটি সঙ্গে করে নগরে ফিরতে লাগলেন। তাই দেখে মহাবাহু অর্জুন গাণ্ডীব ধনুকে টংকার দিয়ে তাঁকে আক্রমণ করলেন। গাণ্ডীব নিক্ষিপ্ত বাণে ব্যাকুল হয়ে রাজা বজ্রদত্ত ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে নগরে প্রবেশ করে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিশাল গজে চড়ে যুদ্ধ করতে এলেন। মহারথী অর্জুনের কাছে এসে বালকসুলভ চাপল্যে তিনি অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। বজ্রদত্তের হাতি পর্বতের ন্যায় উঁচু ছিল। তার গণ্ডস্থল দিয়ে মদের ধারা বইছিল। সে প্রভুর অধীন থাকলেও যুদ্ধে মত্ত হয়ে উঠল। বজ্রদত্ত কুপিত হয়ে হাতির পিঠে উঠে অর্জুনের দিকে এগোলেন। রাজার অঙ্কুশের আঘাতে সেই মহাবলী গজ এমনভাবে এগোল, যেন আকাশে উড়ে যেতে চায়। বজ্রদত্তকে এইভাবে আক্রমণ করতে দেখে অর্জুন ক্রুদ্ধ হয়ে পদব্রজেই হাতির ওপর আসীন বজ্রদত্তের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। বজ্রদত্ত রোষভরে অর্জুনের ওপর অগ্নির ন্যায় বাণ নিক্ষেপ

করলেন। সেই অস্ত্র উড়ন্ত পতঙ্গের ন্যায় অর্জুনের দিকে এলে অর্জুন গাণ্ডীব ধনুক থেকে বহু বাণ নিক্ষেপ করে সেই অস্ত্রকে শতচূর্ণ করে দিলেন। তা লক্ষ্য করে বজ্রদত্ত অর্জুনের ওপর নিরবচ্ছিন্ন বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। অর্জুনও কুপিত হয়ে দ্রুত ভগদত্তের পুত্রকে বাণের নিশানা করলেন। সেই বাণের আঘাতে মহাতেজস্বী রাজা অত্যন্ত আহত হলেন এবং হাতির পিঠ থেকে নীচে পড়ে গেলেন ; কিন্তু তাতেও তিনি অচৈতন্য হননি। তারপর বজ্রদত্ত পুনরায় হাতিতে করে এসে ধৈর্য সহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। অর্জুনকে পরাস্ত করার জন্য তিনি তাঁর দিকে হাতি নিয়ে এগোলেন, তা লক্ষ্য করে অর্জুন ক্রোধান্বিত হয়ে হাতির ওপর জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় তেজস্বী বাণের আঘাত করলেন। সেই আঘাতে গজরাজের শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে রক্তের ধারা বইতে লাগল। তখন সেই গজরাজকে দেখে মনে হচ্ছিল পর্বতের গা থেকে লাল ঝরনার জল পড়ছে।

রাজা বজ্রদত্তের সঙ্গে অর্জুনের তিন দিন ধরে সমানে যুদ্ধ হতে লাগল। চতুর্থ দিন মহাবলী বজ্রদত্ত অট্টহাস্য করে বললেন—'অর্জুন ! দাঁড়াও, আমি আর তোমাকে জীবিত রাখব না। তোমাকে মেরে পিতার উদ্দেশ্যে তর্পণ করব। আমার পিতা ভগদত্ত তোমার পিতার মিত্র ছিলেন, তা সত্ত্বেও তুমি তাঁকে হত্যা করেছ। তিনি বৃদ্ধ হয়েছিলেন, তাই তুমি তাঁকে মারতে সক্ষম হয়েছিলে। তাঁর পুত্র আমি আজ তোমার সামনে উপস্থিত, আমার সঙ্গে যুদ্ধ করো।' এই বলে ক্রোধভরে বজ্রদত্ত পুনরায় অর্জুনের দিকে হাতি নিয়ে এগোলেন। প্রভুর ইশারা বুঝে গজরাজ নৃত্য করতে করতে তৎক্ষণাৎ মহারথী অর্জুনের কাছে পৌঁছাল। তা দেখেও অর্জুন ভীত হলেন না, অপরপক্ষে তিনি পূর্বের শত্রুতা স্মরণ করে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তারপর বাণবর্ষণ করে গজরাজের গতি রুদ্ধ করলেন। হাতির গতি রুদ্ধ হতে দেখে ভগদত্তকুমার ক্রোধে আত্মহারা হয়ে অর্জুনের ওপর তীক্ষ্ণ বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। সেই সঙ্গে পর্বতাকার গজরাজকে বলপূর্বক এগিয়ে নিয়ে চললেন। অর্জুন তা দেখে হাতির ওপর অগ্নিসম তেজস্বী নারাচ দিয়ে আঘাত করলেন। সেই নারাচ হাতির মর্মস্থানে গভীর আঘাতের সৃষ্টি করে এবং বজ্রাঘাতে যেমন পর্বত পতিত হয়, হাতিটিও তেমন করে মাটির ওপর সশব্দে পড়ল। সেই সঙ্গে বজ্রদত্তও নীচে পড়ে গেলেন। তাঁকে মাটিতে পড়তে দেখে পাণ্ডুনন্দন অর্জুন বললেন—রাজন্ ! ভয় পেয়ো না। আমি আসার সময় মহাতেজস্বী রাজা যুধিষ্ঠির বলে দিয়েছেন, 'ধনঞ্জয় ! তুমি কোনো রাজাকে হত্যা করবে না এবং যুদ্ধ শুরু করে যোদ্ধাদের প্রাণ নেবে না। পথে যে রাজাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে তাদের নিমন্ত্রণ করে বলবে আপনারা আপনাদের আত্মীয়-বন্ধুসহ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে পদার্পণ করে সেখানে উৎসবে অংশগ্রহণ করবেন।' ভ্রাতার নির্দেশ মেনে নিয়ে আমি তোমাকে বধ করব না। তোমার কোনো ভয় নেই। ওঠো এবং গৃহে ফিরে যাও। আগামী চৈত্র পূর্ণিমাতে ধর্মরাজের অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ হবে। সেই সময় তুমি অবশ্যই উপস্থিত থাকবে।'

অর্জুনের কথা শুনে তাঁর দ্বারা পরাজিত বজ্রদত্ত বললেন—'যথা আজ্ঞা, আমি অবশ্যই যাব।'

অর্জুনের সৈন্ধব বীরদের সঙ্গে যুদ্ধ এবং দুঃশলার চেষ্টায় তার সমাপ্তি

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! এরপর মহাভারত যুদ্ধের পর জীবিত থাকা সিন্ধুদেশের বীরদের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ হয়। যজ্ঞের ঘোড়াকে নিজেদের রাজ্য সীমানার মধ্যে পেয়ে সিন্ধুদেশের ভয়ানক ক্ষত্রিয়গণ অর্জুনকে একটুও ভয় পেলেন না। তাঁরা আগে অর্জুনের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন, এখন অর্জুনকে পরাস্ত করতে চাইছিলেন, তাই সেই মহাপরাক্রমী বীরগণ পার্থকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরে বাণবর্ষণ করে ঢেকে দিলেন। তাঁরা এক হাজার রথ এবং দশ হাজার ঘোড়ার দ্বারা ধনঞ্জয়কে বেষ্টন করে মনে মনে আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুন যে জয়দ্রথকে বধ করেছিলেন, এঁরা সেই কথা ভুলতে পারছিলেন না। এখন তাঁরা বৃষ্টির মতো বাণবর্ষণ করছিলেন। তাঁদের বাণে আচ্ছাদিত হয়ে কুন্তীনন্দন অর্জুন মেঘে ঢাকা সূর্যের ন্যায় শোভা পাচ্ছিলেন। তাঁকে বাণের আঘাতে পীড়িত দেখে ত্রিলোকে হাহাকার পড়ে গেল। সেই সময় হতবুদ্ধি হয়ে অর্জুনের হাত থেকে ধনুক ও দস্তানা পড়ে গেল। তাঁকে অচেতন দেখে সিন্ধু বীরেরা ভীষণভাবে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। অর্জুনের সংকটাপন্ন অবস্থা

দেখে দেবতারাও মনে মনে ভীত হয়ে শান্তির উপায় ভাবতে লাগলেন। তারপর দেবতাদের প্রচেষ্টায় অর্জুনের তেজ পুনরায় উদ্দীপ্ত হল এবং উত্তম অস্ত্রবিদ, পরম বুদ্ধিমান ধনঞ্জয় রণক্ষেত্রে পর্বতের ন্যায় অচলভাবে দাঁড়ালেন। তিনি ধনুকে টংকার দিতে লাগলেন এবং ইন্দ্র যেমন জলবর্ষণ করেন, তেমনভাবে শত্রুর ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। পার্থের বাণে আচ্ছাদিত হয়ে সৈন্ধব বীররা পক্ষী আবৃত বৃক্ষের ন্যায় রাজার সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। বহু যোদ্ধা গাণ্ডীবের আওয়াজ শুনে কেঁপে উঠলেন, আরও অনেকে ভয়ে পালিয়ে গেলেন, অনেকে শোকে অশ্রুজল ফেলতে লাগলেন। সেই সময় অর্জুন অলাতচক্রের ন্যায় ঘুরে ঘুরে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। তিনি চারিদিকে ইন্দ্রজালের মতো বাণের জাল সৃষ্টি করলেন। এরপর সিন্ধুদেশের বীররা পুনরায় সংগঠিত হয়ে ফিরে এলেন এবং অর্জুনের ওপর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। ধর্মজ্ঞ অর্জুন তখন রণোন্মত্ত সিন্ধু বীরদের বললেন—'যোদ্ধাগণ ! আমি তোমাদের কল্যাণের কথা বলছি, তোমাদের মধ্যে যে কেউ নিজ পরাজয় স্বীকার করে বলবে যে 'আমি আপনার, আপনি আমাকে যুদ্ধে জয় করেছেন', সে যদি সামনে এসে দাঁড়ায় তবুও তাকে আমি বধ করব না। আমার কথা শুনে তোমাদের যা মঙ্গল মনে হয়, তাই করো।' এই কথা বলে কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জুন অত্যন্ত কুপিত ও ক্রোধান্বিত হয়ে সৈন্ধব বীরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। সৈন্ধবেরা অর্জুনের ওপর লক্ষ লক্ষ বাণবর্ষণ করলেন। কিন্তু অর্জুন তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে সব বাণ দ্বিখণ্ডিত করে প্রত্যেক যোদ্ধাকে তীক্ষ্ণ বাণে আঘাত করতে লাগলেন। তা দেখে জয়দ্রথ-বধ স্মরণ করে সিন্ধু বীররা অর্জুনকে বধ করার জন্য পুনরায় তাঁর ওপর শক্তি ও প্রাস নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু তাঁদের চেষ্টা ব্যর্থ হল। মহাবলী ধনঞ্জয় তাঁদের শক্তি ও প্রাস মধ্যপথেই টুকরো করে দিয়ে ভীষণ জোরে গর্জন করে উঠলেন এবং বিজয় অভিলাষে আক্রমণকারী সিন্ধুবীরদের মস্তক ভল্লের আঘাতে কেটে ফেলতে লাগলেন।

সমস্ত সিন্ধুবীর কষ্ট পাচ্ছেন জেনে ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা দুঃশলা তাঁর পুত্র সুরথের সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে রথে করে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। তাঁর আসার উদ্দেশ্য ছিল যাতে সব যোদ্ধা যুদ্ধ পরিত্যাগ করে শান্ত হয়ে যায়। তিনি অর্জুনের কাছে গিয়ে আর্তভাবে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তাঁকে দেখে ধনঞ্জয় ধনুক নীচে ফেলে দিলেন। পরে ভগিনীর বিধিমতো আপ্যায়ন করে বললেন—'কল্যাণী ! বল, তোমার জন্য কী করব ?' দুঃশলা বললেন—'ভরতশ্রেষ্ঠ ! এ তোমার ভাগিনেয়র পুত্র, তোমাকে প্রণাম

জানাচ্ছে, একে দেখো।' একথা শুনে অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভগিনী ! এই বালকের পিতা কোথায় ?' দুঃশলা বললেন—'ভ্রাতা ! আমার পুত্র আগেই শুনেছিল যে অর্জুনের হাতে তার পিতার মৃত্যু হয়েছে। তারপর যখন তার কানে এই সংবাদ এল যে অর্জুন অশ্বের পিছনে এখানে এসে পৌঁছেছে, তখন সে দুঃখে পীড়িত হয়ে মাটিতে পড়ে যায় এবং তখনই তার প্রাণপাখি বেরিয়ে যায়। তার সেই অবস্থা দেখে শরণ নেবার জন্য আমি এখন তোমার কাছে এসেছি।' এই বলে দুঃশলা আর্তস্বরে বিলাপ করতে লাগলেন। তাঁর এই দীন অবস্থা দেখে অর্জুনও দীনভাবে মাথা নীচু করলেন। দুঃশলা আবার বলতে লাগলেন—'ভ্রাতা ! তুমি কুরুকুলে শ্রেষ্ঠ এবং ধর্মজ্ঞ। এই দুঃখী ভগিনী এবং ভাগিনেয়র পুত্রকে দেখো। মন্দবুদ্ধি দুর্যোধন এবং জয়দ্রথকে ভুলে যাও। যেমন অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ, তেমনই সুরথের পুত্র আমার এই পৌত্র। একে ক্রোড়ে নিয়ে আমি তোমার শরণ নিতে এসেছি। আমি চাই সকল যোদ্ধা শান্ত হোক আর তুমি এই নিরীহ শিশুকে কৃপা করো। এ তোমার চরণে মাথা রেখে শান্তি ভিক্ষা করছে ; অতএব শান্ত হয়ে যাও। এই বালক নিতান্ত অবোধ—কিছুই জানে না, এর ভ্রাতা বন্ধু সব বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে ; সুতরাং এর ওপর দয়া করো। ক্রোধ পরিত্যাগ করো।

দুঃশলার এই করুণ বাক্য শুনে অর্জুনের শোকাক্রান্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারী দেবীর কথা স্মরণ হল, তিনি ক্ষত্রিয় ধর্মকে তিরস্কার করে বললেন—'রাজ্য লোভী এবং অভিমানের মূর্তি সেই নীচ দুর্যোধনকে ধিক্, যার জন্য আমরা আমাদের সকল আত্মীয়-বন্ধুকে যমালয়ে প্রেরণ করেছি।' এই বলে অর্জুন দুঃশলাকে অনেক সান্ত্বনা প্রদান করলেন এবং প্রসন্নতা সহকারে তাঁকে গৃহে পাঠালেন। দুঃশলাও সেই মহাযুদ্ধ থেকে তাঁর যোদ্ধাদের ফিরিয়ে আনলেন এবং অর্জুনের প্রশংসা করতে করতে গৃহে ফিরলেন। এইভাবে সিন্ধু বীরদের পরাজিত করে ধনঞ্জয় দ্রুত এগিয়ে যাওয়া স্বেচ্ছায় বিচরণকারী সেই অশ্বের পিছন পিছন তীব্র গতিতে চলতে লাগলেন। অশ্বটি ক্রমশ একের পর এক দেশ পেরিয়ে অর্জুনের পরাক্রম বৃদ্ধি করে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করতে থাকল। ঘুরতে ঘুরতে সেই অশ্ব অর্জুনসহ মণিপুর রাজার রাজ্যে গিয়ে পৌঁছাল।

অর্জুন ও বভ্রুবাহনের যুদ্ধ এবং অর্জুনের মৃত্যু

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! মণিপুরের রাজা বভ্রুবাহন যখন তাঁর পিতা অর্জুনের আসার সংবাদ পেলেন, তখন তিনি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে করে বহু ধন নিয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তাঁর দর্শন লাভের জন্য নগরের বাইরে এলেন। মণিপুর নরেশকে এইভাবে আসতে দেখে পরম বুদ্ধিমান ধনঞ্জয় ক্ষত্রিয় ধর্ম স্মরণ করে তাঁকে সম্মান জানালেন না। উল্টে কুপিত হয়ে বললেন—'পুত্র ! তোমার এই কাজ ঠিক নয়। আমি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের অশ্ব রক্ষা করতে করতে তোমার রাজ্যের মধ্যে এসেছি ; তা সত্ত্বেও তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করছ না কেন ? দুর্মতে ! তুমি ক্ষত্রিয় ধর্ম থেকে বহিষ্কৃত হয়ে গেছ, তাই তোমাকে ধিক্। জগতে জীবিত থেকে তুমি কোনো পুরুষার্থ করোনি। তাই যুদ্ধের জন্য এসেছি জেনেও তুমি শান্তভাবে আমাকে নিয়ে যেতে এসেছো। আমি যদি অস্ত্র ফেলে খালি হাতে তোমার কাছে আসতাম, তবে তোমার এই কাজ উপযুক্ত ছিল।'

অর্জুন যখন বভ্রুবাহনকে উপরিউক্ত কথাগুলি বলছিলেন, সেই সময় নাগকন্যা উলূপী মাটি ভেদ করে সেখানে এসে পৌঁছলেন। তাঁর নিজ স্বামীর কঠোর বাক্য সহ্য হল না। তাই তিনি বভ্রুবাহনকে ধর্মযুক্ত কথায় বললেন—'পুত্র ! আমি তোমার বিমাতা নাগকন্যা উলূপী। আমার কথা শোনো, তাহলে তুমি পরম ধর্ম লাভ করবে। তোমার পিতা কুরুবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ এবং যুদ্ধের জন্য উন্মত্ত হয়ে রয়েছেন ; সুতরাং এঁর সঙ্গে যুদ্ধ করো (এঁর কাছে এটিই যোগ্য সমাদর) এবং তাহলেই ইনি তোমার ওপর বিশেষ প্রসন্ন হবেন।' বিমাতার কথা শুনে বভ্রুবাহন মনে মনে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি সুবর্ণ কবচ পরিধান করে মস্তকে শিরস্ত্রাণ এবং তূণীর ভর্তি বাণ নিয়ে, সর্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে, সিংহ চিহ্নিত ধ্বজা যুক্ত বেগবান অশ্ববাহিত স্বর্ণরথে করে অর্জুনের ওপর আক্রমণ চালালেন। সেই বীর পার্থের রক্ষণাবেক্ষণে থাকা যজ্ঞের অশ্বটিকে অশ্বশিক্ষায় নিপুণ ব্যক্তিদের দ্বারা বন্দি করলেন। ঘোড়াটিকে ধরে নিতে দেখে ধনঞ্জয় অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং তিনি রথে উপবিষ্ট পুত্রকে যুদ্ধের ময়দানে এগোতে বাধা দিলেন। রাজা বভ্রুবাহন অর্জুনকে বিষাক্ত সাপের ন্যায় তীক্ষ্ণ শত শত বাণে পীড়িত করতে লাগলেন। পিতা ও পুত্র উভয়েই প্রসন্ন মনে যুদ্ধ করছিলেন। তাঁদের যুদ্ধের কোনো তুলনা ছিল না। সেই সংগ্রাম দেবতা ও অসুরের সংগ্রামকেও হার মানিয়ে দিচ্ছিল। বভ্রুবাহন হাসতে হাসতে অর্জুনের গলাবন্ধে একটি বাণ মারলেন, সেই বাণ অর্জুনের দেহ বিদ্ধ করে মাটিতে গিয়ে গেঁথে গেল। সেই বাণে অর্জুন অত্যন্ত আঘাত পেলেন। তিনি ধনুকে ভর দিয়ে মৃতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর চেতনা ফিরে এলে পুত্র বভ্রুবাহনের প্রশংসা করে বললেন—'পুত্র ! তুমি ধন্য, চিত্রাঙ্গদানন্দন ! আজ তুমি যোগ্য পরাক্রম দেখিয়েছ, আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। এবার আমি বাণ নিক্ষেপ করছি, তুমি সতর্ক হও।'

এই কথা বলে অর্জুন নারাচের বর্ষণ করতে লাগলেন। গাণ্ডীব ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত এই নারাচ ইন্দ্রের বজ্রের মতো মনে হচ্ছিল। কিন্তু রাজা বভ্রুবাহন ভল্লের আঘাতে সেগুলি টুকরো টুকরো করে দিলেন। তখন অর্জুন মৃদুহাস্য করে

ক্ষুরাকৃতি দিব্য বাণের আঘাতে বভ্রুবাহনের রথের সুন্দর তালবৃক্ষের সমান উচ্চ সুবর্ণময় ধ্বজা কেটে ফেললেন এবং তার বেগবান ঘোড়াগুলিকেও মেরে ফেললেন। ঘোড়াগুলি মারা যাওয়ায় বভ্রুবাহন রথ থেকে নেমে পড়লেন এবং ক্রুদ্ধ হয়ে পদব্রজেই পিতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। পুত্রের পরাক্রম দেখে অর্জুন অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং পুত্রকে আর বেশি আঘাত করলেন না। বভ্রুবাহন পিতাকে যুদ্ধে বিমুখ দেখে পুনরায় সাপের মতো বিষাক্ত বাণ নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করলেন। বালকস্বভাববশত পরিণাম চিন্তা না করেই বভ্রুবাহন পিতার বুক লক্ষ্য করে এক তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করলেন। সেই বাণ অর্জুনের মর্মস্থানে প্রবেশ করে তাঁকে অত্যন্ত কষ্ট দিতে লাগল। অর্জুন সেই আঘাতে মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। বভ্রুবাহনও অর্জুনের বাণে আহত হয়েছিলেন, তিনিও অচৈতন্য হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। বভ্রুবাহনের মাতা চিত্রাঙ্গদা পতি ও পুত্র দুজনকেই ধরাশায়ী হতে দেখে শঙ্কিত হৃদয়ে রণভূমিতে প্রবেশ করলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন তাঁর পতিদেব অর্জুন মৃত ; সেই অবস্থা দেখে তিনি কম্পিত হৃদয়ে শোকসন্তপ্ত হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন।

চিত্রাঙ্গদার বিলাপ, বভ্রুবাহনের শোক, উলূপীর প্রচেষ্টায় অর্জুনের পুনর্জীবন লাভ ও নিজেদের মধ্যে আলোচনা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! চিত্রাঙ্গদা পতি শোকে অতিশয় সন্তপ্ত হয়ে বিলাপ করতে করতে মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে চেতনা ফিরে এলে তিনি দেখলেন নাগকন্যা উলূপী দিব্যরূপ ধারণ করে সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে দেখে চিত্রাঙ্গদা বললেন—'উলূপী ! দেখো, তোমারই কথায় আমার পুত্র বাণ নিক্ষেপ করে সমরবিজয়ী অর্জুনকে বধ করেছে। রণভূমিতে মৃতাবস্থায় পড়ে থাকা স্বামীকে তুমিও প্রাণভরে দেখে নাও। তুমিতো অত্যন্ত ধর্মজ্ঞ এবং পতিব্রতা, তাই না ? তাই তোমার পতিদেব আজ তোমারই প্রচেষ্টায় মৃত হয়ে রণভূমিতে পড়ে আছেন। ভগিনী ! আমি তোমার কাছে অর্জুনের প্রাণভিক্ষা করছি, তুমি এঁকে জীবিত করে দাও। কল্যাণী ! তুমি ধর্মজ্ঞ, ত্রিলোকে তোমার খ্যাতি প্রসারিত (অতএব তুমিই আমার স্বামীকে বাঁচিয়ে তুলতে পারো।) আর্যে ! আমি আমার পুত্রের জন্য তত শোক করছি না, পতিদেবের জন্যই আমি অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হয়েছি, যাঁকে আমার সামনে এইভাবে আপ্যায়ন করা হল !'

নাগকন্যা উলূপীকে কথাগুলি বলে পরম যশস্বিনী চিত্রাঙ্গদা তাঁর স্বামী অর্জুনের কাছে গিয়ে বললেন—'প্রিয়তম ! ওঠো, আমি তোমার ঘোড়া ছাড়িয়ে দিয়েছি। তোমাকে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ঘোড়ার পিছনে যেতে হবে ; তাহলে এখানে শুয়ে আছ কেন ? সমস্ত কৌরবের জীবন তোমারই অধীন। তুমি তো অন্যের প্রাণদাতা, তাহলে কী

করে প্রাণত্যাগ করলে ?' (তারপর পুনরায় উলূপীকে বলতে লাগলেন) 'উলূপী ! পতিদেব নিহত হয়ে পড়ে আছেন, তাঁকে ভালো করে দেখো। তুমি আমার পুত্রকে উত্তেজিত করেছ, তাতেই সে তার পিতাকে হত্যা করেছে, তোমার কি এর জন্য শোক হচ্ছে না ? মৃত্যুমুখে পতিত আমার পুত্র যদি চিরকালের মতো ঘুমিয়ে পড়ে তো ঠিক আছে, কিন্তু নিদ্রাজয়ী অর্জুনের জীবন রক্ষা করা উচিত। বিধাতা পতি-পত্নীর ভালোবাসা চিরকালের জন্য অটুট করে তৈরি করেছেন, তোমারও এঁর সঙ্গে সেই একই প্রকারের

সম্বন্ধ। সেই সখ্যভাবের গুরুত্ব বুঝে কোনো উপায় করো, যাতে তোমার এঁর সঙ্গে স্থাপিত সম্বন্ধ সত্য এবং সার্থক হয়। তুমিই পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়ে আমার পতির জীবন নিয়েছ। আজ যদি এঁকে পুনরায় জীবিত না করো, তাহলে আমি প্রাণত্যাগ করব। আমার পতি ও পুত্র দুজনেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে ; তাদের বিহনে আমি অনন্ত শোক সাগরে ডুবে আছি, তোমার সামনে এখানেই প্রায়োপবেশনে (আমরণ উপবাসের জন্য) বসছি।'

উলূপীকে এই কথা বলে চিত্রাঙ্গদা অনশন-ব্রত ধারণ করে নিশ্চুপ হয়ে বসলেন। তখন রাজা বভ্রুবাহনের চেতনা ফিরে এল। তিনি মাতাকে রণক্ষেত্রে বসে থাকতে দেখে দুঃখিত চিত্তে বললেন—'হায় ! যিনি এতোদিন ধরে অগাধ সুখে থেকে প্রতিপালিত, আমার সেই মাতা চিত্রাঙ্গদা আজ মৃত্যুর অধীন হয়ে পৃথিবীতে পড়ে থাকা স্বামীর সঙ্গে মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেছেন ! এর থেকে বেশি দুঃখের কথা আর কী হতে পারে ? যুদ্ধে যাঁকে বধ করা অন্যের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন, সেই আমার পিতা অর্জুন আজ আমারই হাতে মৃত্যুবরণ করেছেন। মনে হচ্ছে মৃত্যুকাল না এলে কোনো জীবের পক্ষে প্রাণত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন। তাই এই সংকটের সময়ও আমার এবং আমার মাতার প্রাণ বিয়োগ হচ্ছে না। হায় ! আমাকে ধিক্ ! হে ব্রাহ্মণগণ, আমি পিতার হত্যাকারী, ক্রূরকর্মী এবং মহাপাপী। আপনারা বলুন আমি এখন কী প্রায়শ্চিত্ত করব ? নাগ রাজকন্যা উলূপী ! দেখো, আজ যুদ্ধে আমি তোমার স্বামীকে বধ করেছি, হয়তো এটি তোমার প্রিয় কাজ ; কিন্তু মাতা ! আমি সত্যপ্রতিজ্ঞা করে বলছি, এ জীবন আর রাখব না। আমার পিতা যেখানে গেছেন, আমিও সেইস্থানে যাব।' এই বলে রাজা বভ্রুবাহন দুঃখ-শোকে কাতর হয়ে আচমন করলেন এবং অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে লাগলেন—'জগতের চরাচর প্রাণীগণ এবং মাতা উলূপী ! আপনারা সকলে শুনুন, আমি সত্য কথা বলছি। আমার পিতা নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন যদি জীবিত হয়ে না ওঠেন, তাহলে আমি এই রণক্ষেত্রেই উপবাস করে শরীর শুষ্ক করব। পিতাকে হত্যা করার পর আমার কাছে এছাড়া আর অন্য কোনো প্রায়শ্চিত্ত নেই। পাণ্ডুপুত্র ধনঞ্জয় মহা তেজস্বী, ধর্মাত্মা এবং আমার পিতা। এঁকে বধ করে আমি মহাপাপ করেছি, এখন আমি কী করে উদ্ধার লাভ করব ?' এই বলে অর্জুনকুমার বভ্রুবাহন পুনরায় আচমন করে আমরণ উপবাসের ব্রত নিয়ে আসন গ্রহণ করলেন।

উলূপী তখন সঞ্জীবন-মণিকে স্মরণ করলেন। নাগেদের জীবনের আধারভূত এই মণিকে স্মরণ করতেই সেটি এসে হাজির হল। সেটি হাতে নিয়ে নাগ রাজকুমারী বভ্রুবাহনকে বললেন—'পুত্র ! ওঠো, শোক কোরো না। অর্জুন তোমার দ্বারা পরাস্ত হয়নি। তিনি মনুষ্যমাত্রেরই পক্ষে অজেয়। ইন্দ্রাদি দেবতাও তাঁকে পরাভূত করতে পারেন না। আমি তোমার যশস্বী পিতার প্রিয় কাজ করার জন্য মোহিনী মায়া দেখিয়েছি। তুমি তোমার দ্বারা কৃত কোনো পাপের আশঙ্কা কোরো না। এই মহাত্মা সনাতন নর ঋষি এবং অবিনাশী। নাও, আমি এই দিব্য মণি নিয়ে এসেছি, এটি স্পর্শদ্বারা সর্বদা মৃত সর্পদের জীবিত করে থাকে। এটি তোমার পিতার বুকের ওপর রেখে দাও। এর স্পর্শে তোমার পিতা জীবিত হয়ে যাবেন।'

উলূপীর কথা শুনে অমিত তেজস্বী বভ্রুবাহন অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে পিতার বুকের ওপর মণিটি রেখে দিলেন। সেটি রেখে দিতেই নিদ্রোত্থিত মানুষের মতো অর্জুন জীবিত হয়ে উঠলেন। মনস্বী পিতাকে সুস্থ হয়ে চৈতন্য ফিরে পেতে দেখে বভ্রুবাহন তাঁর চরণে প্রণাম করলেন। ইন্দ্র সেই সময় অর্জুনের ওপর দিব্যপুষ্প বর্ষণ করলেন। দেবগণ দুন্দুভি না

বাজাতেই মেঘমন্দ্র রবে দুন্দুভিগুলি বেজে উঠল। আকাশে

'সাধুবাদ' শোনা গেল। মহাবাহু অর্জুন সুস্থ হয়ে উঠে বভ্রুবাহনকে আলিঙ্গন করে তার মস্তকাঘ্রাণ নিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর দৃষ্টি পড়ল কিছুদূরে দাঁড়িয়ে থাকা উলূপীর সঙ্গে বভ্রুবাহনের মাতার দিকে, যিনি শোকে-দুঃখে অত্যন্ত দুর্বল হয়েছিলেন। তাঁকে দেখে অর্জুন উলূপীকে জিজ্ঞাসা করলেন—'কল্যাণী ! তুমি এবং বভ্রুবাহনের মাতা এই রণভূমিতে কেন এসেছ ? আমি বা বভ্রুবাহন অজানতে তোমার কোনো ক্ষতি করিনি তো ? রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদা তোমার কাছে কোনো অপরাধ করেনি তো ?' তাঁর প্রশ্ন শুনে উলূপী হেসে বললেন—'প্রাণনাথ ! আপনি বা বভ্রুবাহন কোনো অপরাধ করেননি এবং বভ্রুবাহনের মাতাও কোনো অপরাধ করেননি। ইনি তো সর্বদা দাসীর ন্যায় আমার আজ্ঞাধীন থাকেন। এখানে এসে আমি যে সব কাজ করেছি, তা বলছি শুনুন। প্রথমেই আপনার চরণে মাথা রেখে প্রার্থনা করছি যে, আমি যেসব অপরাধ করেছি, সেসবই আপনার ভালোর জন্য, তাই আপনি আমার ওপর ক্রুদ্ধ হবেন না। মহাভারতের যুদ্ধে শিখণ্ডীর সাহায্য নিয়ে আপনি যে ভীষ্মকে বধ করেছিলেন, সেই পাপের শান্তির জন্য বসুগণ এক উপায় নির্ধারণ করেন। কিছুদিন পূর্বের কথা, আমি গঙ্গাতীরে গিয়েছিলাম, ভীষ্মের মৃত্যুর পর দেবতা ও বসুগণ সেখানে একত্রে স্নান করতে আসেন। তাঁরা গঙ্গার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই ভয়ংকর কথা বলেন—'দেবী ! শান্তনুনন্দন ভীষ্ম যখন অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন, তখন সব্যসাচী অর্জুন তাঁকে বধ করেন। সেই অপরাধের জন্য আমরা তাঁকে শাপ দিতে চাই (তার জন্য অনুমতি দিন)। একথা শুনে গঙ্গা বললেন—'হ্যাঁ, তেমনই হওয়া উচিত।' তাঁর কথা শুনে আমার অত্যন্ত দুঃখ হল, আমি পাতালে প্রবেশ করে আমার পিতাকে সব ঘটনা জানালাম। তিনি বসুদের কাছে গিয়ে আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি বারংবার অনুরোধ করায় বসুগণ প্রসন্ন হয়ে বললেন—'মহাভাগ ! মণিপুরের তরুণ রাজা বভ্রুবাহন অর্জুনের পুত্র। সে সংগ্রাম করে যখন তার বাণে অর্জুনের প্রাণ নাশ করবে, তখন সে এই পাপ থেকে মুক্ত হবে। এখন তুমি ফিরে যাও।' বসুদের কথা শুনে পিতা গৃহে ফিরে এসে আমাকে এই কথা বললেন। তা শুনে আমি সেই অনুযায়ী চেষ্টা করেছি এবং আপনাকে পাপমুক্ত করেছি। দেবরাজ ইন্দ্রও আপনাকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারেন না। পুত্র তো আপনারই আত্মা, তাই এর হাতেই আপনার পরাজয় হয়েছে।'

উলূপীর কথা শুনে অর্জুন প্রসন্ন হলেন, তিনি বললেন—'দেবী ! তুমি যা করেছ, তাতে আমার অত্যন্ত প্রিয় কাজ হয়েছে।' উলূপীকে এই কথা বলে তিনি চিত্রাঙ্গদাকে শুনিয়ে বভ্রুবাহনকে বললেন—'পুত্র ! আগামী চৈত্র পূর্ণিমাতে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ হবে। তুমি তোমার দুই মাতা ও মন্ত্রিগণসহ সেখানে আসবে।' পিতার স্নেহপূর্ণ কথায় বভ্রুবাহনের চোখে জল এল। তিনি বললেন—'ধর্মজ্ঞ ! আপনার আদেশে আমি অবশ্যই অশ্বমেধ যজ্ঞে যাব এবং ব্রাহ্মণদের খাদ্য-পরিবেশন করব। এখন একটি প্রার্থনা আছে, আপনি আমার ওপর কৃপা করে দুই ধর্মপত্নীসহ নগরে প্রবেশ করুন, এটিও আপনার গৃহ। এখানে একরাত সুখে বাস করে, আগামীকাল প্রভাতে অশ্বসহ এগিয়ে যাবেন।' সেকথা শুনে অর্জুন চিত্রাঙ্গদাকুমারকে বললেন—'মহাবাহু ! তুমি তো জানো, আমি দীক্ষাগ্রহণ করে বিশেষ নিয়ম পালন করে বিচরণ করছি। তাই যতদিন দীক্ষা পূর্ণ না হয়, ততদিন আমি তোমার নগরে প্রবেশ করতে পারি না। যজ্ঞের ঘোড়া তার ইচ্ছানুসারে চলবে (এর কোথাও থামার নিয়ম নেই), তোমার কল্যাণ হোক, আমি এখন যেতে চাই। আমার থাকার কোনো উপায় নেই।'

তখন বভ্রুবাহন সসম্মানে অর্জুনের পূজা করলেন এবং অর্জুন তাঁর দুই পত্নীর অনুমতি নিয়ে সেখান থেকে রওনা হলেন।

—০—

অর্জুনের মগধ, চেদি, কাশী, কোশল প্রভৃতি দেশের রাজাদের পরাস্ত করে গান্ধার দেশে পৌঁছানো

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! এরপর সেই ঘোড়া আসমুদ্রহিমাচল পরিক্রমা করে ফিরে এল। অর্জুনও তাকে অনুসরণ করে ফিরলেন। পথে রাজগৃহ নামে এক নগর পেলেন। সহদেবের পুত্র মেঘসন্ধি সেখানকার রাজা। তিনি যখন শুনলেন অর্জুন তাঁর নগর প্রান্তে এসেছেন, তখন ক্ষত্রিয়-ধর্ম অনুসারে তিনি যুদ্ধের জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন এবং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রথে করে নগরের বাইরে এলেন। পদব্রজে আসা অর্জুনকে আক্রমণ করে তিনি বললেন—'ভারত ! ঘোড়ার পিছনে কেন ঘুরে বেড়াচ্ছ ? আমি এখনই একে ধরে নিয়ে যাচ্ছি। শক্তি থাকে তো একে ছাড়িয়ে নাও। আমার পূর্বপুরুষেরা যদি কখনো তোমাকে যুদ্ধে আমন্ত্রণ না করে থাকে, তাহলে আমি সেই ঘাটতি আজ পূর্ণ করব—আমি আজ তোমাকে বাণের দ্বারা আপ্যায়ন করব। তুমি আগে আমাকে আঘাত করো, তারপর আমি তোমাকে আঘাত করব।'

মেঘসন্ধির কথা শুনে অর্জুন হেসে বললেন—'রাজন্ ! আমার ব্রত হল, যে আমার কাজে বিঘ্ন প্রদান করবে, তাকে আমি বাধা দেব, সুতরাং তুমি পূর্ণ শক্তি দিয়ে আমাকে আঘাত করো।' তাঁর কথা শুনে মগধরাজ মেঘসন্ধি প্রথমে আঘাত করলেন। তিনি অর্জুনের ওপর হাজার হাজার বাণবর্ষণ করলেন ; কিন্তু গাণ্ডীবধারী অর্জুন তাঁর সব বাণ সায়কের দ্বারা টুকরো করে দিলেন। সেই সঙ্গে মেঘসন্ধির ধ্বজা, পতাকা দণ্ড, রথ, যন্ত্র, ঘোড়া এবং রথের অন্যান্য অংশে বহু প্রজ্বলিত বাণ নিক্ষেপ করলেন ; কিন্তু রাজার শরীর এবং সারথির ওপর একটিও বাণ মারলেন না। মগধরাজ মেঘসন্ধি এটি নিজের পরাক্রম মনে করে অর্জুনের ওপর নিরন্তর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। সেই আঘাতে অর্জুন যখন ভীষণভাবে আহত হলেন, তখন তিনি তাঁর ধনুকে জোরে টংকার দিলেন এবং মেঘসন্ধির ঘোড়াগুলিকে বধ করে সারথিরও মাথা কেটে ফেললেন। তারপর ক্ষুরাকৃতি বাণে তাঁর ভীষণ ধনুকটিও কেটে দিলেন এবং হস্তত্রাণ নষ্ট করে তাঁর ধ্বজা এবং পতাকাও কেটে ফেলে দিলেন। মেঘসন্ধি তখন অত্যন্ত পীড়িত হয়ে গদা নিয়ে অর্জুনকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু সামনে আসতেই অর্জুন বহু বাণের আঘাতে তাঁর স্বর্ণমণ্ডিত গদাটি টুকরো টুকরো করে দিলেন। এইভাবে মেঘসন্ধি যখন রথ, ধনুক, গদা সব থেকেই বঞ্চিত হলেন, তখন অর্জুন তাঁকে বুঝিয়ে বললেন—'পুত্র ! তুমি ক্ষত্রিয়-ধর্ম অনুসারে পূর্ণ পরাক্রম দেখিয়েছ, এখন গৃহে ফিরে যাও। তুমি এখনও বালক। এই যুদ্ধে তুমি যে শৌর্য দেখিয়েছ তা তোমার পক্ষে গৌরবের। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশ হল যে, যুদ্ধে রাজাদের বধ না করা, তাই আমার কাছে অপরাধ করেও তুমি এখনও জীবিত আছো।'

অর্জুনের কথা শুনে মেঘসন্ধির বিশ্বাস হল যে অর্জুন তাঁকে প্রাণে বাঁচিয়েছেন। তখন তিনি অর্জুনের কাছে গিয়ে হাত জোড় করে তাঁকে সম্মান জানিয়ে বললেন—'বীরবর ! আমি পরাজিত হয়েছি। আপনার কল্যাণ হোক। আমি কী সেবা করব বলুন, আমি অবশ্যই তা পূর্ণ করব।' তখন অর্জুন তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—'রাজন্ ! আগামী চৈত্র পূর্ণিমাতে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে তোমার সাদর আমন্ত্রণ রইল।' তাঁর কথায় সহদেবপুত্র 'অতি উত্তম' বলে তাঁর আদেশ মেনে নিলেন এবং অর্জুনকে বিধিবৎ পূজা করলেন। তারপর সেই ঘোড়া পুনরায় তার ইচ্ছানুসারে সমুদ্রতীর ধরে বঙ্গ, পুণ্ড্র, কোশল ইত্যাদি দেশগুলিতে গেল এবং অর্জুনও সেইসব দেশে গিয়ে তাঁর গাণ্ডীব ধনুকের সাহায্যে ম্লেচ্ছাদি বহু সৈন্যকে পরাস্ত করলেন।

তারপর অর্জুন ঘোড়াকে অনুসরণ করে দক্ষিণ দিকে গেলেন। কিছুদিন পর সেদিক থেকে ফিরে সেই স্বেচ্ছাচারী অশ্ব চেদিদেশের রাজধানীতে পৌঁছাল। শিশুপালের পুত্র শরভ সেখানকার রাজা ছিলেন। তিনি প্রথমে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন, পরে পরাস্ত হয়ে শাস্ত্রবিধি অনুসারে তাঁর পূজা করলেন। চেদিরাজার পূজা স্বীকার করে সেই উত্তম অশ্ব কাশী, অঙ্গ, কোশল, কিরাত এবং তঙ্গণ ইত্যাদি দেশে গেল। সেইসব রাজ্যেই অর্জুনের সম্মান অভ্যর্থনা হল। সেখান থেকে তিনি দশার্ণ দেশে গেলেন। তখন সেখানে মহাবলী চিত্রাঙ্গদের রাজা ছিল। তাঁর সঙ্গে অর্জুনের ভয়ংকর যুদ্ধ হল, শেষে তাঁকে পরাস্ত করে তিনি নিষাদরাজ একলব্যের রাজ্যে গেলেন। সেখানে একলব্যের পুত্র তাঁকে যুদ্ধের দ্বারা বাধা দিলেন। তখন নিষাদদের সঙ্গে তাঁর

অত্যন্ত রোমাঞ্চকর যুদ্ধ হল এবং অর্জুন বিজয়লাভ করলেন। তাঁদের দ্বারা পূজিত হয়ে অশ্ব পুনরায় দক্ষিণ

সমুদ্রের দিকে এগোল। সেদিকেও দ্রাবিড়, অন্ধ্র, রৌদ্র, মাহিষক ও কোলচলের প্রান্তে বাস করা বীরদের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ হল। তাদের সহজেই পরাজিত করে তিনি অশ্বের সঙ্গে সুরাষ্ট্র, গোকর্ণ এবং প্রভাসক্ষেত্রে গেলেন। সেখান থেকে ঘোড়া বৃষ্ণি বীরদের দ্বারা সুরক্ষিত পরম রমণীয় দ্বারকা নগরীতে পৌঁছাল। সেখানে যেতেই যদুবংশীয় বালকেরা অশ্বটিকে বেঁধে নিয়ে চলল। সেই সময় রাজা উগ্রসেন বসুদেবকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি ছেলেদের ঘোড়া নিয়ে যেতে দেখে তাদের বারণ করলেন। তারপর অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তিনি অর্জুনের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং শাস্ত্রবিধি অনুসারে তাঁকে আপ্যায়ন করলেন। তারপর অর্জুন উভয়ের অনুমতি নিয়ে ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম সমুদ্রের তীরবর্তী দেশ হয়ে পঞ্চনদের দেশে পৌঁছলেন। তাঁর ঘোড়া সেখানে ইচ্ছামতো বিচরণ করতে করতে গান্ধার দেশে চলে গেল। সেখানে গান্ধাররাজ শকুনির পুত্রের সঙ্গে অর্জুনের ভয়ংকর যুদ্ধ হল।

গান্ধাররাজকে পরাজিত করে অর্জুনের ফিরে আসা, যজ্ঞভূমি নির্মাণ এবং নানা দেশ থেকে আগত রাজাদের যজ্ঞভূমির সাজসজ্জা অবলোকন

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! শকুনির পুত্র গান্ধারদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বীর এবং মহারথী ছিলেন। তিনি বিশাল সৈন্যসহ অর্জুনের সম্মুখীন হলেন। তাঁর সৈনিকেরা শকুনি বধের কথা স্মরণ করে মর্মাহত হয়েছিল। সকলে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পার্থকে আক্রমণ করল। পরম ধর্মাত্মা এবং অপরাজেয় বীর অর্জুন তাঁদের শান্তিপূর্ণভাবে বুঝিয়ে যুদ্ধে বিরত থাকতে বললেন এবং যুধিষ্ঠিরের হিতকারক বার্তাও শোনালেন ; কিন্তু তারা ক্রুদ্ধ ও দুঃখিত হওয়ায় তাঁর কথা শুনতে রাজি হল না। বহু যোদ্ধা ঘোড়া নিয়ে চারদিক দিয়ে তাঁকে ধরার জন্য এগিয়ে এল। তা লক্ষ্য করে অর্জুন গাণ্ডীব ধনুক থেকে তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করে অনায়াসেই তাদের মাথা কেটে ফেলতে লাগলেন। এইভাবে বাণপীড়িত হয়ে তারা ঘোড়া ছুটিয়ে তীব্রবেগে অর্জুনের দিকে এগিয়ে গেল. কিন্তু এভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েও অর্জুন তাদের মাথা দেহ থেকে আলাদা করতে লাগলেন। চারদিকে যখন গান্ধার সৈন্য সংহার হতে লাগল, তখন শকুনির পুত্র এগিয়ে এসে অর্জুনকে বাধাপ্রদান করলেন। তখন অর্জুন যেভাবে জয়দ্রথের মাথা কেটেছিলেন, সেইভাবে শকুনিপুত্রের শিরস্ত্রাণটি অর্ধচন্দ্রাকার বাণে কেটে ফেললেন। গান্ধারেরা তা লক্ষ্য করে অত্যন্ত বিস্মিত হল এবং তারা সকলেই এবিষয়ে নিশ্চিত হল যে অর্জুন ইচ্ছা করেই গান্ধাররাজকে হত্যা করেননি। সেই সময় গান্ধাররাজ শকুনিপুত্রও সৈন্যদের সঙ্গে পলায়ন করছিলেন। সমস্ত সেনা হাতি-ঘোড়াসহ এদিক-ওদিক পালাতে লাগল। অধিকাংশ সৈনিক যুদ্ধে নিহত হল এবং অবশিষ্ট সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে এদিক-ওদিক আশ্রয় খুঁজতে ব্যস্ত হল।

তখন গান্ধাররাজের মাতা অত্যন্ত ভীত হয়ে প্রবৃদ্ধ মন্ত্রীদের সঙ্গে করে উত্তম অর্ঘ নিয়ে নগরের বাইরে রণভূমিতে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি এসেই তাঁর রণোন্মত্ত পুত্রকে যুদ্ধ থেকে বিরত করলেন এবং অর্জুনের

পূজা করে তাঁকে প্রসন্ন করলেন। অর্জুনও আপ্যায়ন করে তাঁকে অনুগ্রহ করলেন এবং শকুনিপুত্রকে সান্ত্বনা প্রদান করে বললেন—'মহাবাহু ! তুমি যে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলে, তা আমার পছন্দ হয়নি ; কারণ তুমি আমার ভ্রাতা। আমি মাতা গান্ধারী এবং পিতা ধৃতরাষ্ট্রের কথা স্মরণ করে যুদ্ধে তোমাকে উপেক্ষা করেছি, তাই তুমি এখনও জীবিত আছ। শুধু তোমার অনুগামী সৈনিকরাই নিহত হয়েছে। এখন আর আমাদের মধ্যে এরূপ হানাহানির মনোভাব রাখা উচিত নয়। নিজেদের মধ্যে শত্রুতা মিটিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। তুমি আর কখনো আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথা ভেবো না। আগামী চৈত্র পূর্ণিমায় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হবে। তুমি অবশ্যই সেই যজ্ঞে উপস্থিত থাকবে।'

গান্ধাররাজকে এই কথা বলে অর্জুন ইচ্ছামতো বিচরণশীল ঘোড়ার পিছনে রওনা হলেন। এবার সেই ঘোড়া হস্তিনাপুরের পথে ফিরতে লাগল। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির গুপ্তচরদের মুখে অর্জুনের ফিরে আসার খবর পেলেন। তিনি কুশলে ফিরে আসছেন এবং গান্ধার ও অন্য সব দেশেও তিনি অদ্ভুত বীরত্ব দেখিয়েছেন—এই কথা শুনে যুধিষ্ঠিরের আনন্দের সীমা রইল না। সেদিন মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথি এবং উত্তম নক্ষত্রযোগ ছিল, একথা জেনে যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাগণ ভীম, নকুল, সহদেবকে ডেকে ভীমকে সম্বোধন করে বললেন—'ভীমসেন তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অর্জুন ঘোড়া নিয়ে ফিরে আসছে। এদিকে যজ্ঞ আরম্ভের সময় সমাগত। মাঘ পূর্ণিমা এসে গেল, মধ্যে শুধু ফাল্গুন মাস বাকি। সুতরাং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের পাঠিয়ে অশ্বমেধযজ্ঞের জন্য উপযুক্ত স্থানের সন্ধান করো।' তাঁর কথা শুনে ভীম তখনই রাজাজ্ঞা পালন করলেন। অর্জুনের ফিরে আসার সংবাদে তিনিও অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তারপর ভীমসেন যজ্ঞকর্মকুশল ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নিয়ে কুশল কারীগরসহ নগরের বাইরে গিয়ে শালবৃক্ষ পরিবৃত সুন্দর স্থান ঠিক করে সেটি চারদিক থেকে সুরক্ষিত কিনা দেখে নিলেন। তারপর সেখানে উত্তম পথ ও সুশোভিত যজ্ঞভূমি তৈরি করালেন। সেই ভূমিতে বহু মহল নির্মিত হল, তার দেওয়ালগুলি রত্ন দ্বারা সুশোভিত। যজ্ঞশালা স্বর্ণ ও রত্নে সুসজ্জিত করা হল, সুবর্ণময় স্তম্ভ এবং বিশাল তোরণ লাগান হল। ধর্মাত্মা ভীম যজ্ঞমণ্ডপের সকল স্থানে শুদ্ধ স্বর্ণ ব্যবহার করলেন। তিনি অন্তঃপুরের নারী, দেশ-বিদেশের রাজা এবং ব্রাহ্মণদের থাকার জন্য নানা উত্তম ভবন তৈরি করলেন। সেসবই শাস্ত্রবিধি অনুসারে নির্মিত হল।

এই সব কার্য সমাধা করে ভীমসেন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে বিভিন্ন রাজাদের নিমন্ত্রণের জন্য দূত পাঠালেন। নিমন্ত্রণ পেয়ে রাজাগণ নানা রত্ন, নারী, ঘোড়া ও অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে উপস্থিত হলেন। এইসব নবাগত অতিথিদের জন্য যুধিষ্ঠির অন্ন, পান ও সুন্দর শয্যার ব্যবস্থা করেছিলেন। ধর্মরাজের সেই মহান যজ্ঞে বহু ব্রহ্মবাদী মুনি পদার্পণ করেন। উত্তম ব্রাহ্মণগণ তাঁদের শিষ্যসহ এলেন। মহাতেজস্বী যুধিষ্ঠির রাজকার্য ত্যাগ করে স্বয়ং তাঁদের আপ্যায়ন এবং যতক্ষণ তাঁদের যোগ্য স্থান নির্ধারিত না হয়, ততক্ষণে তাঁদের সঙ্গে থাকলেন। তারপর কারিগর এসে যজ্ঞমণ্ডপ তৈরি হওয়ার খবর দিলে তিনি ভ্রাতাগণসহ অত্যন্ত খুশি হলেন।

তারপর যজ্ঞে আসা রাজাগণ ভীম দ্বারা নির্মিত যজ্ঞমণ্ডপের সুন্দর সাজসজ্জা ঘুরে দেখতে লাগলেন। তাঁরা স্বর্ণনির্মিত তোরণ, শয্যা, বিহার, রত্নসামগ্রী, বাসন সব দেখলেন। সেখানে এমন কোনো জিনিস ছিল না যা স্বর্ণ নির্মিত নয়। শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে কাষ্ঠযূপও স্বর্ণবেষ্টিত ছিল। এইসব দেখে রাজারা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যদের জন্য স্বাদু অন্নে ভাণ্ডার ভর্তি ছিল। প্রত্যহ এক লাখ ব্রাহ্মণ খাওয়ার পর বারংবার ঘণ্টা বাজানো হত, প্রতিদিন এইভাবে ধর্মরাজের যজ্ঞের আয়োজন সম্পন্ন হত। অন্নের পর্বত, দধির সরোবর এবং ঘৃতের পুকুর তৈরি হয়েছিল। বহু দেশের লোক সেই মহাযজ্ঞে একত্র হয়েছিল। হাজার প্রকারের জাতি বিভিন্ন পাত্রে দান গ্রহণের জন্য সেখানে উপস্থিত ছিল। হাজার হাজার ব্যক্তি ব্রাহ্মণদের খাদ্য পরিবেশন করত। সেখানে ব্রাহ্মণদের উপযুক্ত আহার পরিবেশন করা হত।

শ্রীকৃষ্ণের যুধিষ্ঠিরকে অর্জুনের সংবাদ প্রদান, অর্জুনের হস্তিনাপুরে আগমন এবং উলূপী ও চিত্রাঙ্গদা সহ বভ্রুবাহনের আগমন

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! যুধিষ্ঠির তাঁর ওখানে অনেক বেদজ্ঞ রাজাকে উপস্থিত দেখে ভীমকে বললেন—'ভ্রাতা ! এখানে যেসব রাজা পদার্পণ করেছেন, তাঁরা সকলেই শ্রেষ্ঠ ও পূজার যোগ্য, সুতরাং তুমি তাঁদের যথোচিত আপ্যায়ন করো।' রাজার নির্দেশে মহাতেজস্বী ভীমসেন নকুল এবং সহদেবকে সঙ্গে করে যজ্ঞস্থলে এসে রাজাদের আদর-আপ্যায়ন করতে লাগলেন। তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলদেবকে সম্মুখে রেখে সাত্যকি, প্রদুম্ন, গদ, নিশঠ, শাম্ব এবং কৃতবর্মা প্রমুখ বৃষ্ণিবংশীয়দের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের কাছে এলেন। ভীমসেন তাঁদেরও বিধিমতো আপ্যায়ন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কাছে বসে কিছুক্ষণ কথা বললেন এবং জানালেন—'রাজন্ ! আমার কাছে দ্বারকাবাসী এক বিশ্বাসী ব্যক্তি এসেছিল, সে অর্জুনকে নিজ চক্ষে দেখেছে। অর্জুন বহুস্থানে যুদ্ধ করায় অত্যন্ত ক্লান্ত। সে বলেছে অর্জুন নগরের কাছে এসে গেছে, সুতরাং আপনি এবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করার আবশ্যক কর্ম আরম্ভ করুন।'

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে যুধিষ্ঠির বললেন—'মাধব ! অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা যে অর্জুন কুশলপূর্বক ফিরে এসেছে। তিনি যেসব খবর দিয়েছেন, আমি আপনার কাছ থেকে সব শুনতে চাই।' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'মহারাজ ! আমার কাছে যে এসেছিল, সে অর্জুনের কৃতিত্ব স্মরণ করে আমাকে বলেছিল—'শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি আমার কথাগুলি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলবেন। অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রায় সকল রাজাই আসবেন ; যাঁরা আসবেন, তাঁদের সকলেরই ভালোমতো আপ্যায়ন করা উচিত। সেটিই আমাদের উপযুক্ত কাজ। রাজসূয় যজ্ঞে অর্ঘ্য প্রদানের সময় যে দুর্ঘটনা হয়েছিল, তেমন এবার হওয়া উচিত নয়। রাজা যুধিষ্ঠির এবং আপনি পরামর্শ করে এমন উপায় ঠিক করুন, যাতে রাজারা দ্বেষবশত একে অপরের প্রজা সংহার না করেন।' রাজন্ ! সেই ব্যক্তি অর্জুনের বলা আরও একটি কথা বলেছে, তা হল—'এই যজ্ঞে আমার পুত্র মহাতেজস্বী, মণিপুরের রাজা বভ্রুবাহনেরও আসার কথা। আমার প্রতি তার অত্যন্ত ভক্তি ও অনুরক্তি, সে এলে তাকে আমার থেকে বেশি আদর-যত্ন করবেন।'

অর্জুনের সংবাদ শুনে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অভিনন্দন জানিয়ে বললেন—'ভগবান ! আপনি যে প্রিয় সংবাদ শোনালেন, তা আমি মন দিয়ে শুনলাম। আপনার অমৃতময় কথা আমার মনকে আনন্দমগ্ন করে তোলে। আমি শুনেছি যে বিভিন্ন দেশের রাজাদের সঙ্গে অর্জুনকে কয়েকবার যুদ্ধ করতে হয়েছে। এর কারণ কী ? আমি একাকী যখন অর্জুনের কথা চিন্তা করি তখন মনে হয় যে, সর্বাধিক দুঃখের ভাগী অর্জুনই। সে সর্বশুভলক্ষণসম্পন্ন, তবুও তার মধ্যে কী অশুভ লক্ষণ আছে, যার জন্য তাকে এত কষ্ট সহ্য করতে হয় !'

যুধিষ্ঠিরের এবংবিধ জিজ্ঞাসায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত চিন্তা করে উত্তর দিলেন—'রাজন্ ! অর্জুনের পায়ের পেশী সাধারণের থেকে কিছু স্থূল, এছাড়া আর কোনো অশুভ লক্ষণ তাঁর শরীরে আমি দেখি না। পদপেশী স্থূল হওয়ায় তাঁকে সর্বদা পথ চলতে হয়। তাঁর দুঃখভোগের আর কোনো কারণ দেখতে পাচ্ছি না।' অর্জুনের সম্বন্ধে নানা কথা শুনে ভীমসেনাদি পাণ্ডব এবং যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণগণ বিশেষ প্রসন্ন হচ্ছিলেন। এঁদের মধ্যে যখন অর্জুন-বিষয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল, তখনই অর্জুন প্রেরিত দূত এসে পৌঁছাল। সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিল। যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে সে অর্জুনের আসার সংবাদ দিল। তার কথা শুনে যুধিষ্ঠিরের চোখ থেকে আনন্দাশ্রু ঝরতে লাগল এবং তিনি এই প্রিয় খবর নিবেদন করার জন্য দূতকে বহু ধন পুরস্কারস্বরূপ দিলেন। পরদিন প্রভাতে অর্জুন এসে পৌঁছলেন। চারদিকে তাঁকে নিয়ে আলোচনা হওয়ায় কোলাহল শুরু হয়ে গেল। যজ্ঞের ঘোড়ার গা থেকে ধুলো উড়তে লাগল এবং সেই ঘোড়া সকলের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবার মতো শোভা পেতে লাগল। লোকের মুখে নানা আনন্দদায়ক কথা অর্জুন শুনতে লাগলেন, তাঁরা বলছিলেন—'পার্থ ! অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা যে তুমি কুশলে ঘোড়া নিয়ে ফিরেছ। তোমাকে পেয়ে রাজা যুধিষ্ঠির ধন্য। তুমি ব্যতীত আর কে এইভাবে ঘোড়া নিয়ে সমস্ত পৃথিবীর রাজাদের পরাস্ত করে ফিরে আসতে পারত ? অতীতকালে যে সগর প্রমুখ রাজা জন্মেছিলেন, তাঁরাও যে কখনো এরূপ বীরত্বের কাজ করেছিলেন, তা আমরা

শুনিনি।'

লোকেদের এইসব কথা শুনতে শুনতে অর্জুন যজ্ঞশালার দিকে গেলেন। তখন মন্ত্রীসহ রাজা যুধিষ্ঠির, যদুনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও ধৃতরাষ্ট্রকে সঙ্গে নিয়ে তাঁকে স্বাগত জানালেন। কাছে এসে অর্জুন প্রথমে পিতৃতুল্য ধৃতরাষ্ট্র এবং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের চরণে প্রণাম করলেন। তারপর ভীমসেন ও অন্যান্যদের বিশেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেন। তাঁরা সকলে একত্রে অর্জুনকে বিশেষভাবে আপ্যায়ন করলেন, অর্জুনও সকলকে বিধিমতো সম্মান প্রদর্শন করলেন। তারপর তিনি বিশ্রাম করতে গেলেন। সেইসময় বভ্রুবাহন তাঁর দুই মাতাসহ সেখানে এসে পৌঁছলেন। তিনি কুরুকুলের প্রবৃদ্ধ ব্যক্তিদের এবং অন্য রাজাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম করে তাঁদের দ্বারা আপ্যায়িত হয়ে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তারপর তিনি তাঁর পিতামহী কুন্তীর সুন্দর মহলে গেলেন।

—o—

বভ্রুবাহন ও অন্যদের আপ্যায়ন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! মহলে প্রবেশ করে বভ্রুবাহন মিষ্ট বাক্য বলে তাঁর পিতামহীকে প্রণাম

করলেন। তারপর দেবী চিত্রাঙ্গদা এবং উলূপীও বিনীতভাবে কুন্তী ও দ্রৌপদীর চরণ স্পর্শ করলেন। পরে সুভদ্রা এবং কুরুকুলের অন্য নারীদেরও যথাযোগ্য সম্মান জানালেন। কুন্তী তাঁদের দুজনকে নানা রত্ন উপহার দিলেন। দ্রৌপদী, সুভদ্রা এবং অন্যান্য নারীগণও তাঁদের নানা উপহার দিলেন। তারপর দুই দেবী বহুমূল্য শয্যায় আসীন হলেন। কুন্তী তাঁদের সাদর আপ্যায়ন করলেন। মহাতেজস্বী বভ্রুবাহন কুন্তীর কাছে আদর পেয়ে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গেলেন এবং তাঁকে প্রণাম জানালেন। তারপর তিনি রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন প্রমুখ সকল পাণ্ডবদের কাছে গিয়ে বিনয়পূর্বক অভিবাদন করলেন। তাঁরা সকলেই সস্নেহে তাঁকে আলিঙ্গন ও যথোচিত আপ্যায়ন করেন। এইভাবে তিনি প্রদ্যুম্নের ন্যায় বিনীতভাবে শঙ্খ-চক্র-গদাধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় উপস্থিত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে এক বহুমূল্য রথ প্রদান করলেন, সেই রথ অত্যন্ত সুন্দরভাবে সজ্জিত, অতি উত্তম ও সকলের দ্বারা প্রশংসিত। তাতে দিব্য ঘোড়া সংযুক্ত ছিল। তারপর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব সকলে পৃথক-পৃথকভাবে বভ্রুবাহনকে আপ্যায়ন করে তাকে বহু ধন প্রদান করলেন।

এর তৃতীয় দিনে সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরের কাছে এসে বললেন—"কুন্তীনন্দন ! তুমি আজ থেকে যজ্ঞ আরম্ভ করে দাও, যজ্ঞের শুভ মুহূর্ত উপস্থিত। যাজকেরা তোমাকে আহ্বান করছেন। তোমার এই যজ্ঞে কোনো কিছু ঘাটতি থাকবে না, অঙ্গহীন হবে না, সেইজন্য একে 'অহীন' (সর্বাঙ্গপূর্ণ) বলা হবে। এই যজ্ঞে সুবর্ণ দ্রব্যের আধিক্য, তাই এটি 'বহুসুবর্ণক' নামে বিখ্যাত হবে। মহারাজ ! যজ্ঞের প্রধান কারণ হল ব্রাহ্মণ, সুতরাং তুমি তাঁদের তিনগুণ দক্ষিণা প্রদান করবে ; তাহলে তুমি তিন অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হবে এবং জ্ঞাতিবধের পাপ থেকেও তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। এই যজ্ঞের শেষে তুমি যে অবভৃথ-স্নান করবে, তা পরম পবিত্র এবং পাপ নাশক হবে।"

মহর্ষি ব্যাসের কথা শুনে ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞের সাফল্যের উদ্দেশ্যে সেই দিন দীক্ষাগ্রহণ করলেন এবং বহু অন্নদক্ষিণাযুক্ত, সমস্ত কামনা ও গুণসম্পন্ন সেই মহাযজ্ঞ আরম্ভ করলেন। বেদজ্ঞাতা এবং সমস্ত বিধি জানা

যাজকেরাই সর্ব কর্ম সম্পন্ন করালেন। তাঁরা সবদিকে ঘুরে ঘুরে সুপরামর্শ দিচ্ছিলেন। তাঁরা যজ্ঞে কোনোপ্রকার ভুল করেননি, কোনো কাজ অসম্পূর্ণ করে রাখেননি। প্রত্যেক কাজ ক্রম অনুসারে এবং যথাযথভাবে সম্পূর্ণ করছিলেন। সোমরস পানকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে সোমলতার নির্যাস বার করে প্রাতঃসেবন ইত্যাদি কর্ম ক্রমান্বয়ে অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞে আগত কোনো ব্যক্তিই দীন, দরিদ্র, ক্ষুধার্ত বা দুঃখী থাকেনি। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে মহাতেজস্বী ভীমসেন ভোজনার্থীদের সেবায় সর্বদা তটস্থ থাকতেন। যজ্ঞবেদী নির্মাণে নিপুণ যাজকগণ প্রত্যহ শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে সমস্ত কার্য সুসম্পন্ন করতেন। সেই যজ্ঞে অংশগ্রহণকারী সকলেই বেদের ছটি অঙ্গে পারঙ্গম, ব্রহ্মচর্য-ব্রত পালনকারী, অধ্যাপনাকার্যে কুশল এবং বাদ-বিবাদে প্রবীণ ছিলেন।

তারপর যখন যূপস্থাপনের সময় হল তখন যাচকেরা যজ্ঞভূমিতে বেলের ছটি, খয়েরের ছটি, পলাশের ছটি, দেবদারুর দুটি এবং লসোড়ার (একটি বৃক্ষবিশেষ) একটি—এইভাবে একুশটি যূপ (হাড়িকাঠ) প্রতিষ্ঠা করলেন। এতদ্ব্যতীত ধর্মরাজের নির্দেশে ভীমসেন যজ্ঞের শোভাবৃদ্ধির জন্য আরও অনেক সুবর্ণময় যূপ সেখানে স্থাপন করলেন। যজ্ঞের বেদী নির্মাণ করার জন্য সোনার ইঁট তৈরি করা হয়েছিল। সেই ইঁটের দ্বারা যখন বেদী নির্মাণ করা হল, তখন তা দক্ষ-প্রজাপতির বেদীর ন্যায় শোভা পেতে লাগল। সেই যজ্ঞমণ্ডপে অগ্নিচয়নের জন্য চারটি জায়গা তৈরি করা হয়েছিল। সেগুলি আঠারো হাত করে দীর্ঘ। তার আকার গরুড়ের মতো, তাতে সোনার পাখা লাগানো ছিল। সেই বেদীর ওপর ত্রিকোণ কুণ্ড নির্মিত ছিল। তাতেই অগ্নিস্থাপনের কাজ হত। কিম্পুরুষ এবং কিন্নরগণ যজ্ঞশালার শোভাবর্ধন করছিলেন। চারদিকে সিদ্ধ এবং ব্রাহ্মণদের স্থান ছিল। ব্যাসদেবের শিষ্য, যিনি সমস্ত শাস্ত্রাদির প্রণেতা এবং যজ্ঞকর্মে কুশল, তিনি এই যজ্ঞের সদস্য ছিলেন। দেবর্ষি নারদ, তুম্বুরু, বিশ্বাবসু, চিত্রসেন ও গীতবাদ্যে কুশল অন্যান্য গন্ধর্বগণও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নৃত্য-গীত পারদর্শী গন্ধর্বগণ প্রত্যহ যজ্ঞকার্য সমাপ্ত হলে তাঁদের কলা চাতুর্যে ব্রাহ্মণদের মনোরঞ্জন করতেন।

যুধিষ্ঠির কর্তৃক ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা প্রদান এবং রাজাদের উপহার দিয়ে বিদায় জানানো

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্! এইভাবে ইন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী রাজা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ পূর্ণ হল। শিষ্যসহ ভগবান ব্যাসদেব তাঁকে 'অভ্যুদয়' হওয়ার আশীর্বাদ জানালেন। যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের সম্মানে এক হাজার কোটি স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণা দিয়ে ব্যাসদেবকে সমগ্র পৃথিবী দান করলেন। সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেব সেই দান স্বীকার করে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'রাজন্! তোমার প্রদত্ত এই পৃথিবী পুনরায় তোমার হাতেই ফিরিয়ে দিচ্ছি, তুমি আমাকে এর মূল্য দাও; কারণ ব্রাহ্মণ ধন অভিলাষী হয় (রাজা নয়)।' তারপর মহামনা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের বললেন—'অশ্বমেধ-যজ্ঞে পৃথিবীকে দক্ষিণা দেওয়ার বিধান আছে। তাই অর্জুন দ্বারা জয় করা এই সমগ্র পৃথিবী আমি ঋত্বিকদের দান করেছি, এবার আমি বনে চলে যাব। আপনারা চাতুর্হোত্র বিধি অনুসারে এটি চার ভাগে ভাগ করে নিন। আমি ব্রাহ্মণদের সম্পত্তি নিতে চাই না। আমার ভ্রাতাদের চিন্তাধারাও এইরূপই।'

যুধিষ্ঠির একথা বলায় ভীমসেন ও অন্য ভ্রাতারা এবং দ্রৌপদী একসুরে বললেন—'হ্যাঁ, মহারাজের কথা একদম ঠিক।' এই মহান ত্যাগের কথা শুনে সকলের রোমাঞ্চ হল। সেইসময় আকাশবাণী শোনা গেল—'পাণ্ডবগণ! তোমরা ধন্য।' সমস্ত ব্রাহ্মণ তাঁদের সৎসাহসের প্রশংসা করতে লাগলেন। তখন ভগবান ব্যাসদেব ব্রাহ্মণদের মধ্যে এসে যুধিষ্ঠিরের প্রশংসা করে বললেন—'রাজন্! তুমি তো এই পৃথিবী আমাকে দান করেছ। এখন আমি একে ফিরিয়ে দিচ্ছি। এর পরিবর্তে ব্রাহ্মণদের সুবর্ণ প্রদান করো এবং পৃথিবী তোমার কাছে রাখো।' তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'ধর্মরাজ! ভগবান ব্যাসদেব যে আদেশ করেন, সেই অনুযায়ী আপনার কাজ করা উচিত।' তাঁর কথা শুনে ভ্রাতাগণসহ কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে এক কোটির তিনগুণ দক্ষিণা দিলেন। মহারাজ মরুত্তের পথ অনুসরণকারী রাজা যুধিষ্ঠির সেই সময় যেরূপ মহান ত্যাগ করেছিলেন, জগতে

তাঁর মতো তেমন ত্যাগ আর কেউ করতে পারেন না। মহর্ষি ব্যাস সেই সুবর্ণ রাশি নিয়ে ব্রাহ্মণদের দিয়ে দিলেন এবং তাঁরা সেটি চার ভাগ করে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলেন ; এইভাবে পৃথিবীর মূল্যরূপে স্বর্ণদান করে রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতাগণসহ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তাঁদের সমস্ত পাপ বিনাশ হল এবং তাঁরা স্বর্গের অধিকার লাভ করলেন। ঋত্বিকেরা যে স্বর্ণসম্ভার লাভ করেছিলেন তা অত্যন্ত আনন্দ এবং উৎসাহের সঙ্গে নিজেদের ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে ভাগ করে নিলেন। যজ্ঞশালাতেও যা কিছু স্বর্ণের বাসন-ইঁট-গহনা ইত্যাদি ছিল সেগুলিও যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে তাঁরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলেন। ব্রাহ্মণেরা নেবার পরে যে ধন সেখানে পড়ে থাকল, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং ম্লেচ্ছ জাতির লোকেরা সেগুলি নিয়ে নিল। সকলেই অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেল। সেই বিশাল সুবর্ণরাশির মধ্যে ভগবান ব্যাসের জন্য যে ভাগ প্রদত্ত ছিল, তিনি অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে তা কুন্তীকে উপহার দিলেন। শ্বশুর কর্তৃক স্নেহপূর্বক প্রাপ্ত সেই ধন নিয়ে কুন্তীদেবী অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। কুন্তী সেই ধনরাশির দ্বারা বড় বড় পুণ্যকর্ম করলেন। যজ্ঞের শেষে অবভৃথ-স্নান করে পাপরহিত হয়ে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের সঙ্গে এমন শোভা পেতে লাগলেন যেন দেবতা পরিবৃত ইন্দ্র। পাণ্ডবেরা তারপর যজ্ঞে সমাগত রাজাদের নানাপ্রকার রত্ন, হাতি, ঘোড়া, বস্ত্র, অলংকার, স্বর্ণ উপহার দিলেন। রাজা বভ্রুবাহনকে বহু ধন দিয়ে বিদায় জানালেন। তারপর তাঁদের ভগিনী দুঃশলার প্রসন্নতার নিমিত্ত তাঁর পৌত্রকে সিন্ধুদেশের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করলেন। কুরুরাজ যুধিষ্ঠির এইভাবে সকল রাজাকে ধনরত্ন দিয়ে বিশেষভাবে আপ্যায়ন করে বিদায় জানালেন। তারপর তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, মহাবলী বলরাম, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি সকল বৃষ্ণি বীরদের বিধিমতো পূজা করে তাদের দ্বারকা যাওয়ার অনুমতি দিলেন। এইভাবে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ পূর্ণ হল। এই যজ্ঞে অন্ন, ধন ও রত্নের পাহাড় হয়েছিল। কয়েকটি ঘৃতের পুকুর তৈরি হয়েছিল। রসের নদী প্রবাহিত হয়েছিল। যার যা ইচ্ছা, তাকে সেই বস্তু প্রদান করা হবে এবং সকলে ইচ্ছানুযায়ী আহার করবে—দিন রাত এই ঘোষণা করা হত। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই যজ্ঞে জলের মতো ধনরত্নাদি দান করেছিলেন। সর্ব প্রকার কামনা, রত্ন, রস বর্ষণ করে, পাপরহিত ও কৃতার্থ হয়ে তিনি নিজ নগরে প্রবেশ করলেন।

—০—

যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে এক নেউল-কর্তৃক উঞ্ছবৃত্তি পালনকারী ব্রাহ্মণের এক সের ছাতুদানের মহিমা জানানো

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্মন্ ! আমার প্রপিতামহ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে যদি কোনো আশ্চর্যজনক ঘটনা হয়ে থাকে, তবে কৃপা করে সেটি আমাকে বলুন।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! যুধিষ্ঠিরের সেই মহাযজ্ঞ যখন সম্পূর্ণ হল, সেই সময় এক অত্যন্ত উত্তম ও মহা আশ্চর্যের ঘটনা সংঘটিত হয়, তা বলছি শোনো—সেই যজ্ঞে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, আত্মীয়কুটুম্ব, বন্ধুবান্ধব, রাজা, অন্ধ, দীনদরিদ্র সকলে তৃপ্ত হলে যুধিষ্ঠিরের মহান দানের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর ওপর পুষ্প বর্ষণ হতে লাগল। সেই সময় সেখানে এক নেউল এল। তার চক্ষু নীল এবং দেহের একাংশ সোনার। সে এসেই বজ্রের ন্যায় ভয়ংকর আওয়াজ করে সমস্ত মৃগ ও পক্ষীকুলকে ভীত সন্ত্রস্ত করল। তারপর মানুষের ভাষায় বলল—'রাজাগণ ! তোমাদের এই যজ্ঞ কুরুক্ষেত্র নিবাসী এক উঞ্ছবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণের এক সের ছাতু দানেরও সমকক্ষ হতে পারেনি।'

নেউলের কথা শুনে সমস্ত ব্রাহ্মণ অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন—'নকুল ! এই যজ্ঞে তো সাধুব্যক্তিদেরই সমাগম হয়েছে, তুমি কোথা থেকে এসেছ ? তোমার মধ্যে কী ক্ষমতা এবং কত শাস্ত্রজ্ঞান আছে ? তুমি কার আশ্রয়ে থাক, আমরা কীভাবে তোমার পরিচয় জানব ? তুমি কীসের জন্য আমাদের এই যজ্ঞের নিন্দা করছ ? আমরা নানাপ্রকার যজ্ঞ সামগ্রী একত্রিত করে শাস্ত্রবিধি মেনে এই যজ্ঞ সম্পূর্ণ

করেছি। শাস্ত্র এবং ন্যায়ানুসারে প্রত্যেক কর্তব্য-কর্ম পালন করা হয়েছে। পূজা ব্যক্তিদের বিধিমতো পূজা করা হয়েছে, মন্ত্রপাঠ করে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়েছে এবং ঈর্ষারহিত হয়ে দানযোগ্য বস্তু দান করা হয়েছে। এখানে নানা প্রকার দানের দ্বারা ব্রাহ্মণদের, উত্তম যুদ্ধের দ্বারা ক্ষত্রিয়দের, শ্রাদ্ধের দ্বারা পিতৃপুরুষদের, রক্ষার দ্বারা বৈশ্যদের, সমস্ত কামনা পূর্ণ করে উত্তম নারীদের, দয়ার দ্বারা শূদ্রদের, দান থেকে বেঁচে যাওয়া বস্তুদ্বারা অন্য মানুষদের এবং রাজার শুদ্ধ ব্যবহার দ্বারা জ্ঞাতি ও কুটুম্বদের সন্তুষ্ট করা হয়েছে। তেমনই পবিত্র হবিষ্যের দ্বারা দেবতাদের এবং রক্ষার ভার নিয়ে শরণাগতদের প্রসন্ন করা হয়েছে। এসব সত্ত্বেও তুমি কী দেখেছ এবং শুনেছ, যার জন্য এই যজ্ঞের নিন্দা করছ ? তুমি আমাদের কাছে সত্য করে বলো ; কারণ তোমাকে আমাদের বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে। তোমাকে বুদ্ধিমান বলে মনে হচ্ছে এবং তুমি দিব্যরূপ ধারণ করে আছো। এখন তুমি ব্রাহ্মণদের সমাবেশে রয়েছ, সুতরাং আশা রাখি তুমি অবশ্যই আমাদের প্রশ্নের জবাব দেবে।'

ব্রাহ্মণেরা তাকে এভাবে জিজ্ঞাসা করলে, নেউল হেসে বলল—'বিপ্রবৃন্দ ! আমি মিথ্যা বা অহংকার করে কোনো কথা বলিনি। আমি বলেছি যে, "আপনাদের এই যজ্ঞ উঞ্ছবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণের দ্বারা সম্পাদিত এক সের ছাতুদানের সমকক্ষ নয়" তার কারণ অবশ্যই আপনাদের জানানো উচিত। এখন আমি যা বলছি শান্ত হয়ে শুনুন। কুরুক্ষেত্র নিবাসী উঞ্ছবৃত্তিধারী দানশীল ব্রাহ্মণের সম্পর্কে আমি যা দেখেছি এবং অনুভব করেছি, তা অতি উত্তম এবং অদ্ভুত। সেই ব্রাহ্মণের দ্বারা ন্যায়ত প্রাপ্ত সামান্য অন্নদানও অত্যন্ত উত্তম ফল প্রদান করেছে। সেই প্রসঙ্গই আপনাদের জানাচ্ছি। কিছুদিন আগের কথা, ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে, যেখানে বহু ধর্মজ্ঞ মহাত্মা বাস করতেন, সেখানে কোনো এক ব্রাহ্মণও বাস করতেন। তিনি উঞ্ছবৃত্তি দ্বারাই জীবন-নির্বাহ করতেন। পায়রার মতো অন্নের দানা খুঁটে আনতেন এবং তার দ্বারাই পরিবার প্রতিপালন করতেন। তিনি তাঁর স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূর সঙ্গে থেকে তপস্যায় রত থাকতেন। ব্রাহ্মণ দেবতা শুদ্ধ আচার-বিচারসম্পন্ন, ধর্মাত্মা এবং জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। তিনি প্রত্যহ দিনের ষষ্ঠ ভাগে স্ত্রী-পুত্র-পুত্রবধূর সঙ্গে আহার করতেন। যদি কোনোদিন আহার সংগ্রহ না হত, তাহলে পরদিন সেই একই সময়ে আহার করতেন। একবার সেখানে ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ব্রাহ্মণের তো সংগ্রহে কোনো অন্ন ছিল না, খেতের অন্নও শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল, তাই তাঁর খাদ্যবস্তুর খুবই অভাব হল। দিনের ষষ্ঠ ভাগ অতীত হয়ে যেত ; কিন্তু তাঁদের খাদ্য সংগৃহীত হত না। সকলেই অনাহারে থাকতে লাগলেন। এক জ্যৈষ্ঠের শুক্লপক্ষের দ্বিপ্রহরে সেই তপস্বী ব্রাহ্মণ ক্ষুধা এবং গরমের কষ্ট সহ্য করেও অন্নের সন্ধানে বার হলেন। ক্ষুধা ও পরিশ্রমে ব্যাকুল হয়ে নানা স্থানে ঘুরলেও এককণা খাদ্যও তিনি জোটাতে পারলেন না। অন্য দিনের মতো সেই দিনও সপরিবারে অনাহারে কাটালেন। ধীরে ধীরে তাঁদের প্রাণশক্তি ক্ষীণ হতে লাগল। এরমধ্যে একদিন দিবসের ষষ্ঠভাগে তাঁরা সেরখানেক যব সংগ্রহ করলেন। সেই যব থেকে ছাতু তৈরি করে নিত্য জপ ও নিয়মাদি অনুষ্ঠান করে, অগ্নিতে আহুতি প্রদান করে সেই ছাতু সকলে অল্প অল্প ভাগ করে আহারে বসলেন। এরমধ্যে এক অতিথি ব্রাহ্মণ এসে উপস্থিত হলেন। অতিথিকে দেখে সকলেই আনন্দিত হলেন। তাঁকে প্রণাম করে কুশল সংবাদ নিলেন। ব্রাহ্মণ পরিবারের সকলেই বিশুদ্ধচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, শ্রদ্ধালু, দোষদৃষ্টিবর্জিত, ক্রোধজয়ী, সজ্জন, ঈর্ষাভাবরহিত এবং ধর্মজ্ঞ ছিলেন, তাঁরা অভিমান, অহংকার সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করেছিলেন। ক্ষুধার্ত অতিথি ব্রাহ্মণকে নিজ ব্রহ্মচর্য ও গোত্র পরিচয় প্রদান করে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে সেই উঞ্ছবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণ বললেন—'ব্রাহ্মণদেবতা ! আপনার জন্য পাদ্য,

অর্ঘ্য ও আসন রয়েছে এবং ন্যায়ত উপার্জিত এই পরম পবিত্র ছাতু আপনার জন্য রয়েছে। প্রসন্ন মনে এটি আপনাকে অর্পণ করছি, আপনি গ্রহণ করুন।'

তাঁর কথা শুনে অতিথি এক ভাগ ছাতু নিয়ে খেলেন, কিন্তু তাতে তাঁর ক্ষুধা তৃপ্ত হল না। ব্রাহ্মণ দেখলেন অতিথি তখনও ক্ষুধার্ত রয়েছেন। তখন তিনি ভাবলেন 'এঁকে কীভাবে সন্তুষ্ট করা যায় ?' তিনি তাঁর আহারের কথা ভাবতে লাগলেন। তখন ব্রাহ্মণ পত্নী বললেন—'নাথ ! আপনি অতিথিকে আমার ভাগটুকুও দিয়ে দিন। আমার অংশটুকু খেয়ে উনি তৃপ্তি লাভ করবেন।' নিজ পতিব্রতা পত্নীর কথা শুনে ব্রাহ্মণ তাঁর অবস্থা চিন্তা করলেন। তিনি নিজে ক্ষুধায় যে কষ্ট পাচ্ছিলেন, তার দ্বারা অনুমান করতে কষ্ট হল না যে 'এই বেচারি নিজেই ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছে।' তাছাড়া সেই তপস্বিনী বৃদ্ধা, ক্লান্ত ও অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন। তাঁর দেহ শুধু চর্মসার এবং দুর্বলতার কারণে সর্বদা কম্পমান ছিল। তাই অত্যন্ত ক্ষুধাতুর জেনে ব্রাহ্মণ তাঁর অংশের ছাতু নেওয়া উচিত বলে মনে করলেন না। অতএব তিনি তাঁর পত্নীকে বললেন—'কল্যাণী ! কীট, পতঙ্গ, পশুদেরও নিজ স্ত্রীকে রক্ষা ও পালন-পোষণ করা কর্তব্য। পুরুষ হয়েও যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর দ্বারা নিজের পালন পোষণ ও সংরক্ষণ করে, সে দয়ার পাত্র। সে উজ্জ্বল কীর্তি থেকে ভ্রষ্ট হয় এবং তার উত্তম লোক লাভ হয় না। ধর্ম, কাম ও অর্থসম্বন্ধীয় কাজ, সেবা-শুশ্রূষা, বংশ-পরম্পরা রক্ষা, পিতৃ কার্য এবং স্বধর্মের অনুষ্ঠান—এ সবই স্ত্রীর অধীন। যে ব্যক্তি স্ত্রীকে রক্ষা করতে অক্ষম, সে জগতে মহা অপযশের ভাগী হয় এবং পরলোকে নরক গমন করে।'

পতির কথা শুনে ব্রাহ্মণী বললেন—'প্রাণনাথ ! আমাদের দুজনের ধর্ম ও অর্থ একই ; সুতরাং আপনি আমার ওপর প্রসন্ন হয়ে আমার অংশের ছাতু অতিথিকে দিয়ে দিন। নারীর সত্য, ধর্ম, রতি, নিজ গুণের দ্বারা প্রাপ্ত স্বর্গ এবং সমস্ত অভিলাষ পতিরই অধীন। মাতার রজ এবং পিতার বীর্য—এই দুইয়ের মিলনেই বংশ পরম্পরা চলে থাকে। স্ত্রীর কাছে পতিই সব থেকে বড় দেবতা। স্ত্রী যে রতি ও পুত্ররূপ ফল প্রাপ্ত করে, তা পতিরই প্রসাদ। আপনি পালনকারী হওয়ায় পতি, ভরণ-পোষণ করায় ভর্তা এবং পুত্র প্রদান করায় বরদাতা ; সুতরাং আমার ভাগের ছাতু অতিথিদেবকে অর্পণ করুন। আপনিও তো জরা-জীর্ণ বৃদ্ধ, ক্ষুধাতুর, অত্যন্ত দুর্বল, উপবাস দ্বারা ক্লান্ত এবং ক্ষীণকায় হয়ে গেছেন (তাই আপনি যেভাবে ক্লেশ সহ্য করছেন, আমিও সেইভাবে কষ্ট সহ্য করে নেব।)'

পত্নীর এবংবিধ কথা শুনে ব্রাহ্মণ ছাতু নিয়ে অতিথিকে বললেন—'দ্বিজবর ! এই ছাতুও গ্রহণ করুন।' অতিথি সেই ছাতুও খেয়ে নিলেন ; কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট হলেন না। তা লক্ষ্য করে উঞ্ছবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণ অত্যন্ত চিন্তিত হলেন।

তখন তাঁর পুত্র বললেন—'পিতা ! আমার ছাতু নিয়ে ব্রাহ্মণকে প্রদান করুন। আমি একেই পুণ্য বলে মনে করি, তাই এই কথা বলছি। আমার সর্বদা আপনাকে পালন করা উচিত ; কারণ সাধু-ব্যক্তিরা সর্বদাই বৃদ্ধ পিতার পালন-পোষণের ইচ্ছা করে থাকে। শ্রুতির এই নির্দেশ ত্রিলোক-প্রসিদ্ধ (সুতরাং আপনি এই ছাতু না দেওয়ার কথা চিন্তা করবেন না)।'

পিতা বললেন—পুত্র তুমি হাজার বৎসর বয়স্ক হলেও আমার কাছে বালকই থাকবে, পিতা পুত্রের জন্ম দিয়েই নিজেকে কৃতকৃত্য বলে মনে করে। আমি জানি অল্পবয়স্কদের ক্ষুধা অধিক হয় ; আমি তো বৃদ্ধ, ক্ষুধার্ত হলেও প্রাণধারণ করতে সক্ষম। জীর্ণ অবস্থা হওয়ায় আমার ক্ষুধায় অধিক কষ্ট হয় না। এতদ্ব্যতীত আমি দীর্ঘকাল তপস্যা করেছি, সুতরাং আমার মৃত্যু-ভয় নেই। তুমি এই ছাতু খেয়ে প্রাণধারণ করো।

পুত্র বলল—পিতা ! আমি আপনার পুত্র ! পুরুষের ত্রাণ করার জন্যই সন্তানকে 'পুত্র' বলা হয়। এছাড়া পুত্রকে পিতার নিজ আত্মা বলা হয় ; সুতরাং আপনি আপনার

আত্মভূত পুত্রের দ্বারা নিজেকে রক্ষা করুন।

পিতা বললেন—পুত্র ! তুমি রূপ, সদাচার ও ইন্দ্রিয় সংযমে আমারই সমকক্ষ। তোমার এই সব গুণ আমি অনেক বার পরীক্ষা করেছি। তোমার ছাতু আমি অতিথিকে প্রদান করছি।

একথা বলে ব্রাহ্মণ প্রসন্ন মনে ছাতু নিয়ে হাসতে হাসতে অতিথিকে পরিবেশন করলেন। সেটি গ্রহণ করেও অতিথি দেবতার ক্ষুধা নিবৃত্তি হল না। তা লক্ষ্য করে উঞ্ছবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণ মহাসংকটে পড়লেন। তাঁর পুত্রবধূও অত্যন্ত সুশীলা ছিল। সে শ্বশুরের মনের অবস্থা বুঝে গেল এবং প্রিয় কাজ করার জন্য ছাতু নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে প্রসন্ন বদনে বলল—'পিতা ! আপনি আমার অংশের ছাতু নিয়ে ব্রাহ্মণ দেবতাকে নিবেদন করুন।'

শ্বশুর বললেন—'মা ! তুমি পতিব্রতা, এমনিই তোমার শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে। তোমার দেহলাবণ্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ব্রত ও আচার পালন করে তুমি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছ। ক্ষুধার কষ্টে তোমার চিত্ত ব্যাকুল, এই অবস্থায় আমি কী করে তোমার অংশের ছাতু নেব ? এতে আমার ধর্মে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হবে। তুমি প্রত্যহ শৌচ, সদাচার ও তপস্যায় প্রবৃত্ত থেকে দিনের ষষ্ঠ ভাগে আহার কর। আজ অন্ন না পাওয়ায় আমি কীকরে তোমাকে উপবাস করতে দেখব ? তুমি ক্ষুধায় কাতর এক অবলা বালিকা, উপবাস করে ক্লান্ত, তুমি সেবা-শুশ্রূষার দ্বারা বন্ধুবান্ধব ও পরিবার-পরিজনকে সর্বদা সুখী রাখ, তাই তোমাকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য।'

পুত্রবধূ বললেন—'ভগবন্ ! আপনি আমার গুরুরও গুরু এবং দেবতারও দেবতা, সুতরাং আমার নিবেদন করা ছাতু গ্রহণ করুন। আমার শরীর, প্রাণ, ধর্ম সবই বড়দের সেবার জন্য। আপনি প্রসন্ন হলেই আমি উত্তম লোক লাভ করব, সুতরাং আপনি আমাকে আপনার একান্ত ভক্ত অথবা কৃপাপাত্র মনে করে অতিথিকে দেবার জন্য এই ছাতু গ্রহণ করুন।'

শ্বশুর বললেন—'পুত্রী ! তুমি পতিব্রতা, সর্বদা এরূপ উত্তমশীল এবং সদাচার পালন করাই তোমার শোভা। তুমি ধর্ম ও ব্রত আচরণে সংলগ্ন থেকে সর্বদা গুরুজনের সেবায় রত থাক, তাই তোমাকে পুণ্য থেকে বঞ্চিত করব না এবং শ্রেষ্ঠ ধর্মাত্মাদের মধ্যে তোমাকে শ্রেণীভুক্ত করে তোমার নিবেদন করা ছাতু অবশ্যই গ্রহণ করব।'

ব্রাহ্মণ একথা বলে পুত্রবধূর অংশের ছাতুও অতিথিকে নিবেদন করলেন। উঞ্ছবৃত্তিধারী মহাত্মা ব্রাহ্মণের এই অদ্ভুত ত্যাগ দেখে অতিথি অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। প্রকৃতপক্ষে ছদ্মবেশে সাক্ষাৎ ধর্মই অতিথিরূপে এসেছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণকে বললেন—'বিপ্রবর ! তুমি শক্তি অনুসারে ধর্মত উপার্জিত খাদ্য শুদ্ধ হৃদয়ে দান করেছ, তাই আমি তোমার ওপর অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। স্বর্গে নিবাসকারী দেবতাগণও তোমার দানের প্রশংসা করছেন। দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব এবং দেবদূতগণও তোমার দানে বিস্মিত হয়ে আকাশে দণ্ডায়মান হয়ে তোমার স্তুতি করছেন। ব্রহ্মলোকে বিচরণকারী ব্রহ্মর্ষি বিমানে বসে তোমার দর্শন লাভের প্রতীক্ষা করছেন। তুমি এবার দিব্যলোকে গমন করো। পিতৃলোকে তোমার যত পিতৃপুরুষ ছিলেন, তাঁদের সকলকেই তুমি ত্রাণ করেছো এবং ভবিষ্যতে বহু যুগ ধরে তোমার যেসব বংশধর জন্মগ্রহণ করবে, তারাও তোমার ব্রহ্মচর্য, দান, তপস্যা এবং শুদ্ধ ধর্মানুষ্ঠানের জন্য মুক্তিলাভ করবে। তুমি অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহ তপস্যা করেছ, তার প্রভাবে এবং দানের ফলে সমস্ত দেবতা তোমার ওপর প্রসন্ন হয়েছেন। সংকট সময়েও তুমি শুদ্ধ হৃদয়ে সমস্ত ছাতু দান করেছ। ক্ষুধা মানুষের বুদ্ধি অপহরণ করে, তার ধার্মিক চিন্তাধারা লোপ পায় ; কিন্তু সেরূপ সময়েও যার দানের ইচ্ছা থাকে, তার ধর্ম হ্রাস পায় না। তুমি স্ত্রী ও পুত্রের প্রতি স্নেহকে উপেক্ষা করে ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ বলে মেনেছ, তাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনোনি। মানুষের পক্ষে সর্বপ্রথম ন্যায়পূর্বক অর্থ প্রাপ্তির উপায় জানাই সূক্ষ্ম বিষয়। সেই ধন সৎপাত্রের সেবায় অর্পণ করা তার থেকেও শ্রেষ্ঠ। সাধারণ সময়ে দান করার থেকে বিশেষ সময়ে দান করা আরও ভালো ; কিন্তু শ্রদ্ধার গুরুত্ব কালের থেকেও শ্রেষ্ঠ। শ্রদ্ধাপূর্বক দানকারী মানুষের যদি এক হাজার মুদ্রা দান করার শক্তি থাকে সে একশত দান করবে, একশতের শক্তি থাকলে দশটি দান করবে এবং যার কাছে কিছুই নেই সে যদি নিজ শক্তি অনুসারে জলও দান করে তাহলে এসবেরই সমান ফল মানা হয়। কথিত আছে যে রাজা রন্তিদেবের কাছে যখন দেবার মতো কিছুই ছিল না, তিনি তখন শুদ্ধ হৃদয়ে শুধু জলই দান করেছিলেন। অন্যায়পূর্বক প্রাপ্ত ধনের দ্বারা মহৎ ফলপ্রদানকারী বড় বড় দান করলে ধর্ম প্রসন্ন হন না। ধর্ম দেবতা ন্যায় উপার্জিত সামান্য অন্ন শ্রদ্ধা সহকারে দান করলে সন্তুষ্ট হন। রাজা নৃগ ব্রাহ্মণদের হাজার

হাজার গো-ধন দান করেছিলেন ; কিন্তু একটিই গাভী তিনি অপরকে দান করেছিলেন, যার জন্য অন্যায্যভাবে প্রাপ্ত দ্রব্য দান করায় তাঁকে নরকে গমন করতে হয়। উশীনরের পুত্র রাজা শিবি শ্রদ্ধাপূর্বক নিজ শরীরের মাংস দান করে পুণ্যাত্মাদের লোকে আনন্দ ভোগ করছেন। ন্যায়পূর্বক সংগ্রহিত ধন দান করলে যে লাভ হয়, বহু দক্ষিণাসম্পন্ন অনেক রাজসূয়যজ্ঞ অনুষ্ঠান করলেও তা হয় না। তুমি সের খানেক ছাতু দান করে অক্ষয় ব্রহ্মলোক জয় করেছ, বহু অশ্বমেধ যজ্ঞও তোমার এই দানের সমকক্ষ হতে পারবে না। অতএব দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! তুমি রজোগুণরহিত ব্রহ্মধামে সুখের সঙ্গে পদার্পণ করো। তোমাদের জন্য দিব্য বিমান উপস্থিত, এতে উপবেশন করো। আমাকে দেখ, আমি সাক্ষাৎ ধর্ম। তুমি নিজেকে উদ্ধার করেছ, জগতে তোমার কীর্তি সর্বদাই বজায় থাকবে।'

নেউল বলল—ধর্ম এই কথা বলায় সেই ব্রাহ্মণদেবতা তাঁর স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূসহ বিমানে করে ব্রহ্মলোকে চলে গেলেন। তাঁদের যাওয়ার পর আমি নিজের গর্ত থেকে বেরিয়ে, অতিথি যেখানে আহার করেছিলেন, সেই স্থানে গিয়ে গড়াগড়ি দিলাম। সেই সময় ছাতুর গন্ধ শুঁকে, সেখানে পড়ে থাকা জলে গা ভেজাতে, সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণের দান করার সময় পড়ে যাওয়া অন্নকণা মুখে লাগাতে এবং ব্রাহ্মণের তপস্যার প্রভাবে আমার মস্তক এবং অর্ধেক শরীর সোনায় পরিণত হল। তাঁদের তপস্যার এই মহান প্রভাব আপনারা স্বচক্ষে দেখুন। ব্রাহ্মণগণ ! আমার অর্ধেক শরীর সোনার হয়ে যাওয়ায় আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম যে বাকি শরীর কীভাবে ওইরূপ সোনার করা যায় ! সেই উদ্দেশ্যে আমি বহু তপোবন ও যজ্ঞস্থলে প্রসন্নতা সহকারে পরিভ্রমণ করে থাকি। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের এই যজ্ঞেরও অনেক আলোচনা শুনে, অনেক আশা নিয়ে আমি এখানে এসেছি। কিন্তু এখানেও আমার দেহ সোনায় পরিণত হল না। তাই আমি হেসে বলেছিলাম যে 'এই যজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রদত্ত সের খানেক ছাতুরও সমকক্ষ নয়।' কারণ সেই সময় সের খানেক ছাতুর সামান্য কিছু কণার প্রভাবেই আমার অর্ধ দেহ সুবর্ণময় হয়েছিল। কিন্তু এই মহান যজ্ঞ আমাকে তা করতে পারল না ; সুতরাং তার সঙ্গে এই যজ্ঞের কোনো তুলনা চলে না।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ব্রাহ্মণদের এই কথা বলে নেউল সেখান থেকে অন্তর্ধান করল এবং ব্রাহ্মণেরাও নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেলেন। আমি সমস্ত ঘটনা তোমাকে শোনালাম। সেই মহান অশ্বমেধ যজ্ঞে এই এক আশ্চর্যের ঘটনা হয়েছিল। সেই যজ্ঞে এরূপ ঘটনা শুনে তোমার আশ্চর্য হওয়া উচিত নয়। হাজার হাজার ঋষি যজ্ঞ না করে শুধুমাত্র তপস্যার বলে দিব্যলোক প্রাপ্ত করেছেন। কোনো প্রাণীর সঙ্গে অন্যায় না করা, সন্তোষ, শীল, সরলতা, তপস্যা, ইন্দ্রিয়সংযম, সত্য ও দান—এর এক একটি গুণ বড় বড় যজ্ঞের সমকক্ষ হয়ে থাকে।

—০—

মহর্ষি অগস্ত্যের যজ্ঞের কথা

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্মন্ ! উঞ্ছবৃত্তি ধারণকারী ব্রাহ্মণের ন্যায়ত প্রাপ্ত ছাতু দান করায় যে মহান ফল প্রাপ্তি হয়েছিল, আপনি তার বর্ণনা করেছেন। একথা নিঃসন্দেহে ঠিক ; কিন্তু সব যজ্ঞে এই উত্তম সিদ্ধান্ত কীভাবে কাজে পরিণত করা যায় ? (কারণ ন্যায্যত প্রাপ্ত অর্থ অত্যন্ত কম হয়, তার সাহায্যে বড় বড় যজ্ঞ কীভাবে করা সম্ভব ?)

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! (অধিক ধন সংগ্রহ না করেই মহান যজ্ঞানুষ্ঠান করা সম্ভব)। এই বিষয়ে প্রথমে অগস্ত্য মুনির মহান যজ্ঞে যা ঘটেছিল, সেই পুরাতন ইতিহাসের উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। সমস্ত প্রাণীর মঙ্গল চিন্তায় রত মহাতেজস্বী মহর্ষি অগস্ত্য এক সময় দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপী যজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ করেন। সেই মহাত্মার যজ্ঞে অগ্নির ন্যায় তেজস্বী হোতা ছিলেন, যাঁদের মধ্যে ছিলেন ফল-মূল আহারকারী অশ্মকুট্ট[১], মরীচিপ[২], পরিপৃষ্টিক[৩], বৈঘসিক[৪] ও প্রসংখ্যান[৫] প্রভৃতি নানাপ্রকার যতি ও ভিক্ষু ছিলেন। এঁরা সকলেই ধর্মপালনকারী, ক্রোধজয়ী, জিতেন্দ্রিয়, মনোনিগ্রহপরায়ণ, হিংসা ও দম্ভরহিত এবং সর্বদা শুদ্ধাচারী। এরূপ মহর্ষিগণ সেই যজ্ঞে উপস্থিত

[১]খাদ্য পদার্থ পাথরের ওপর ভেঙে ভোজনকারী। [২]সূর্যকিরণ পানকারী। [৩]জিজ্ঞাসা করে প্রদত্ত অন্নই শুধু গ্রহণকারী। [৪]যজ্ঞশিষ্ট অন্নই শুধু ভোজনকারী। [৫] এক সময়ের জন্য শুধু অন্নগ্রহণ করেন অথবা তত্ত্ব-বিচার করেন।

ছিলেন। এঁরা ছাড়াও আরও বহু ঋষি-মুনি সেই মহান যজ্ঞানুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন। মহর্ষি অগস্ত্য যখন এই ভাবে যজ্ঞ করছিলেন, ইন্দ্র সেই সময় জগতে বৃষ্টির বর্ষণ বন্ধ করে দিলেন। তখন যজ্ঞকর্মের মধ্যে মুনিরা অগস্ত্যের সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগলেন যে, 'ব্রাহ্মণগণ ! অগস্ত্য যজ্ঞকর্মে সংলগ্ন থেকে প্রতিদিন দ্বেষশূন্য হৃদয়ে অন্নদান করছেন। এদিকে বৃষ্টি হচ্ছে না ; এরূপ অবস্থায় অন্ন উদ্‌গম হবে কীভাবে ? এই মহান যজ্ঞ বারো বছর ধরে চলবে আর ততদিন ইন্দ্র জলবর্ষণ করবেন না। এই ব্যাপার নিয়ে ভালোভাবে চিন্তা করে আপনারা এই তপস্বী মহাত্মাকে অনুগ্রহ করুন।'

ঋষিদের কথা শুনে মহাপ্রতাপী অগস্ত্য মুনি মাথা নীচু করে তাঁদের প্রণাম জানিয়ে বললেন—'ইন্দ্র যদি বারো বছর ধরে বৃষ্টি না করেন, তাহলে আমি চিন্তাযজ্ঞ করব অর্থাৎ সংকল্পমাত্র দ্বারা আমার যজ্ঞানুষ্ঠান চলতে থাকবে অথবা স্পর্শযজ্ঞ করব—সঞ্চিত দ্রব্য ব্যয় না করে তার স্পর্শমাত্রেই দেবতাদের সন্তুষ্ট করব। যজ্ঞের এও এক সনাতন বিধি অথবা বারো বছর ধরে যদি ইন্দ্র বৃষ্টি না করেন, তাহলে আমি ব্রত-নিয়মাদি পালন করে ধ্যান দ্বারা ধ্যেয় রূপে স্থিত হয়ে এই যজ্ঞানুষ্ঠান করব। এই বীজযজ্ঞ আমার দ্বারা বহু বৎসর ধরে চালু থাকতে পারে। বীজের দ্বারাই নিজের যজ্ঞ পূর্ণ করে নেব। তাতে কোনো বাধাবিঘ্ন আসবে না। ইন্দ্র বর্ষণ করুন বা না করুন ; আমার যজ্ঞ কখনো বন্ধ হবে না। আমি নিজেই ইন্দ্র হয়ে সকল প্রজার জীবনরক্ষা করব। যে প্রাণীর যা আহার্য সে তাই পাবে অথবা আমি প্রয়োজনানুসারে বিশেষ আহারের ব্যবস্থাও প্রচুর মাত্রায় করতে পারি। এখন ত্রিলোকে যত সোনা ও ধন আছে, তা এখানে একত্র হয়ে যাবে। দিব্য অঙ্গরাগণ, গন্ধর্ব, কিন্নর, বিশ্বাবসু এবং অন্যান্য স্বর্গবাসীগণও এখানে এসে আমার যজ্ঞের উপাসনা করুন। উত্তর কুরুদেশে যত ধন আছে, সেসব এখানে এসে উপস্থিত হোক। স্বর্গ, স্বর্গনিবাসী দেবতা এবং স্বয়ং ধর্মও এই যজ্ঞে এসে উপস্থিত

হোন।'

মহর্ষি অগস্ত্য এই কথাগুলি বলতেই তাঁর তপ প্রভাবে সব কিছু তেমনই হয়ে গেল। সেই মহাতেজস্বী মহর্ষির তপস্যার বল দেখে মুনিরা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তাঁরা বিস্মিত হয়ে বলতে লাগলেন—'মহর্ষি ! আপনার কথায় আমরা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। আমরা আপনার যজ্ঞের দ্বারাই সন্তুষ্ট। ন্যায় উপার্জিত অন্নই আমাদের আহার। আমরা সর্বদা নিজ কর্মে ব্যাপৃত থাকি। এই যজ্ঞ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আমরা এখানেই উপস্থিত থাকব এবং শেষে আপনার অনুমতি নিয়ে এখান থেকে যাব।' তাঁরা এইরূপ কথাবার্তা বলছিলেন, তার মধ্যে মহর্ষির তপোবল দেখে দেবরাজ ইন্দ্র জলবর্ষণ করতে আরম্ভ করলেন। যতদিন তাঁর যজ্ঞ সমাপ্ত না হল, ততদিন সেখানে ইচ্ছানুসারে বৃষ্টি হতে লাগল। দেবরাজ ইন্দ্র বৃহস্পতিকে সঙ্গে নিয়ে নিজেই মুনির কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে প্রসন্ন করলেন। তারপর যজ্ঞ পূর্ণ হলে অগস্ত্য অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং সেখানে সমাগত সমস্ত মহর্ষিকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করে সকলকে বিদায় জানালেন।

যুধিষ্ঠিরের বৈষ্ণব ধর্ম বিষয়ক প্রশ্ন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম ও নিজ মহিমা বর্ণন

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্মন্ ! পূর্বকালে আমার প্রপিতামহ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন হলে ধর্মবিষয়ক জিজ্ঞাসার সমাধানে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কী প্রশ্ন করেছিলেন ?

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! অশ্বমেধ যজ্ঞের পর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অবভৃত-স্নান করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলেন—'ভগবান ! বৈষ্ণব ধর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা কী ফল প্রাপ্তি হয় ? ব্রহ্মহত্যাকারী, গো-হত্যাকারী, মাতৃঘাতী, গুরুপত্নীর শয্যায় শয়নকারী, আহার পরিবেশন কালে পংক্তি ভেদকারী, কৃতঘ্ন, মদ্যপ, বেদ-বিক্রেতা, মিত্র-বিশ্বাসঘাতক, কোনো বীরকে কপটভাবে হত্যাকারী, গর্ভস্থ সন্তান হত্যাকারী, তপস্যা ও দানের ফল বিক্রয়কারী, নিজ দেহ বিক্রয়কারী, মূর্খ, পাপকর্মের দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারী, পাপী, শঠ, কপটাচারী, দাম্ভিক, অপরের ওপর দোষারোপকারী, শূদ্রের সেবায় রত, চোর, অন্যের গচ্ছিত দ্রব্য লুণ্ঠনকারী, স্ত্রীহত্যাকারী, পরস্ত্রীগামী এবং আরও যত পাপী আছে, এরা সকলেই যে ধর্ম শ্রবণ করে পাপ থেকে মুক্তি লাভ করে তার বর্ণনা করুন। ভক্তবৎসল ! আমি সত্য সত্য ভক্তিভাব নিয়ে আপনার চরণে শরণাগত হয়েছি। আপনি যদি আমাকে আপনার প্রেমিক বা ভক্ত বলে মনে করেন আর আমি যদি আপনার অনুগ্রহের অধিকারী হয়ে থাকি, তা হলে আমাকে বৈষ্ণব ধর্মের কথা বলুন। আমি সেই রহস্য যথার্থরূপে জানতে চাই। আমি মনু, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম, পরাশর, মৈত্রেয়, উমা, মহেশ্বর, ব্রহ্মা, কার্তিকেয়, ভার্গব, যাজ্ঞবল্ক্য, মার্কণ্ডেয়, ভরদ্বাজ, বৃহস্পতি, বিশ্বামিত্র, জৈমিনি, পুলস্ত্য, পুলহ, অগ্নি, অগস্ত্য, মুদগল, শাণ্ডিল্য, শলভ, বালখিল্যগণ, সপ্তর্ষি আপস্তম্ব, শঙ্খ, লিখিত, প্রজাপতি, যম, মহেন্দ্র, ব্যাস, বিভাণ্ড, নারদ, কপোত, বিদুর, ভৃগু, অঙ্গিরা, সূর্য, হারীত, উদ্দালক, শুক্রাচার্য, বৈশম্পায়ন এবং অন্যান্য মহাত্মাদের কথিত ধর্ম শ্রবণ করেছি ; কিন্তু আমার বিশ্বাস যে আপনার মুখ থেকে যে ধর্ম বর্ণিত হবে ; তা অত্যন্ত পবিত্র হওয়ায় উপরিউক্ত সর্ব ধর্ম থেকে শ্রেষ্ঠ হবে। তাই কেশব ! আপনার শরণাগত আমার ন্যায় ভক্তের কাছে আপনি পবিত্র ধর্ম বর্ণনা করুন।'

ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির এইরূপ প্রশ্ন করায় সমস্ত ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁর কাছে ধর্মের সূক্ষ্ম বিষয়গুলি বর্ণনা করতে লাগলেন। তিনি বললেন—'কুন্তীনন্দন ! তুমি ধর্মের জন্য সতত যত্নশীল, তাই জগতে কোনো বস্তুই তোমার কাছে দুর্লভ হবে না। ধর্মই জীবের পিতামাতা, রক্ষক, সুহৃদ, ভ্রাতা, সখা এবং প্রভু। অর্থ, কাম, ভোগ, সুখ, উত্তম ঐশ্বর্য এবং সর্বোত্তম স্বর্গপ্রাপ্তিও ধর্মের দ্বারাই হয়ে থাকে। যদি বিশুদ্ধ ধর্মের পালন করা যায়, তবে তা মহাভয় থেকে রক্ষা করে। ধর্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব ও দেবত্ব প্রাপ্তি হয়। ধর্মই মানুষকে পবিত্র করে তোলে। যুধিষ্ঠির ! কালক্রমে যখন মানুষের পাপ বিনষ্ট হয়, তখন তার বুদ্ধি ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হয়। হাজার হাজার জন্ম পরিভ্রমণ করার পরও মনুষ্যজন্ম লাভ করা কঠিন। এরূপ দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করেও যে ধর্মানুষ্ঠান না করে, সে মহালাভ থেকে বঞ্চিত হয়। আজ যাকে নিন্দিত, দরিদ্র, কুরূপ, রোগী, অন্যের দ্বেষের পাত্র ও মূর্খ বলে দেখা যায়, সে পূর্বজন্মে কখনোই ধর্মানুষ্ঠান করেনি। কিন্তু যে দীর্ঘজীবী, শূরবীর, পণ্ডিত, ভোগসামগ্রীসম্পন্ন, নীরোগ, রূপবান—তার দ্বারা নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে ধর্ম সম্পাদন হয়েছে। এরূপে শুদ্ধভাবে করা ধর্মানুষ্ঠান উত্তম গতি লাভ করায়। কিন্তু যারা অধর্মের সেবা করে, তাদের পশুপক্ষী হয়ে জন্ম নিতে হয়।

'পাণ্ডুনন্দন ! আমি এখন তোমাকে এক রহস্যের কথা বলছি, শোনো—তোমার কাছে পরম ধর্মের বর্ণনা অবশ্যই করব। তুমি আমার ভক্ত, অত্যন্ত প্রিয় এবং সর্বদা আমার শরণাগত। তুমি জিজ্ঞাসা করলে আমি পরম গোপনীয় আত্মতত্ত্বও বর্ণনা করতে পারি, ধর্মসংহিতার তো কথাই নেই। এখন ধর্মস্থাপন এবং দুষ্টবিনাশের জন্য আমি নিজ

মায়ায় মানবশরীরে অবতার রূপ ধারণ করেছি। যারা আমাকে শুধু মনুষ্য শরীরে সীমিত মনে করে আমার অবহেলা করে, তারা মূর্খ এবং তারা জগতে বারংবার তির্যকযোনিতে ঘুরে বেড়ায়। অন্যদিকে যারা জ্ঞানদৃষ্টিতে আমাকে সমস্ত ভূতে অবস্থিত দেখে, তারা সর্বদা আমাতে মন ন্যস্ত করে রাখে, আমার ভক্ত। এরূপ ভক্তদের আমি পরমধামে আমার কাছে ডেকে নিই। আমার ভক্তদের বিনাশ নেই, তারা নিষ্পাপ হয়। মানুষের মধ্যে যাঁরা আমার ভক্ত তাদেরই জন্ম সফল। হাজার হাজার জন্ম তপস্যা করে যখন মানুষের হৃদয় শুদ্ধ হয়ে যায়, তখন তার মধ্যে ভক্তির উদয় হয়। আমার যা অত্যন্ত গোপনীয়, কূটস্থ, অচল এবং অবিনাশী পরস্বরূপ, তা আমার ভক্তেরা যেমন অনুভব করে তেমন দেবতাদেরও হয় না এবং যা আমার অপরস্বরূপ, তা অবতার গ্রহণ করলে দৃষ্টিগোচর হয়। জগতের সমস্ত জীব সর্বপ্রকার পদার্থের দ্বারা আমার স্বরূপের পূজা করে। যে ব্যক্তি আমাকে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কারণ জেনে আমার শরণ গ্রহণ করে, আমি তাকে কৃপা করে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত করে দিই। আমিই দেবতাদের আদি। ব্রহ্মাদি দেবতাদের আমিই সৃষ্টি করেছি। আমি নিজ প্রকৃতির সাহায্যে সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করি। ব্রহ্মা থেকে কীটাণুকীট পর্যন্ত সকলের মধ্যেই আমি পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকি। দ্যুলোককে আমার মস্তক বলে জেনো। সূর্য এবং চন্দ্র আমার চক্ষু। গো, অগ্নি ও ব্রাহ্মণ আমার মুখ, বায়ু আমার নিঃশ্বাস। অষ্টদিক আমার বাহু, নক্ষত্র আমার অলংকার, সমস্ত ভূতেদের আশ্রয়স্থল অন্তরীক্ষ আমার বক্ষস্থল। মেঘ এবং হাওয়া চলার যেটি পথ তাকে আমার অবিনাশী উদর বলে জানবে। দ্বীপ, সমুদ্র এবং জঙ্গলাকীর্ণ এই ভূমণ্ডল আমার দুটি পায়ের স্থানে অবস্থিত। আমার সহস্র সহস্র মস্তক, সহস্র সহস্র মুখ, সহস্র সহস্র চক্ষু, বাহু, উদর, উরু ও পা। আমি পৃথিবীকে সর্বদিক থেকে ধারণ করে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড থেকে দশ আঙুল উচ্চে অর্থাৎ সবার অতীত হয়ে বিরাজ করি। আমি সর্বপ্রাণীর আত্মা, তাই আমাকে সর্বব্যাপী বলা হয়। আমি অচিন্ত্য, অনন্ত, অজর, অজন্মা, অনাদি, অবধ্য, অপ্রমেয়, অব্যয়, নির্গুণ, গূঢ়স্বরূপ, নির্দ্বন্দ্ব, নির্মম, নিষ্ফল, নির্বিকার এবং মোক্ষের আদি কারণ। সুধা, স্বধা এবং স্বাহাও আমিই। আমি চতুরাশ্রমের ধর্ম, চার প্রকার হোতার দ্বারা সম্পন্ন হওয়া যজ্ঞ, চতুর্ব্যূহ, চতুর্যজ্ঞ এবং চার আশ্রমের সৃষ্টিকারী। প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ সংহার করে সেটি নিজ উদরে স্থাপন পূর্বক দিব্য যোগের আশ্রয় নিয়ে আমি একার্ণবের জলে শয়ন করি। এক হাজার যুগ ধরে থাকা ব্রহ্মার রাত্রি পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত মহার্ণবে শয়ন করার পর স্থাবর-জঙ্গম প্রাণীদের সৃষ্টি করি। প্রত্যেক কল্পেই আমি জীবেদের সৃষ্টি ও সংহার করে থাকি ; কিন্তু আমার মায়ায় মোহিত হওয়ায় জীবসকল আমাকে জানতে পারে না। রাজন্ ! এমন বস্তু কখনো কোথাও নেই যাতে আমি নিবাস না করি এবং এমন কোনো জীব নেই যা আমাতে স্থিত নয়। আমি তোমাকে সত্য কথা বলছি, অতীত ও ভবিষ্যৎ যা কিছু আছে, সে সবই আমি। সমস্ত প্রাণী আমা হতেই উৎপন্ন হয় এবং তারা আমারই স্বরূপ। কিন্তু মায়াবদ্ধ হওয়ায় তারা আমার স্বরূপ জানে না। এইভাবে দেবতা, অসুর, মানুষসহ জগতের সমস্ত প্রাণী আমা হতেই জন্মগ্রহণ করে এবং আমাতেই লয় প্রাপ্ত হয়।'

—— ০ ——

চতুর্বর্ণের কর্ম এবং তার ফলাদির বর্ণনা, ধর্মের বৃদ্ধি এবং পাপক্ষয় হওয়ার উপায়

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে সমস্ত জগৎ তাঁর হতে উৎপন্ন জানিয়ে ধর্মনন্দন যুধিষ্ঠিরকে পবিত্র ধর্মের বর্ণনা দিতে আরম্ভ করলেন—'পাণ্ডুনন্দন ! যে ব্যক্তি পবিত্র ও একাগ্রচিত্ত হয়ে তপস্যারত থেকে স্বর্গ, যশ ও আয়ুপ্রদানকারী জানার যোগ্য ধর্ম শ্রবণ করে, সেই শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তির—বিশেষত আমার ভক্তের পূর্বসঞ্চিত যত পাপ থাকে, তা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়ে যায়।'

শ্রীকৃষ্ণের এই পরম পবিত্র ও সত্য কথা শুনে সমস্ত দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, গন্ধর্ব, অপ্সরা, ভূত, যক্ষ, গ্রহ, গুহ্যক, সর্প, মহাত্মা বালখিল্য, তত্ত্বদর্শী যোগী এবং ভগবদ্‌ভক্ত পুরুষ মনে মনে প্রসন্ন হয়ে ধর্মের অদ্ভুত রহস্য চিন্তা করতে করতে উত্তম বৈষ্ণব ধর্মের উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে সেখানে এলেন। তাঁরা এসে মাথা নত করে ভগবানকে প্রণাম করলেন। ভগবানের দিব্য দৃষ্টির প্রভাবে সকলে নিষ্পাপ হয়ে গেলেন। তাঁদের সেখানে দেখে মহাপ্রতাপশালী ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ভগবানকে প্রণাম করে প্রশ্ন করলেন—'জগদীশ্বর ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের কীরূপ পৃথক গতি হয় ? এঁদের সকলের কর্মের ফল বর্ণনা করুন।'

ভগবান বললেন—ধর্মরাজ ! ক্রমানুসারে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের ধর্মের বর্ণনা শোনো। যে ব্রাহ্মণ শিখা ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন, সন্ধ্যা-উপাসনা করেন, পূর্ণাহুতি দেন, বিধিবৎ অগ্নিহোত্র করেন, বলিবৈশ্বদেব ও অতিথি সেবা করেন, নিত্য স্বাধ্যায়ে ব্যাপৃত থাকেন ; যিনি সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে হোম করার পরই অন্নগ্রহণ করেন, শূদ্র-অন্ন গ্রহণ করেন না, দম্ভ ও মিথ্যা ভাষণ থেকে দূরে থাকেন, নিজ স্ত্রীতে আসক্ত থাকেন এবং পঞ্চযজ্ঞ ও অগ্নিহোত্র করেন, সেই ব্রাহ্মণ পাপরহিত হয়ে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।

ক্ষত্রিয়দের মধ্যেও যিনি রাজসিংহাসনে আসীন হয়ে নিজ ধর্ম পালন ও প্রজাদের ভালোভাবে রক্ষা করেন, প্রজাদের আয়ের ষষ্ঠভাগ খাজনা হিসাবে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন, যজ্ঞ এবং দান করতে থাকেন, ধৈর্যশীল, নিজ স্ত্রীতে সন্তুষ্ট থাকেন, শাস্ত্রানুসারে চলেন, তত্ত্ববিদ এবং প্রজাদের মঙ্গলকার্যে ব্যাপৃত থাকেন, ব্রাহ্মণদের ইচ্ছাপূর্ণ করেন, পোষ্যপালনে তৎপর থাকেন, প্রতিজ্ঞা পালন করেন, সর্বদা পবিত্র থাকেন এবং লোভ ও দম্ভ পরিত্যাগ করেন, তিনি দেবতা তুল্য উত্তম গতি লাভ করেন।

যে বৈশ্য কৃষি ও গো-পালনে ব্যাপৃত থাকেন, ধর্ম অনুসন্ধান করেন ; দান, ধর্ম ও ব্রাহ্মণদের সেবায় সংলগ্ন থাকেন, সত্যপ্রতিজ্ঞ, নিত্য পবিত্র, লোভ ও দম্ভরহিত, সরল, নিজ স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত ও হিংসা-দ্রোহ থেকে দূরে থাকেন, যিনি কখনো বৈশ্য ধর্ম ত্যাগ করেন না এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণদের পূজায় ব্যাপৃত সেই বৈশ্য অপ্সরা দ্বারা সম্মানিত হয়ে স্বর্গলোকে গমন করেন।

শূদ্রদের মধ্যে যারা সর্বদা তিন বর্ণের সেবা করেন, বিশেষত ব্রাহ্মণের সেবার জন্য একাগ্র চিত্তে উপস্থিত থাকেন ; যিনি বিনা চাওয়াতেই দান করেন, সত্য ও শৌচ পালন করেন, গুরু ও দেবতাপূজায় প্রীতি রাখেন, পরস্ত্রী সংসর্গ থেকে দূরে থাকেন, অপরকে কষ্ট না দিয়ে কুটুম্ব পালন করেন এবং সর্বজীবকে অভয়প্রদান করেন, সেই শূদ্র স্বর্গ লাভ করেন।

এইরূপ ধর্মের থেকে শ্রেষ্ঠ কোনো সাধন নেই। এগুলি নিষ্কামভাবে আচরণ করলে সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ হয়। ধর্ম থেকে শ্রেষ্ঠ পাপ নাশের অন্য কোনো উপায় নেই ; তাই এই দুর্লভ মনুষ্য-জীবন লাভ করে সর্বদা ধর্মাচরণ করা কর্তব্য। ধর্মানুরাগী মানুষের জন্য জগতে কোনো বস্তুই দুর্লভ নয়। ব্রহ্মা এই জগতে যে বর্ণের জন্য যেরূপ ধর্মের বিধান দিয়েছেন, সেইমতো ধর্মের আচরণ করে মানুষ নিজ পাপ বিনাশ করতে সক্ষম হয়। মানুষের নিজ জাতিগত ধর্ম কখনো পরিত্যাগ করা উচিত নয়। সেই ধর্ম নিষ্কামভাবে আচরণ করলে মানুষ সিদ্ধি (মুক্তি) লাভ করে। নিজ ধর্ম গুণরহিত হলেও তা পাপবিনাশ করে। এর বিপরীতে যদি মানুষের পাপবৃদ্ধি হয়, তাহলে সে তার ধর্মকে ক্ষীণ করে ফেলে।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—কেশব ! শুভ এবং অশুভের বৃদ্ধি ও হ্রাস কীভাবে হয়, সেটি জানার জন্য আমার অত্যন্ত উৎকণ্ঠা হচ্ছে।

ভগবান বললেন—তুমি যা জিজ্ঞাসা করেছ তার উত্তর শোনো। পাপ অন্যকে জানিয়ে দিলে এবং তার জন্য

অনুতাপ করলে প্রায়শ তা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তেমনই আবার ধর্ম নিজ মুখে অন্যের কাছে প্রকাশ করলে তা নষ্ট হয়ে যায়। লুকিয়ে রাখলে দুটিই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাই বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য হল নিজ পাপ প্রকাশ করা, তা লুকোনোর চেষ্টা না করা। পাপের কথা বললে পাপের বিনাশ হয়, তাই সর্বদা পাপ প্রকাশ করা এবং ধর্ম গোপন রাখা উচিত।

নিরর্থক জন্ম, দান ও জীবনের বর্ণনা, সাত্ত্বিকাদি দানের লক্ষণ, দানের যোগ্য পাত্র ও ব্রাহ্মণের মহিমা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তারপর ভগবানকে পুনরায় ধর্মবিষয়ে প্রশ্ন করেন—'পুরুষোত্তম ! কোন কোন জন্ম ব্যর্থ মনে করা হয়, কত প্রকারের দান নিষ্ফল হয় এবং কোন কোন মানুষের জীবন নিরর্থক বলে মনে করা হয় ? সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক দান কী প্রকারের হয় ? তার দ্বারা কার তৃপ্তি হয় ? উত্তম দানের স্বরূপ কী ? তার দ্বারা কী ফল লাভ হয়, কৃপা করে এগুলি বলুন। আমি এইসব বিষয় জানতে চাই এবং এগুলি শোনার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে আছি।'

ভগবান বললেন—রাজন্ ! আমি তোমাকে ন্যায় অনুসারে যথার্থ এবং উত্তম উপদেশ শোনাচ্ছি। মন দিয়ে শোনো। এ বিষয় পরম পবিত্র এবং সম্পূর্ণ পাপনাশকারী। চতুর্দশ জন্ম ব্যর্থ বলে মনে করা হয়। পঞ্চান্ন প্রকারের দান নিষ্ফল হয় এবং ছয় প্রকার মানুষের জীবন নিরর্থক হয়ে থাকে। সেসব আমি ক্রমশ বর্ণনা করছি। ধর্মনাশকারী, লোভী, পাপী, বলিবৈশ্বদেব না করে ভোজনকারী, পরস্ত্রীগামী, আহারে ভেদকারী, অসত্যভাষী, বন্ধুবান্ধবকে ক্লেশপ্রদান করে একাকী সুখগ্রহণকারী, মাতাপিতা, অধ্যাপক-গুরু ও গুরুজনদের গালি প্রদানকারী, ব্রাহ্মণ হয়েও সন্ধ্যা-পূজন করেন না যিনি, অগ্নিহোত্র ত্যাগকারী, শ্রাদ্ধ-তর্পণ থেকে দূরে থাকেন যিনি, ব্রাহ্মণ হয়েও শূদ্রান্ন ভোজনকারী এবং আমাকে, ভগবান শংকর ও ব্রহ্মাকে ভক্তিপ্রদান করেন না যিনি—এই চতুর্দশ প্রকারের মানুষ অধম হয়ে থাকে। এই পাপীদের জন্ম ব্যর্থ বলে জানবে।

যে দান অশ্রদ্ধা ও অপমানের সঙ্গে প্রদান করা হয়, যে দান লোককে দেখানোর জন্য করা হয়, যে দান পাষণ্ডীকে করা হয়, যে দান শূদ্রের ন্যায় আচরণকারী ব্যক্তি গ্রহণ করে, যে দান নিজ মুখে বারংবার বর্ণনা করা হয়, যে দান রোষপূর্বক প্রদান করা হয়, যা দান করার পরে তার জন্য দুঃখ বা শোক হয় ; দম্ভ দ্বারা উপার্জন করা অন্ন, মিথ্যা বলে নিয়ে আসা অন্ন, ব্রাহ্মণের ধন, চুরি করা দ্রব্য ; কলঙ্কিত ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত দান যা পতিত ব্রাহ্মণকে দেওয়া হয়েছে ; যে দানের বস্তু বেদবিহীন ব্যক্তি, সকলের কাছে ভিক্ষাকারী, সংস্কারহীন পতিত ব্যক্তি বা একবার সন্ন্যাসী হয়ে পুনর্বার সংসারে ফিরে আসা ব্যক্তি গ্রহণ করেছে ; যে দান বেশ্যাগৃহগামীকে এবং শ্বশুরালয়ে আশ্রয়গ্রহণকারী ব্রাহ্মণকে দেওয়া হয়েছে ; সমস্ত গ্রামের থেকে ভিক্ষাগ্রহণকারী, কৃতঘ্ন, উপপাতকী, বেদ বিক্রয়কারী, রাজসেবক, জ্যোতিষী, তান্ত্রিক, শূদ্রানারীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকারী, অস্ত্রদ্বারা জীবিকা-নির্বাহকারী, সাপ ধরে যে ব্যক্তি, পুরোহিত, বৈদ্য, ব্যবসায়ী, মন্ত্র জপ করে জীবিকা নির্বাহকারী শূদ্র, শূদ্রের আশ্রয় গ্রহণকারী, অর্থ নিয়ে পূজা করে যে ব্যক্তি, দেবোত্তর সম্পত্তি আত্মসাৎকারী, ছবি তৈরি করে যে ব্যক্তি, অভিনয় করে যে ব্যক্তি, মাংস বিক্রয়কারী, সেবাকারী, ব্রাহ্মণোচিত আচারহীন হয়েও যে নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে, উপদেশ প্রদানের শক্তিরহিত, সুদখোর, অনাচারী, অগ্নিহোত্র করে না যে, সন্ধ্যা-উপাসনা যে করে না, মিথ্যা সাধুবেশধারী, সব কিছু আহার গ্রহণকারী, নাস্তিক, ধর্মবিক্রেতা, নীচপ্রবৃত্তিসম্পন্ন, মিথ্যা সাক্ষদানকারী, কূটনীতির আশ্রয় নিয়ে যে ব্রাহ্মণ গ্রামের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে, এইসব ব্যক্তিদের যে দান করা হয়, তা নিষ্ফল হয়ে যায়। উপরিউক্ত ব্রাহ্মণদের বহু দান দিলেও তা ভস্মে দেওয়া ঘৃতাহুতির মতো ব্যর্থ হয়। এই সকল দান করার যে ফল, তা রাক্ষস ও পিশাচেরা ছিনিয়ে নেয়।

যুধিষ্ঠির ! এবার যেসব মানুষদের জীবন ব্যর্থ, তাদের পরিচয় জানাচ্ছি, শোনো ! যে সব ব্যক্তি ভগবান শংকর,

আমার এবং পৃথিবীর দেবতা ব্রাহ্মণদের শরণ গ্রহণ করে না, তাদের জীবন ব্যর্থ। যার বৃথা তর্কেই আসক্তি, যে নাস্তিকতার পথ অবলম্বন করে, যে আচার পরিত্যাগ করেছে এবং যে দেবতাদের নিন্দা করে, তাদের জীবনও ব্যর্থ। যে নরাধম ব্যক্তি নাস্তিকদের শাস্ত্র পাঠ করে ব্রাহ্মণ ও যজ্ঞাদির নিন্দা করে, সে বৃথা জীবন ধারণ করে। যে মূঢ়, দুর্গা, কার্তিক, বায়ু, অগ্নি, জল, সূর্য, মাতাপিতা, গুরু, ইন্দ্র ও চন্দ্রের নিন্দা করে ও আচার পালন করে না, সে-ও বৃথা জীবন কাটায়। যে ব্যক্তি অর্থ থাকলেও দান ও ধর্ম পালন করে না, অন্যকে না দিয়ে নিজেই ভোগ করে, তার জীবনও নিরর্থক। এইসব বৃথা জীবনের কথা এখানে বলা হল।

এবার দানের সময়ের কথা বলছি। যে ব্যক্তি স্নান করে পবিত্র হয়ে মন ও ইন্দ্রিয়াদি প্রসন্ন রেখে শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করে, সে যৌবনাবস্থায় তার ফল ভোগ করে। যে স্বয়ং দানযোগ্য বস্তু ভক্তিপূর্বক সৎপাত্রে দান করে সে আমৃত্যু সর্বসময় সেই দানের ফল প্রাপ্ত হয়। দান এবং তার ফল সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভেদে তিন প্রকারের হয় এবং তার গতিও তিন প্রকারের হয়। সেই বিষয়ের বর্ণনা শোনো—দান করা কর্তব্য, এই কথা ভেবে কোনো উপকার করেননি সেরূপ ব্রাহ্মণকে যে দান করা হয়, তা হল সাত্ত্বিক দান। যার পরিবার বৃহৎ এবং যে দরিদ্র ও বেদবিদ্বান, এরূপ ব্রাহ্মণকে প্রসন্নতাসহ যা দেওয়া হয়, তাও সাত্ত্বিক দানের অন্তর্গত। কিন্তু যে বেদ জানে না, যার গৃহে বহু সম্পত্তি আছে এবং যে আগে উপকার করেছে, সেই ব্রাহ্মণকে দেওয়া দান রাজস দানের অন্তর্গত। নিজ আত্মীয় এবং প্রমাদীকে দেওয়া, ফলের আশা করে দেওয়া এবং অপাত্রে দেওয়া দানকেও রাজস দান বলা হয়। যে ব্রাহ্মণ বলিবৈশ্বদেব করে না, যার বেদের জ্ঞান নেই এবং যে চুরি করে, তাকে যে দান করা হয়, সেই দান হল তামস দান। ক্রোধ, তিরস্কার, ক্লেশ ও অবহেলা সহকারে এবং সেবককে দেওয়া দানকেও তামস দান বলা হয়। সাত্ত্বিক দান দেবতা, পিতৃপুরুষ, মুনি এবং অগ্নি গ্রহণ করেন এবং তার দ্বারা তাঁরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। রাজস দান দানব, দৈত্য, গ্রহ, যক্ষ এবং রাক্ষসদের উপভোগে লাগে এবং তামস দান পাপী ও মলিন কর্মকারী প্রেত এবং পিশাচেরা প্রাপ্ত হয়। এবার ত্রিবিধ গতির বর্ণনা শোনো। সাত্ত্বিক দানের ফল উত্তম, রাজস দানের ফল মধ্যম এবং তামস দানের ফল অধম হয়। দানের উত্তম পাত্র অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণকে যে দান করা হয়, সেই দান অক্ষয় বলা হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি বেদবিদ্ হয়েও দরিদ্র, তার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা নিজে করবে এবং সম্পত্তিশালী দ্বিজদের রক্ষা করবে। ধনহীন দরিদ্র ব্রাহ্মণদের দান দিয়ে তাদের ভালোভাবে সেবা করো। দাতার পাপ, দান করার সঙ্গে সঙ্গেই দানগ্রহীতার কাছে চলে যায় এবং তার পুণ্য দাতা লাভ করে, সুতরাং পরলোকে নিজ হিত আকাঙ্ক্ষাকারী ব্যক্তির সর্বদা দান করা উচিত। যে ব্যক্তি বেদবিদ্যা লাভ করে অত্যন্ত শুদ্ধ আচার-বিচারে থাকে এবং কখনো শূদ্রান্ন গ্রহণ করে না, এরূপ বিদ্বানদের যত্নপূর্বক দান করা কর্তব্য।

পাণ্ডুনন্দন ! যে ব্রাহ্মণদের পত্নীগণ তাঁদের পতির আহারের শেষাংশ বহুগুণ লাভজনক মনে করে তা পাবার জন্য প্রতীক্ষা করে থাকেন, সেই ব্রাহ্মণদের তুমি আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করবে। দরিদ্র ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁদের নিরাশ করে ফেরাবে না, তাহলে তাঁরা আশাহত হবেন। যাঁরা আমার ভক্ত, আমার শরণাগত, আমার পূজা করেন এবং নিয়মিত আমাতেই ঘনিষ্ঠভাবে থাকেন, তাঁদের যত্নসহকারে পূজা করা উচিত। যুধিষ্ঠির ! আমার সেই ভক্তদের পবিত্র করার জন্য আমি প্রতিদিন দুই বার আহ্নিকে ব্যাপ্ত থাকি। আমার এই নিয়ম কখনো লঙ্ঘিত হয় না, তাই আমার নিষ্পাপ ভক্তদের আত্মশুদ্ধির জন্য সন্ধ্যার সময় নিরন্তর অষ্টাক্ষর মন্ত্র (ওঁ নমো নারায়ণায়) জপ করা উচিত। আহ্নিক এবং অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করলে অন্য ব্রাহ্মণদেরও পাপ বিনাশ হয়। সুতরাং চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রত্যেক ব্রাহ্মণের উভয় কালে আহ্নিক করা উচিত। যে ব্রাহ্মণ এইভাবে আহ্নিক, উপাসনা ও জপ করে থাকেন, তাঁকে দেবকার্য ও শ্রাদ্ধকার্যে নিযুক্ত করা উচিত। কখনো তার নিন্দা করতে নেই ; কারণ তাঁর নিন্দা করলে আগুন যেমন সব পুড়িয়ে ছাই করে দেয়, তেমনই ব্রাহ্মণ সেই শ্রাদ্ধকে সেভাবেই বিনষ্ট করেন। ধর্মজ্ঞ পুরুষের যজ্ঞে ব্রাহ্মণদের পরীক্ষা করা উচিত নয় ; এরূপ করলে যজমানের অত্যন্ত নিন্দা হয়। ব্রাহ্মণদের নিন্দাকারী মানুষ কুকুরের জন্ম প্রাপ্ত হয়, তাঁকে দোষারোপকারী ব্যক্তি গাধা জন্ম পায় এবং তাঁকে তিরস্কার বা দ্বেষকারী ব্যক্তি কীট জন্ম প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধিমান মানুষের উচিত ক্ষত্রিয়, সাপ বা বিদ্বান ব্রাহ্মণ যদি দুর্বলও হয়, তাদের কখনো অপমান না করা ; কারণ এই তিন জন অপমানিত হলে মানুষের সর্বনাশ

করতে পারে। ব্রাহ্মণ জন্ম থেকেই ধর্মের সনাতন মূর্তি। ধর্মের জন্যই তার উৎপত্তি এবং মুক্তির ওপর তাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার। ব্রাহ্মণ নিজ শক্তিতেই অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে, অন্য মানুষেরা ব্রাহ্মণের দয়াতেই আহার প্রাপ্ত হয়, তাই ব্রাহ্মণকে কখনো অপমান করা উচিত নয়। কারণ তাঁরা সর্বদা আমাতেই ভক্তি রেখে থাকেন।

যে ব্রাহ্মণ বৃহদারণ্যক উপনিষদে বর্ণিত আমার গূঢ় ও নিষ্কল স্বরূপের জ্ঞান ধারণ করেন, তাঁকে যত্নসহকারে পূজা করবে। গৃহেই থাকো বা বিদেশে, আমার ভক্ত ব্রাহ্মণদের নিত্য শ্রদ্ধাসহ পূজা করবে। ব্রাহ্মণের মতো কোনো দেবতা, ব্রাহ্মণের সমান গুরু, ব্রাহ্মণের থেকে বড় বন্ধু এবং ব্রাহ্মণের থেকে শ্রেষ্ঠ কোনো নিধি নেই। কোনো তীর্থ বা পুণ্য ব্রাহ্মণের থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। ব্রাহ্মণের থেকে বড় পবিত্র কোনো কিছু নেই। ব্রাহ্মণের থেকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং ব্রাহ্মণের থেকে উত্তম কোনো গতি নেই। পাপকর্মের জন্য নরকে পতনোন্মুখ মানুষকে একমাত্র সুব্রাহ্মণই উদ্ধার করতে সক্ষম। যিনি বাল্যকাল থেকেই অগ্নিহোত্র করেন, শান্ত, শূদ্রান্ন ত্যাগকারী, আমার ভক্ত এবং সর্বদা আমার পূজা করে থাকেন, তাঁকে দেওয়া দান অক্ষয় হয়ে থাকে। আমার ভক্ত ব্রাহ্মণকে দান দিয়ে তাঁর পূজা করলে, মাথা নত করলে, সৎকার করলে, আলাপ আলোচনা করলে অথবা দর্শন করলে, মানুষের দিব্যলোক লাভ হয়। যেসব ব্যক্তি আমার গুণ ও লীলাপাঠ, আমাকে নমস্কার ও ধ্যান করেন, তাঁদের দর্শন ও স্পর্শকারী ব্যক্তি সর্বপাপ হতে মুক্তিলাভ করে। যাঁরা আমার ভক্ত, যাদের প্রাণ আমাতেই সংলগ্ন, যাঁরা আমার মহিমা গীত করেন এবং আমার শরণে থাকেন, যাঁদের উৎপত্তি শুদ্ধ রজ-বীর্যে হয়, যাঁরা বেদবিদ্, জিতেন্দ্রিয় এবং শূদ্রান্ন গ্রহণ করেন না, তাঁদের দর্শন করলেই পবিত্র হওয়া যায়—এইসব ব্যক্তিদের গৃহে উপস্থিত হয়ে ভক্তিপূর্বক বিশেষরূপে দান করা উচিত। সেই দান সাধারণ দানের থেকে কোটিগুণ ফলপ্রদানকারী হয়। শয়নে-স্বপনে, দেশে-বিদেশে যে ব্রাহ্মণের হৃদয় থেকে আমি কখনো দূরে থাকি না, সেই ব্রাহ্মণের পূজা, দর্শন ও স্পর্শ বা সম্ভাষণ মাত্রেই মানুষ পবিত্র হয়ে ওঠে। এইরূপ সর্বাবস্থায় আমার ভক্তদের প্রদত্ত দান স্বর্গ প্রদানকারী হয়ে থাকে।

বীজ ও যোনি শুদ্ধি, গায়ত্রী-জপ এবং ব্রাহ্মণদের মহিমা বর্ণনা

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! এইভাবে সাত্ত্বিক-রাজসিক-তামসিক দান, তার ভিন্ন ভিন্ন গতি এবং পৃথক পৃথক ফলের বর্ণনা শুনে ধর্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। এই পরমপবিত্র ধর্মরূপ অমৃত পান করে তাঁর তৃপ্তি হল না, তাই তিনি পুনরায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'জগদীশ্বর ! আমাকে বীজ ও যোনি (বীর্য ও রজ) দ্বারা শুদ্ধ পুরুষদের লক্ষণ বলুন। বীজ দোষে কীরূপ মানুষ জন্মায়, তার সঙ্গে ব্রাহ্মণদের উত্তম, মধ্যম ইত্যাদি বিশেষ পার্থক্য এবং তাঁদের গুণ-দোষেরও বর্ণনা করুন। আমি আপনার ভক্ত, অতএব আমার জিজ্ঞাসিত সমস্ত বিষয় কৃপা করে বলুন।'

ভগবান বললেন—রাজন্ ! বীজ ও যোনির শুদ্ধি-অশুদ্ধির যথার্থ বর্ণনা শোনো। তার শুদ্ধির দ্বারাই এই জগৎ টিকে থাকে, আর অশুদ্ধিতেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। যে ব্রাহ্মণ বিধিবৎ ব্রহ্মচর্য পালন করেন, যাঁর ব্রত কখনো খণ্ডিত হয় না, তাকে শুদ্ধ বীজ বলে জানতে হবে। তার বীজই শুভ। তেমনই যে কন্যা বিশুদ্ধ পিতা ও মাতার দ্বারা উত্তম কুলে জন্ম নেয়, যার যোনি দূষিত হয়নি এবং যার ব্রাহ্ম ইত্যাদি উত্তম বিবাহবিধির দ্বারা বিবাহ হয়েছে, তাকে উত্তম বলে মানা হয়। তার যোনিই শ্রেষ্ঠ। যে নারী মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা পরপুরুষের সঙ্গে সমাগম করে, তার যোনি গর্ভাধানের যোগ্য নয়। যে পাপাত্মা পুরুষ সন্তান আকাঙ্ক্ষায় ব্যাভিচারিণী স্ত্রীকে স্বীকার করে, সে তার পূর্বপুরুষের দশপুরুষ এবং পরবর্তী দশপুরুষ সন্তানদের নরকে প্রেরণ করে। যে ব্যক্তি মূর্খতাবশত দূষিত যোনিতে বীর্য স্থাপন করে, সেই সন্তান ছয় অঙ্গের বিদ্বান হয়ে উঠলেও, সাধু পুরুষদের উচিত তাকে চণ্ডালের ন্যায় বহিষ্কার করা। যে নারী মন-বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা ব্যাভিচার করে, তাকে কুলঘাতিনী বলে জানতে হবে। তার গর্ভে জন্ম নেওয়া বালক চণ্ডালের সমান হয়। দূষিত যোনিতে উৎপন্ন হওয়া মানুষ যজ্ঞ, দান, ভোজন, বার্তালাপ, শয়ন ও বিবাহ আদির দ্বারা সম্পর্ক ইত্যাদিতে যোগদানের যোগ্য হয় না। অবিবাহিত কন্যার গর্ভে উৎপন্ন, বিবাহের সময় গর্ভবতী কন্যার গর্ভে উৎপন্ন, পতির জীবিতাবস্থায় ব্যাভিচার দ্বারা

উৎপন্ন, পতির মৃত্যুর পর অন্যপুরুষের দ্বারা উৎপন্ন, সন্ন্যাসীর বীর্যে উৎপন্ন এবং পতিত মানুষের দ্বারা উৎপন্ন—এই ছয় প্রকারের ব্রাহ্মণ চণ্ডাল হয়। এদের চণ্ডালের থেকেও নীচ বলে জানতে হয়। যেসব ব্যক্তি যেখানে সেখানে যে কোনো নারী বা শূদ্রনারীর সঙ্গে সমাগম করে, সেই পাপাত্মাকে স্বেচ্ছাচারী বলা হয়। তার বীজ অশুভ। সেই অশুদ্ধ বীর্য কোনো শুদ্ধ নারীর যোগ্য নয়। তার সঙ্গে সম্পর্কের দ্বারা শুদ্ধ যোনিও অশুদ্ধ হয়ে যায়। ব্রাহ্মণের বীর্য শূদ্র যোনিতে গিয়ে আত্মগ্লানি ভোগ করতে থাকে। বীর্যকে আত্মা বলা হয়, এ হল সবথেকে শ্রেষ্ঠ দেবতা, তাই একে সর্বভাবে রক্ষা করতে হয়। মানুষ ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারা আয়ু, তেজ, বল, বীর্য, বুদ্ধি, লক্ষ্মী, মহান যশ, পুণ্য এবং আমার ভক্তি লাভ করে। যে ব্যক্তি গৃহস্থ-আশ্রমে থেকে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন করে পঞ্চযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে তৎপর হয়ে থাকে, সে পৃথিবীতে ধর্মস্থাপন করে। যে প্রত্যহ সন্ধ্যা ও প্রভাতে বিধি অনুসারে সন্ধ্যা-উপাসনা করে, সে বেদময় নৌকার সাহায্যে সংসার সমুদ্র নিজে পার হয় এবং অপরকেও পার করে দেয়। যে ব্রাহ্মণ সকলকে পবিত্রকারী বেদমাতা গায়ত্রীর জপ করেন, তিনি আসমুদ্র পৃথিবী দান গ্রহণ করলেও প্রতিগ্রহ দোষে দুঃখ পান না এবং সূর্যাদি যেসব গ্রহ তাঁর পক্ষে অশুভ স্থানে থেকে অনিষ্টকারক হয়, সেগুলিও গায়ত্রী-জপের প্রভাবে শান্ত, শুভ ও কল্যাণকর হয়ে ওঠে। কোনো অশুভ, ভয়ংকর, ক্রূরকর্মকারী দুষ্কৃতিও সেই ব্রাহ্মণের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। বৈদিক ব্রত আচরণকারী ব্যক্তি পৃথিবীতে অপরকে পবিত্র করে তোলেন। প্রজাপতি মনু বলেন যে—'শীল, স্বাধ্যায়, দান, শৌচ, কোমলতা, সরলতা—এই সদ্‌গুণগুলি ব্রাহ্মণের কাছে বেদের থেকেও শ্রেষ্ঠ।' যে ব্রাহ্মণ 'ভূর্ভুব স্বঃ' এই ব্যাহৃতি-সহ গায়ত্রী জপ করেন, বেদ-স্বাধ্যায়ে ব্যাপৃত থাকেন এবং নিজ স্ত্রীতে প্রীতি রাখেন, তিনিই জিতেন্দ্রিয়, তিনিই বিদ্বান এবং তিনিই এই ভূমণ্ডলের দেবতা।

যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ প্রত্যহ গায়ত্রী উপাসনা করেন, তিনি নিঃসন্দেহে ব্রহ্মলোক লাভ করেন। কেবল গায়ত্রী মন্ত্র জানা ব্রাহ্মণও যদি নিয়মে থাকেন, তাহলে তিনি শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু যে ব্রাহ্মণ চারবেদে বিদ্বান হয়েও সকলের অন্নগ্রহণ করেন, কোনো নিয়ম পালন করেন না, তাঁকে উত্তম বলে মানা হয় না। পূর্বকালে দেবতা এবং ঋষিগণ ব্রহ্মার সামনে গায়ত্রীমন্ত্র এবং চার বেদকে তৌলযন্ত্রে ওজন করেছিলেন। সেই সময় গায়ত্রী মন্ত্রের দিক, চার বেদের থেকে ভারী বলে প্রমাণিত হয়েছিল। ভ্রমর যেমন প্রস্ফুটিত ফুলের থেকে মধু আহরণ করে, তেমনই সম্পূর্ণ বেদ মন্থন করে গায়ত্রীমন্ত্র গ্রহণ করা হয়েছে। তাই গায়ত্রীকে সমস্ত বেদের সার বলা হয়। বিনা গায়ত্রী সকল বেদই নির্জীব। নিয়ম এবং সদাচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ চারবেদে বিদ্বান হলেও নিন্দার পাত্র হয়ে থাকে ; কিন্তু শীল ও সদাচারযুক্ত ব্রাহ্মণ যদি শুধুমাত্র গায়ত্রী মন্ত্র জপ করেন তাহলে তাঁকে শ্রেষ্ঠ মানা হয়। প্রতিদিন এক হাজার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করা উত্তম, শত মন্ত্র জপ করা মধ্যম এবং দশ মন্ত্র জপ করা কনিষ্ঠ বলা হয়। কুন্তীনন্দন ! গায়ত্রী মন্ত্র সর্বপাপ বিনাশকারী, অতএব তুমি সর্বদা সেটি জপ করবে।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—ত্রিলোকীনাথ ! আপনি সর্বভূতের আত্মা। আপনি কোন্ কর্মের দ্বারা সন্তুষ্ট হন, দয়া করে বলুন।

ভগবান বললেন—মহারাজ ! কেউ যদি এক হাজার ভার গুগ্গুল ইত্যাদি সুগন্ধ দ্বারা আমার উপাসনা করে, নিরন্তর প্রণাম জানায়, নিয়ত পূজা-অর্চনা করে এবং নানা বেদ ইত্যাদির দ্বারা আমার স্তব-স্তুতি করে, কিন্তু যদি ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করতে না পারে, তবে আমি তার ওপর প্রসন্ন হই না। ব্রাহ্মণের পূজা করলে যে আমাকেই পূজা করা হয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই, তাই ব্রাহ্মণকে কটুকথা শোনালে, তার লক্ষ্য আমিই হয়ে থাকি। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের পূজা করে, তার পরমগতি আমাতেই হয় ; কারণ পৃথিবীতে ব্রাহ্মণদের রূপে আমিই নিবাস করি। যে বুদ্ধিমান পুরুষ আমাতে মন নিবিষ্ট করে ব্রাহ্মণদের পূজা করে, তাকে আমি নিজেরই স্বরূপ বলে মনে করি। ব্রাহ্মণ যদি কুরূপ-কালা-বোবা-দরিদ্র বা রোগী হন তাহলেও বিদ্বান ব্যক্তির তাঁকে অপমান করা উচিত নয়। কারণ তাঁরা সকলেই আমার স্বরূপ। আসমুদ্র পৃথিবীতে যত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁরা সকলেই আমার স্বরূপ। তাঁদের পূজা করলে আমাকেই পূজা করা হয়। বহু অজ্ঞান ব্যক্তি জানে না যে আমি এই পৃথিবীতে ব্রাহ্মণরূপে বাস করি। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদের অপমান করে, তাঁদের স্বধর্ম থেকে ভ্রষ্ট করে দেয়, দূত করে পাঠায় এবং তাঁদের সেবাগ্রহণ করে, সেই পাপীদের যমদূত ইচ্ছামতো শাস্তি দেন। যারা ব্রাহ্মণদের গালি দিয়ে, তাদের নিন্দা করে আনন্দিত হয়, তারা

যমলোকে গমন করে। যমরাজ তাদের নিষ্ঠুরভাবে শাস্তি প্রদান করেন। যেসব পাপী ব্রাহ্মণদের দিকে পাপপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়, ব্রাহ্মণদের ভক্তি করে না, বৈদিক মর্যাদা উল্লঙ্ঘন করে এবং সর্বদা ব্রাহ্মণদের দ্বেষ করে, তারা যমলোকে গেলেই যমরাজের নির্দেশে তাদের ভয়ানক অত্যাচার সহ্য করতে হয়। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদের প্রহার করে, তাদের শরীর থেকে রক্তপান ঘটায় অথবা তাদের খুন করে, সেই ব্যক্তি একুশ প্রকার নরকে তার ফল ভোগ করে। প্রথমে তাকে শূলে চড়ানো হয়, পরে মাথা নীচু করে আগুনে ঝলসানো হয়, এইভাবে হাজার বছর ধরে সে শাস্তিভোগ করে। সেই দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ পাপ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত রেহাই পায় না। সুতরাং ব্রাহ্মণদের প্রতি কখনো অমঙ্গলসূচক কথা বলা উচিত নয়, তাঁদের সঙ্গে রুক্ষ বা কঠোর কথা বলা এবং নির্দেশ অমান্য করা উচিত নয়। যারা ব্রাহ্মণকে ব্যঙ্গ করে বা গালি দেয়, তারা প্রকৃতপক্ষে আমাকেই গালি দেয়, উপহাস করে। যারা চন্দন, ধূপ-দীপাদির দ্বারা আমার কাষ্ঠময় মূর্তির পূজা করে, তাদের দ্বারা ভালোভাবে আমার পূজা হয় না ; কিন্তু ব্রাহ্মণের পূজা করলে আমার যথাযথ পূজা হয়। ব্রাহ্মণদের কৃপাতেই আমি এই পৃথিবী ধারণ করে আছি। ব্রাহ্মণদের অনুগ্রহেই আমি অসুরদের ওপর বিজয় লাভ করেছি। ব্রাহ্মণদের প্রসাদেই আমার মধ্যে দাক্ষিণ্য ইত্যাদি গুণ অবস্থিত আছে এবং ব্রাহ্মণদের দয়াতেই আমাকে কেউ পরাজিত করতে পারে না।

যমলোকের পথের কষ্ট এবং তার থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—কেশব ! আপনি সর্বজ্ঞ, মনুষ্যলোক ও যমলোকের মধ্যে দূরত্ব কতটা, দয়া করে বলুন। যমলোক কেমন, কত বড় এবং কোথায় ? মানুষ কোন্ উপায়ে যমলোকের যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভ করে ? জীব যখন পাঞ্চভৌতিক শরীর থেকে পৃথক হয়ে অস্থি-মাংসরহিত হয়, সেইসময় সে সুখ-দুঃখ কীভাবে অনুভব করে ? দেবতা ও ব্রাহ্মণদের পূজা করে যেসব ধর্মপরায়ণ মানুষ, তাদের স্বর্গযাত্রা কীভাবে হয় ? পাপী ব্যক্তিরা কীভাবে প্রেতলোকে গমন করে ? যমলোকে যাওয়ার সময় জীবের রূপ-রং কেমন হয় ? তার দেহ কেমন আকারে থাকে ? কৃপা করে এসব বলুন।

ভগবান বললেন—রাজন্ ! তুমি আমার ভক্ত, তাই যা জিজ্ঞাসা করছ আমি তা যথার্থভাবে জানাচ্ছি। মনুষ্যলোক এবং যমলোকের মধ্যে ছিয়াশি হাজার যোজনের দূরত্ব। এই পথের মধ্যে না আছে বৃক্ষ ছায়া, না পুষ্করিণী, না ঝোপঝাড় এবং নেই কোনো জলাশয় বা কূপ। কোনো মণ্ডপ, গৃহ, পর্বত, নদী, গ্রাম, গুহা, আশ্রম, বাগান বা বিশ্রাম নেওয়ার স্থান নেই। জীবের যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, সে বেদনায় ছটফট করে, সেই সময় কারণ তত্ত্ব শরীর ত্যাগ করে, প্রাণ কণ্ঠ পর্যন্ত এসে যায় এবং জীবের প্রাণবায়ু শরীর থেকে বেরিয়ে যেতে চায়। ছয় কোষবিশিষ্ট শরীর থেকে বেরিয়ে বায়ুরূপধারী জীব এক অন্য অদৃশ্য শরীরে প্রবেশ করে। সেই শরীরের রূপ-রং-আকার আগের শরীরের মতোই হয়। তাতে প্রবেশ করলেও জীবকে কেউ দেখতে পায় না। দেহধারীদের অন্তরাত্মা জীব অষ্ট অঙ্গযুক্ত হয়ে যমলোকে যাত্রা করে। তাকে কাটলে, আগুনে পোড়ালে বা মারলে নষ্ট হয় না। যমরাজের আদেশে নানাপ্রকার ভয়ংকর রূপ ধারণকারী অত্যন্ত ক্রোধী ও দুর্ধর্ষ যমদূত প্রচণ্ড হাতিয়ার নিয়ে এসে জীবকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়। সেই সময় স্ত্রী-পুত্রের স্নেহ বন্ধনে আবদ্ধ জীব বিবশ হয়ে থাকে। যখন সে যেতে শুরু করে, তখন তার কৃত পাপ-পুণ্য তাকে অনুগমন করে এবং জীবের আত্মীয়স্বজন করুণ স্বরে বিলাপ করতে থাকে। জীব তখন সব কিছু ছেড়ে নিরপেক্ষভাবে চলতে থাকে। মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র সকলেই কাঁদতে থাকে, তাদের সঙ্গ ভ্রষ্ট হয়ে তারও চোখ দিয়ে জল পড়ে, তার অবস্থা তখন অত্যন্ত করুণ হয়, কিন্তু তার আত্মীয়রা তখন আর তাকে দেখতে পায় না। সে নিজ শরীর ত্যাগ করে বায়ুরূপে সেই পথের দিকে রওনা হয়, সে পথ অন্ধকারাচ্ছন্ন অতি ভয়ংকর এবং তার কোনো সীমা দেখা যায় না। সেই পথে চলা পাপীরা শেষপর্যন্ত বহু দুঃখভোগ করে। তাদের পক্ষে সেই পথ অত্যন্ত দুর্গম এবং দুস্তর। সেই পথে কারো সাহায্য পাওয়া যায় না, যার সময় উপস্থিত হয়, তাকে আত্মীয়-কুটুম্ব, ধন-দৌলত সব কিছু ছেড়ে ওই পথ ধরেই যেতে হয়। স্থাবর-জঙ্গম সকল প্রাণীকেই একদিন যমলোকের পথিক হতে হয়। যমরাজের অধীনে থাকা দেবতা, অসুর-মানুষ ইত্যাদি সকল জীব, তা

সে নারী হোক বা পুরুষ অথবা নপুংসক, জন্মে থাকুক বা গর্ভে—সকলকেই একদিন এই মহাপথ ধরে যাত্রা করতে হয়। সকাল-সন্ধ্যা অথবা রাত্রি, এই পথ সর্বসময় যাত্রার জন্য উন্মুক্ত থাকে। সে জীব স্বদেশে থাক বা বিদেশে, জঙ্গলে থাক বা পর্বতে, জলে থাক বা স্থলে, ঘরে থাক বা আকাশে, বসে থাক বা শুয়ে, জেগে থাক বা ঘুমিয়ে ; সব সময় সর্ব অবস্থায় তাকে ওই পথে প্রস্থান করতেই হয়। যমলোকের পথে কখনো ভীত হয়ে, কখনো পাগল অবস্থায়, কখনো ধাক্কা খেয়ে, কখনো বেদনার্ত হয়ে চিৎকার করে পথ চলতে হয়। যমদূতের ধমকে জীব ভীত-বিহ্বল হয়ে কাঁপতে থাকে, তাদের প্রহারে নানা পীড়া অনুভব হয়, তবুও এগিয়ে যেতে হয়। যে ব্যক্তি দান করে না, তাকে কণ্টকাকীর্ণ, তপ্ত বালুর ওপর দিয়ে চলতে হয়। ধর্মহীন ব্যক্তিকে জ্বলন্ত কাঠ, পাথর, লাঠির আঘাত সহ্য করে এগোতে হয়। যারা অন্য জীবকে হত্যা করে, তাদের এতো কষ্ট দেওয়া হয় যে তারা চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে যমপুরীর পথে চলতে থাকে। তাদের মধ্যে কারো হাত-পা ভেঙে দেওয়া হয়, কারো নাক-কান কেটে নেওয়া হয়, কারো গলা টিপে ধরা হয়। নানা অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে তাদের দুর্বল করে দিলে বন্য জন্তু এসে তাদের মাংস খুবলে খেতে থাকে। মাংসাশী ব্যক্তিদের নানা জন্তু এসে আঘাত করতে থাকে। যে ব্যক্তি বালক হত্যা করে, সেই পাপীকে তীক্ষ্ণ হুল বিশিষ্ট মাছি এসে চারদিক থেকে ঘিরে রক্তপান করতে থাকে। যে অন্য জীব ভক্ষণ করে, তাকে কুকুর ও রাক্ষস এসে কামড় দিয়ে খেতে থাকে। যে ব্যক্তি অপরের জিনিস চুরি করে, তাকে যমদূত পিশাচের ন্যায় উলঙ্গ করে নিয়ে যায়। যে দুরাত্মা পাপাচারী বলপূর্বক অন্যের গাভী, গৃহ অধিকার করে নেয়, যমলোকে যাবার সময় যমদূত তাকে জ্বলন্ত কাঠ ও অস্ত্রের দ্বারা মারতে মারতে নিয়ে যায়। তার সারা অঙ্গে কাটা-ঘা করে দেয়। যে ব্যক্তি নরকের ভয় না করে ব্রাহ্মণের অর্থ ছিনিয়ে নেয়, সে যখন যমপুরী যায়, তখন যমদূত তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে তার জিভ, নাক ও চোখ কেটে গায়ে দুর্গন্ধ বস্তু ঢেলে দেয়, শকুন এসে খুবলে খুবলে তার মাংস খায় এবং ক্রুদ্ধ চণ্ডালেরা এসে চারদিক থেকে তাকে আঘাত করতে থাকে। যমলোকে নিয়ে গিয়ে তাকে বিষ্ঠার কূপে কোটি বছর ধরে ফেলে রাখে। তারপর সময় সমাপ্ত হলে ইহলোকে শতকোটি জন্ম ধরে বিষ্ঠার কীট রূপে তাকে জন্মাতে হয়। যেসব ব্যক্তি ধনী হয়েও লোভ, দম্ভ এবং অসত্যের বশীভূত হয়ে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদের দান করে না, গলায় ফাঁস লাগিয়ে যমদূত তাদের তৃষ্ণার্ত-ক্ষুধার্ত অবস্থায় টানতে টানতে যমপুরীতে নিয়ে যায়। দান না করা জীবেদের কণ্ঠ, মুখ ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হলে, তারা যমদূতের কাছে বারংবার কাতর অনুরোধ করতে থাকে, 'প্রভু ! আমরা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছি, চলতে কষ্ট হচ্ছে ; কৃপা করে একটু খাবার ও জল দিন'। তারা কাতরভাবে চাইলেও, যমদূতেরা কিছু না দিয়ে সেই অবস্থায় টানতে টানতে তাদের যমরাজের কাছে পৌঁছে দেয়।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখে ভয়ংকর যম-যাতনার বর্ণনা শুনে মহারাজ যুধিষ্ঠির ভয়ে কম্পিত হলেন এবং অচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। পরে তিনি যখন ধীরে ধীরে চৈতন্য ফিরে পেলেন তখন ভগবান তাঁকে আশ্বস্ত করলেন। তিনি মুখহাত প্রক্ষালন করে পুনরায় ভগবানকে বললেন—'দেবেশ্বর ! যমলোকের পথের বিস্তারিত বর্ণনা শুনে আমি অত্যন্ত ভীত হয়েছিলাম। এখন কৃপা করে বলুন মানুষ কীভাবে এই বিকট পথ সুখে পার হতে পারবে ?'

ভগবান বললেন—পাণ্ডুনন্দন ! ইহজগতে যারা ধর্মময় জীবনযাপন করে, জীবহিংসা থেকে দূরে থেকে গুরুজনদের সেবায় ব্যাপৃত থাকে ; দেবতা, ব্রাহ্মণদের পূজা করে এবং ব্রাহ্মণদের নানাবস্তু দান করে, তারা সুখপূর্বক যমলোকে যায়। যারা ব্রাহ্মণদের, বিশেষত শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদের প্রসন্নতাসহ ভালোভাবে উত্তম আহার করায়, সেই মহাত্মা ব্যক্তি উত্তম বিমানে করে যমলোকে যাত্রা করে। যে ব্যক্তি প্রত্যহ নিষ্কপটভাবে সত্যভাষণ করে এবং ব্রাহ্মণ ও শ্রোত্রিয়দের ধেনুদান করে, সেও বিমানে করে যমালয়ে গমন করে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদের ছাতা, জুতা, শয্যা, বস্ত্র, অলংকার, আসন দান করে, সে স্বর্ণসজ্জিত ঘোড়া, বলদ অথবা হাতিতে করে ধর্মরাজের সুন্দর নগরে প্রবেশ করে। যে ব্যক্তি স্নানাদি দ্বারা পবিত্র হয়ে ব্রাহ্মণকে সযত্নে দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু শ্রদ্ধাসহ দান করে, সে চক্রবাক বাহিত বিমানে যমলোকে যাত্রা করে। সেই সময় নানা বাদ্য সহকারে গন্ধর্বগণ তার মনোরঞ্জন করতে করতে তার সঙ্গে গমন করেন। যে ব্যক্তি সুগন্ধি ফুল ও ফল দান করে, সে হংসযুক্ত বিমানে ধর্মরাজের নগরে যাত্রা করে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদের ঘৃতপক্ক সুখাদ্য দান করে,

সে বায়ুগতিসম্পন্ন বিমানে বসে যমপুরী যাত্রা করে। যে সমস্ত প্রাণীর জীবন রক্ষাকারী জলদান করে, সে অত্যন্ত তৃপ্ত হয়ে হংসবাহিত বিমানে সুখের সঙ্গে যমালয়ে যাত্রা করে। যে ব্যক্তি শান্তভাবে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে তিল অথবা তিলের ধেনু বা ঘৃতের ধেনু দান করে, সে সূর্যমণ্ডলের ন্যায় তেজস্বী বিমানে আরোহণ করে গন্ধর্বদের গীতবাদ্য শুনতে শুনতে যমলোকে গমন করে। যে ব্যক্তি ইহলোকে কূপ, পুষ্করিণী, সরোবর ইত্যাদি জলাশয় নির্মাণ করেছে, সে চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল এবং দিব্য ঘণ্টানিনাদযুক্ত বিমানে করে যমলোকে যায়; সেই সময় সেই মহাত্মাকে নিত্যতৃপ্ত এবং মহাকান্তিমানরূপে দেখা যায়। দিব্যলোকের পুরুষেরা তাকে পাখা এবং চামর দুলিয়ে বাতাস করেন। যে ব্যক্তি ইহলোকে অতি বিচিত্র, বিস্তৃত, মনোহর, সুন্দর ও দর্শনীয় দেবমন্দির তৈরি করেছে, সে সাদা মেঘের মতো সুন্দর এবং বায়ুবেগসম্পন্ন বিমানে যমলোকে যাত্রা করে, সেখানে গেলে সে যমরাজকে অত্যন্ত সুখী ও প্রসন্নরূপে দেখে এবং তাঁর দ্বারা সম্মানিত হয়ে দেবলোক নিবাসী হয়। যারা দেবতার উদ্দেশ্যে ভোগ তৈরি করে তৃষ্ণার্ত মানুষকে ঠান্ডা জল পান করায়, তারা সেই মহান পথে অত্যন্ত তৃপ্ত হয়ে সুখে গমন করে। পাদুকা ও জলদানকারী ব্যক্তি সেই পথ উত্তম রথে, স্বর্ণ সিঁড়িতে পা রেখে সুখে পরিক্রমা করে। যারা বড় বড় বাগান তৈরি করে বৃক্ষরোপণ করে, সেখানে জলসিঞ্চন করে বাগান ফুল ও ফলে সুশোভিত করে, তারা দিব্যবাহনে করে বৃক্ষের ছায়ায় সুশোভিত পথে দিব্য পুরুষদের দ্বারা সম্মানিত হয়ে যমালয়ে গমন করে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদের ঘোড়া, বলদ অথবা হাতিযুক্ত রথ দান করে এবং যে ব্যক্তি সোনা-রূপা বা রত্ন দান করে, তারা স্বর্ণ-বিমানে করে যমপুরীতে গমন করে। ভূমিদানকারী ব্যক্তি সমস্ত কামনা তৃপ্ত হয়ে সূর্যের ন্যায় তেজস্বী বিমানে যমালয়ে যাত্রা করে। যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের ভক্তিপূর্বক সুগন্ধি পদার্থ বা পুষ্প প্রদান করে, সে সুগন্ধপূর্ণ সুন্দর বেশভূষা পরিধান করে উত্তম কান্তিতে দেদীপ্যমান হয়ে বিচিত্র বিমানে চড়ে ধর্মরাজের নগরে যায়। দীপদানকারী ব্যক্তি সূর্যের ন্যায় তেজস্বী বিমানে দশদিক দেদীপ্যমান করে সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় কান্তিসম্পন্ন হয়ে যাত্রা করে। যে ব্যক্তি গৃহ এবং আশ্রয় দান করে, সে স্বর্ণযুক্ত ও প্রাতঃসূর্যের ন্যায় কান্তিযুক্ত গৃহাদিসহ ধর্মরাজের নগরে প্রবেশ করে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের চরণে দেবার তৈলাদি বস্তু, কেশ তৈল, পা ধোওয়ার জল এবং পান করার শরবৎ দেয়, সে ঘোড়ায় করে যমলোকে যায়। যে ব্যক্তি ক্লান্ত পরিশ্রান্ত ব্রাহ্মণকে আশ্রয় দান করে তাঁকে আরাম দেয়, সে চক্রবাক বাহিত বিমানে যাত্রা করে। যে গৃহাগত ব্রাহ্মণকে সাদরে আসন দিয়ে তাঁর পূজা করে, সে যমালয়ের পথ আনন্দের সঙ্গে পরিক্রমা করে। যে ব্যক্তি আমাকে দর্শন করে **'নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়'** বলে প্রণাম করে এবং ব্রতধারী পুরুষের ন্যায় সর্বদা নিজ মন ও ইন্দ্রিয়াদি সংযমে রাখে, সে সুখপূর্বক ধর্মরাজের স্থানে গমন করে। যে প্রতিদিন **'নমঃ সর্বসহাভ্যশ্চ'** বলে গাভীকে নমস্কার করে, সেও যমপুরীর পথে সুখে যাত্রা করে। যে ব্যক্তি নিত্য প্রাতঃকালে **'নমোঽস্তু বিপ্রদত্তায়ৈ'** বলে শয্যা ত্যাগ করে, সে সব কামনা দ্বারা তৃপ্ত হয়ে সর্বপ্রকারে সুসজ্জিত হয়ে দিব্য বিমানে করে সুখে যমলোকে যায়। যে ব্যক্তি দেবতা ও অতিথিদের তৃপ্ত করার পর স্বয়ং আহার করে (অথবা যে ব্যক্তি প্রভাত ও সন্ধ্যা ব্যতীত মধ্যকালে আর কিছু খায় না), দম্ভ ও অসত্য থেকে দূরে থাকে, সেও সারসযুক্ত বিমানে সুখে যমলোকে যাত্রা করে। যে ব্যক্তি দিন ও রাত্রে কেবল একবার আহার করে এবং দম্ভ অসত্য থেকে দূরে থাকে, সে হংসযুক্ত বিমানে যমলোকে যায়। যে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি চতুর্থপ্রহরে অর্থাৎ একদিন উপবাস করে দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় আহার করে সে ময়ূরযুক্ত বিমানে করে যমালয়ে যায়। যে আমার ভক্ত হয়ে ইন্দ্রিয়াদি বশে রেখে তীর্থ ভ্রমণ করে, সেই মহাত্মা সানন্দে বিমানে পথপরিক্রমা করে। যে শ্রেষ্ঠ দ্বিজ অধিক দক্ষিণাসহ যজ্ঞানুষ্ঠান করে সে হংস ও সারসযুক্ত বিমানে বসে যমলোকে যায়। যে ব্যক্তি অপরকে কষ্টপ্রদান না করে আত্মীয় পোষণ করে, সে সুবর্ণময় বিমানে যাত্রা করে। যে ব্যক্তি সর্বপ্রাণীতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন, প্রাণীদের অভয়প্রদান করে, ক্রোধ ও লোভরহিত এবং ইন্দ্রিয়াদি বশে রাখে, সে মহান কান্তিমান দেবতা ও গন্ধর্ব সেবিত হয়ে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল বিমানে বসে যমলোকে যাত্রা করে। যে প্রত্যহ ভগবানের পূজা, স্তুতি ও নমস্কার করে, সে সূর্যের ন্যায় তেজস্বী বিমানে আরোহিত হয়ে ধর্মরাজের নগরে যায়। সেখানে ধর্মরাজ স্বয়ং তাকে সুন্দর মালা অর্পণ করে তাঁর পূজা করেন।

জলদান, অন্নদান এবং অতিথি সৎকারের মাহাত্ম্য

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! যমপুরীর পথের বর্ণনা এবং সেখানে সুখপূর্বক যাওয়ার উপায় শুনে রাজা যুধিষ্ঠির মনে মনে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'দেবদেবেশ্বর ! আপনি দৈত্যবধকারী, ঋষি সমুদায় সর্বদা আপনারই স্তুতি করেন। আপনি ষড়ৈশ্বর্যযুক্ত, ভব-বন্ধন থেকে মুক্তিপ্রদানকারী, শ্রীসম্পন্ন এবং সহস্র সূর্যের ন্যায় তেজস্বী। আপনার থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি হয়েছে। আপনি ধর্মজ্ঞাতা এবং ধর্মের প্রবর্তক। শান্তস্বরূপ অচ্যুত ! আমাকে সর্বপ্রকার দানের ফলের কথা বলুন। দানের প্রকারভেদ কী এবং কীভাবে ব্রাহ্মণকে দান করা উচিত ? কী প্রকার তপের অনুষ্ঠান করলে কোথায় তার ফল লাভ করা যায় ?'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—রাজন্ ! মন দিয়ে শোনো—সর্বপ্রকার দানের ফল পরম পবিত্র, উত্তম এবং পাপনাশকারী হয়ে থাকে। একদিনের জন্যও যদি গাভীকে পিপাসা মেটানোর জল (যা নিজেই মাটি খুঁড়ে বার করা হয়েছে) দান করা যায়, তাহলে পূর্বতন সাতপুরুষ উদ্ধার লাভ করে। জলকে প্রাণীদের জীবন বলা হয়, জলদান করলে জীবেরা তৃপ্তি লাভ করে। জলের গুণ দিব্য এবং জলদানের ফল পরলোকেও পাওয়া যায়। যমলোকে পুষ্পোদকী নামে এক পরম পবিত্র নদী আছে। সেটি জলদানকারী মানুষের সমস্ত কামনা পূর্ণ করে। তার জল সুস্বাদু এবং শীতল। জলদানকারীকে তা সর্বদা সুখী করে। পিপাসার্ত মানুষের পিপাসা অন্নের দ্বারা তৃপ্ত হয় না, তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের উচিত পিপাসার্তকে সর্বদা জলদান করা। সব প্রাণী জল থেকেই উৎপন্ন হয় এবং জলের দ্বারাই জীবন ধারণ করে। তাই জলদান সর্বশ্রেষ্ঠ দান। সর্বপ্রকার দান, তপ এবং যজ্ঞের দ্বারা যে উত্তম ফললাভ হয়, সেসব শুধুমাত্র জলদান করলেই যে পাওয়া যায়—এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যারা ব্রাহ্মণকে সুপক্ক অন্নদান করে, তারা প্রাণদান করে থাকে বলে জানবে ; তেজ, বল, রূপ, সত্ত্ব, বীর্য, ধৃতি, দ্যুতি, জ্ঞান, মেধা ও আয়ু—এই সবেরই আধার অন্ন। প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান—এই পাঁচটি প্রাণ অন্নের আধারে থেকেই দেহধারীদের ধারণ করে। সমস্ত বিদ্যালয় এবং পবিত্রকারী সকল যজ্ঞ অন্নের সাহায্যেই সম্পন্ন হয়। তাই অন্নকে সব থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। রুদ্রাদি সমস্ত দেবতা, পিতৃপুরুষ এবং অগ্নি অন্নদ্বারাই সন্তুষ্ট হন। প্রজাপতি প্রত্যেক কল্পে অন্নদ্বারাই সমস্ত প্রজা সৃষ্টি করেছেন। তাই অন্ন থেকে বড় আর কোনো দান নেই এবং হবেও না। ধর্ম-অর্থ-কাম চরিতার্থ হয় অন্ন থেকেই ; সুতরাং ইহলোকে বা পরলোকে অন্ন থেকে শ্রেষ্ঠ কোনো দান নেই। যক্ষ, রাক্ষস, গ্রহ, নাগ, ভূত এবং দানবও অন্নেই সন্তুষ্ট হয় ; তাই অন্নের মাহাত্ম্য সব থেকে বেশি। অপরের অন্নগ্রহণ করে যে ব্যক্তি, তার শুভ কর্মের এক ভাগ সে পেলেও তিন ভাগ পায় অন্নদাতা। তাই ব্রাহ্মণদের বিশেষভাবে অন্নদান করা উচিত। যে ব্যক্তি দম্ভ ও অসত্য পরিত্যাগ করে আমাতে পরম ভক্তি রেখে বাদ্যের ভেদাভেদ না করে দরিদ্র এবং শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে এক বছর ধরে অন্নদান করে, সে এক লাখ বছর ধরে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে দেবলোকে নিবাস করে এবং সেখানে ইচ্ছানুযায়ী রূপ ধারণ করে যথেচ্ছ বিচরণ করে। পরে পুণ্যক্ষয় হলে স্বর্গ থেকে মনুষ্যলোকে এসে ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি ছয় মাস অথবা বাৎসরিক শ্রাদ্ধ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিনের প্রথম ভিক্ষা দরিদ্র ব্রাহ্মণকে দেয়, সে এক সহস্র গো-দানের ফল লাভ করে। যে এক বৎসর ধরে প্রত্যহ অগ্রভিক্ষা বস্ত্রদ্বারা ঢেকে অযাচিতভাবে ব্রাহ্মণের গৃহে পৌঁছে দেয়, সে হাজার কপিলা গাভী দানের পুণ্যফল লাভ করে ইন্দ্রলোকে প্রতিষ্ঠা পায়। পাণ্ডুনন্দন ! দেশ-কাল অনুসারে প্রাপ্ত এবং পদব্রজে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত ব্রাহ্মণকে অন্নদান করা উচিত। যে ধনী হয়েও যাচককে অন্নদান করে না, সেই লোভী মানুষ কীট পরিবৃত কালসূত্র নামক নরকে পতিত হয়। লোভ ও মোহবশত বিবেক হারানো ব্যক্তি সেই ঘোর নরকে দশ হাজার বছর ধরে বহু ক্লেশ ভোগ করতে থাকে। পরে দীর্ঘকাল পরে সেই নরক থেকে মুক্তি পেয়ে মর্তলোকে দরিদ্র চণ্ডালরূপে সে জন্ম নেয়।

যে ব্যক্তি বহুপথ অতিক্রম করে দুর্বল এবং ক্ষুধা-পিপাসা ও পরিশ্রমে কাতর, যে বড় কষ্টে পথ চলে এবং অত্যন্ত অসহায়, এরূপ ব্রাহ্মণ যদি ধুলোভর্তি পায়ে গৃহে এসে অন্নভিক্ষা করে, তাহলে যত্নসহকারে তার আপ্যায়ন করা উচিত, কারণ সেই অতিথি স্বর্গের সোপান হয়। সেই ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হলে সমস্ত দেবতা সন্তুষ্ট হন। অতিথিকে পূজা করলে অগ্নিদেব যেমন প্রসন্ন হন, তাঁকে ফুল-চন্দন বা হবিষ্য দিয়ে পূজা করলে তিনি তেমন সন্তুষ্ট হন না। যা ব্রাহ্মণকে আহার করালে পাওয়া যায়, শ্রেষ্ঠ পুষ্করতীর্থে উপস্থিত হয়ে কপিলা গাভী দান করলেও সেই ফল পাওয়া

যায় না। ব্রাহ্মণের চরণোদকে প্লাবিত এই পৃথিবী যতদিন থাকে, ততদিন অন্নদাতার পিতৃপুরুষ পদ্মপাতায় জল পান করেন। দেবতার স্থান থেকে পত্র-পুষ্পাদি সরিয়ে পরিষ্কার করা, ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট বাসন ধোয়া, ক্লান্ত ব্রাহ্মণের সেবা করা, তাঁকে থাকার জন্য আশ্রয় ও শয্যাদান করা—এর এক একটি কাজের মহত্ত্ব গো-দানের থেকেও শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদের এরূপ সেবা করে, সে কখনো যমলোকে যায় না। রাজন্! ব্রাহ্মণ অতিথির সৎকার এবং ভক্তিপূর্বক সেবা করলে তেত্রিশ দেবতার সেবা করা হয়। পূর্বপরিচিত ব্যক্তি গৃহে এলে তাকে অভ্যাগত বলা হয় আর অপরিচিত ব্যক্তিকে অতিথি বলা হয়। দ্বিজদের এই উভয়কেই আপ্যায়ন করতে হয়। এ হল পঞ্চম বেদ—পুরাণের শ্রুতি। যে ব্যক্তি অতিথির সেবা করে, অন্ন-জল দান করে, তার দ্বারা আমারও পূজা হয়ে থাকে—এতে কোনো সন্দেহ নেই। সেই মানুষ শীঘ্রই সর্ব পাপ থেকে মুক্ত হয় এবং আমার কৃপায় চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল বিমানে বসে আমার পরম

ধামে পদার্পণ করে। ক্লান্ত অভ্যাগত যখন গৃহে আসেন, তখন সমস্ত দেবতা, পিতৃপুরুষ ও অগ্নি তাঁর সঙ্গে পদার্পণ করেন। সেই অভ্যাগতকে পূজা করলে, তাঁর সঙ্গে সমস্ত দেবতাও পূজিত হন আর অভ্যাগত নিরাশ হয়ে ফিরে গেলে দেবতা ও পিতৃপুরুষগণও নিরাশ হয়ে ফিরে যান, এর ফলস্বরূপ গৃহস্বামীর পিতৃপুরুষ পনেরো বছর উপবাসে থাকেন। সেই লোভী ব্যক্তি দেবতা, পিতৃপুরুষ এবং অগ্নি দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে পনেরো বছর রৌরব নামক নরকে পড়ে থাকে, সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে জগতে উচ্ছিষ্ট ভোগী হয়ে জন্মায়। যে ব্যক্তি বলিবৈশ্বদেব কর্মের সময় গৃহাগত অতিথির পূজা করে না সে চণ্ডাল হয়ে যায়। যে দেশ-কালানুযায়ী গৃহাগত ব্রাহ্মণকে আপ্যায়ন না করে, সে তখনই পতিত হয়। সেই ব্যক্তি মৃত্যুর পর এককোটি বছর রৌরব নরকে পড়ে থাকে ; পরে সময় হলে কুকুরজন্ম পেয়ে বারো বছর ক্ষুধা-তৃষ্ণার কষ্ট ভোগ করে। দেশ-কাল অনুসারে অন্নের আশায় যদি চণ্ডালও অতিথিরূপে আসে, তাহলে গৃহস্থের সর্বদা তাকেও সৎকার করা উচিত। যে ব্যক্তি লোভ ও মোহবশত বিচারশূন্য হয়ে তাকে সৎকার না করেই আহার করে নেয়, সে দশ বৎসর চণ্ডাল হয়ে জন্মায়। যে ব্যক্তি অতিথিকে নিরাশ করে নিজে সানন্দে ভোজন করতে বসে, সে জানে না যে সে বিষ্ঠার কূপে পতিত হবে। যে অতিথির সৎকার করে না—তার সাজ-সজ্জা, আহার-বিহার সবই ব্যর্থ। যে প্রত্যহ সর্বাঙ্গীণ বেদ অধ্যায় করে কিন্তু অতিথি-সেবা করে না, সে দ্বিজের জীবন বৃথা। যারা পাকযজ্ঞ, পঞ্চ মহাযজ্ঞ, সোমযাগ ইত্যাদির দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করে কিন্তু গৃহাগত অতিথিসৎকার করে না, সেই ব্যক্তিরা যশের আশায় যা কিছু দান করে, সেসবই ব্যর্থ হয়ে যায়। অতিথির আশা ব্যর্থ হলে মানুষের সমস্ত শুভকর্ম বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তাই শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে দেশ-কাল-পাত্র-শক্তি বিচার করে সাধ্যমতো অতিথি-সৎকার অবশ্যই করা উচিত। অতিথি গৃহে এলে বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত প্রসন্ন চিত্তে, হাসিমুখে অতিথিকে স্বাগত জানানো, আসন ও পা ধোওয়ার জল দিয়ে তার আপ্যায়ন করে পরে আহারের ব্যবস্থা করা। নিজ হিতৈষী, স্নেহের পাত্র, মূর্খ বা পণ্ডিত—যে কেউ বলিবৈশ্বদেবের পর গৃহে আসুক, সে স্বর্গের প্রেরিত অতিথি। কোনো ব্যক্তি যদি যজ্ঞের ফল লাভ করতে চায়, তাহলে তাকে ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর, দুঃখী ও দেশ-কাল অনুসারে প্রাপ্ত অতিথিকে অন্নদান করতে হয়। যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধে নিজের থেকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের বিধিবৎ আহার করানো উচিত। অন্ন মানুষের প্রাণ, অন্নদাতা প্রাণদাতা হয় ; তাই কল্যাণকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের অন্নদান করার বিশেষ আগ্রহ থাকা উচিত। যে ব্যক্তি ধর্মপথে ধন-উপার্জন পূর্বক আহারে ভেদাভেদ না করে এক বছর ধরে অতিথি সৎকার করে, তার সমস্ত পাপ নষ্ট হয়।

ভূমিদান, তিলদান এবং উত্তম ব্রাহ্মণের মহিমা

ভগবান বললেন—এবার আমি সব থেকে উত্তম ভূমি-দানের বর্ণনা করছি। ভূমিদানের থেকে বড় কোনো দান নেই এবং ভূমি কেড়ে নেওয়ার থেকে বড় কোনো পাপ নেই। অন্য দানগুলির পুণ্য সময় অতিক্রান্ত হলে ক্ষয় হয়ে যায় ; কিন্তু ভূমিদানের পুণ্য কখনো ক্ষয় হয় না। যেসব ব্যক্তি প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত অগ্নিষ্টোম ইত্যাদি যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদের যজ্ঞ করে, তারাও ভূমিদানের সমান উত্তম ফল পায় না। যে ব্যক্তি শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করে পুনরায় তাতে অধিকার কায়েম করে না, সর্বত্র তার দানের চর্চা হতে থাকে এবং যতদিন এই জগৎ থাকে, ততদিন সে স্বর্গলোকে বাস করে পুণ্যের ফল ভোগ করে। যে ব্যক্তি শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে কৃষিকার্যের জন্য ভূমিদান করে, তার পিতৃপুরুষ মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত তৃপ্ত থাকেন। ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করলে সকল দেবতা, সূর্য, শংকর এবং আমি—সকলেই প্রসন্ন হই। ভূমিদানের পুণ্যে পবিত্রচিত্ত দাতা নিঃসন্দেহে আমার পুণ্যধামে নিবাস করে। মানুষ জীবিকার অভাবে যে পাপ করে, তার জন্য গোকর্ণ-মাত্র ভূমিদান করলেও মুক্তিলাভ করে। একমাস ধরে উপবাস, কৃচ্ছ্রসাধন, চান্দ্রায়ণ ব্রত অনুষ্ঠান এবং সমস্ত তীর্থে স্নান করলে যে পুণ্য হয়, সেই সমস্ত পুণ্য গোকর্ণ-মাত্র ভূমিদান করলে পাওয়া যায়।

যুধিষ্ঠির বললেন—'দেবেশ্বর ! আপনাকে নমস্কার। কৃপা করে আমাকে গোকর্ণ-মাত্র ভূমির সঠিক পরিমাপ বলুন।'

ভগবান বললেন—রাজন্ ! পূর্ব থেকে পশ্চিম এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ চারদিকে ত্রিশ দণ্ড করে মাপলে যতটা জমি হয়, তাকেই গোকর্ণ-মাত্র ভূমি বলা হয়। যতটা জমিতে একশত গাভী তাদের গো-বৎসা নিয়ে সুখে থাকতে পারে, ততটা জমিকে গোকর্ণ বলে। এই ভূমিদানকারীর কাছে যমরাজের দূত আসতে পারে না ; মৃত্যুর দণ্ড, দারুণ কুম্ভীপাক, ভয়ানক বরুণ পাশ, রৌরব ইত্যাদি নরক, বৈতরণী নদী এবং কঠোর যম-যাতনাও তাকে কষ্ট দিতে পারে না। চিত্রগুপ্ত, কলি, কাল, কৃতান্ত, মৃত্যু এবং সাক্ষাৎ ভগবান যমও ভূমিদানকারীর পূজা করেন। রুদ্র, প্রজাপতি, ইন্দ্র, দেবতা, ঋষি এবং আমি স্বয়ং—সকলেই প্রসন্ন হয়ে ভূমিদাতার পূজা করি। যার আত্মীয়-কুটুম্বগণ জীবিকার অভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে, যার গৃহপালিত জন্তুগুলিও দুর্বল হয়ে গেছে এবং যে সর্বদা অতিথি-সৎকার করে, এরূপ ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করা উচিত, কারণ তা পরলোকের জন্য সঞ্চয়। যার আত্মীয়-পরিবার কষ্টে আছে—তেমন শ্রোত্রিয়, অগ্নিহোত্রী, ব্রতধারী এবং দরিদ্র ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করা উচিত। ধাত্রী যেমন তার দুধ পান করিয়ে পুত্রের লালন-পালন করে, দান করা ভূমিও তেমনই দাতার ওপর অনুগ্রহ করে। গাভী যেমন তার দুধ দিয়ে গোবৎস্যকে পালন করে, তেমনই সর্বগুণসম্পন্ন ভূমিদান দাতার কল্যাণ করে। জলসিঞ্চনের দ্বারা যেমন বীজ অঙ্কুরিত হয়, তেমনই ভূমিদাতার মনোরথও প্রতিদিন পূর্ণ হতে থাকে। সূর্যের তেজ যেমন সমস্ত অন্ধকার দূর করে, তেমনই ভূমিদান মানুষের সম্পূর্ণ পাপ নাশ করে। যে ব্যক্তি ভূমিদান করে, তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দশপুরুষ উদ্ধার লাভ করে। কিন্তু যে ব্যক্তি কারো জমি কেড়ে নেয় সে তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দশ পুরুষকে নরকে প্রেরণ করে। যে ভূমিদানের প্রতিজ্ঞা করে তা পালন করে না অথবা দিয়েও কেড়ে নেয়, তাকে বরুণের পাশে বেঁধে পূঁজ ও রক্তের কুণ্ডে ফেলে দেওয়া হয়। যে নিজের বা অপরের দান করা ভূমি কেড়ে নেয়, তার নরক থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনোই উপায় থাকে না, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের খেত কেড়ে নেয়, সে পূর্বের বারো পুরুষকে নরকে প্রেরণ করে এবং নিজেও কীট যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, তার কখনো মুক্তি হয় না। যে ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করে আবার তার দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করে, সে এক লক্ষ গো-হত্যার ফল ভোগ করে। তাকে এক হাজার দিব্য বর্ষ কুম্ভীপাক নরকে মাথা নীচু করে ঝুলিয়ে রাখা হয়। তারপর পাপ ক্ষয় হলে শত জন্ম ধরে কুকুরজন্ম ধারণ করতে হয়। দরিদ্র ব্রাহ্মণকে, শস্যশ্যামল জমি, যাতে চাষ করে ফসল লাগানো হয়েছে, তেমন খেতি জমি দেওয়া উচিত। অথবা যে জমির কাছে জলের সুবিধা থাকে, যা চাষের উপযোগী, তেমন জমি দান করা উচিত। এইভাবে প্রসন্ন চিত্তে যদি মানুষ দান করে, তাহলে সে প্রকৃত উত্তম ফল লাভ করে। বহু রাজা এইভাবে জমি দান করেছেন এবং অনেকে এখনও করছেন। ভূমি যখন যার অধিকারে থাকে, সেই সময় সেই ব্যক্তিই তা দান করতে পারে এবং তার ফলভোগ করতে পারে।

যার জীবিকার সংস্থান নেই এবং গাভীগুলি দুর্বল হয়ে

পড়েছে, তেমন দরিদ্র ব্রাহ্মণকে যে রুপো দান করে, সে স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়। পরে পুণ্যক্ষয় হলে ইহলোকে মহাপরাক্রমী রাজা হয়ে জন্মগ্রহণ করে। যে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে—বিশেষত দরিদ্রকে তিলের পর্বত দান করে, সে দশ হাজার বৃষোৎসর্গের পুণ্য লাভ করে নিষ্পাপ হয়ে যায়। তিলদানকারী মানুষ মহাযশ এবং ইচ্ছামতো রূপ ধারণ করার শক্তি লাভ করে সাত হাজার বছর পিতৃলোকে সুখ ও আনন্দ ভোগ করে। যে ব্যক্তি দরিদ্র ও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে তিলের গাভী দান করে, সে এক হাজার বছর ধরে গাভী দানের সুফল ভোগ করে। যে যতগুলি কুণ্ড (লৌহ কিংবা কাঠের তৈরি পাত্র বিশেষ যা চার আঙুল লম্বা-চওড়া এবং চার আঙুল গভীর হয়ে থাকে) তিলে পরিপূর্ণ করে তার দ্বারা গাভী নির্মাণ করে দান করে, সে তত কোটি বছর ধরে স্বর্গে বাস করে। তিল, গাভী, স্বর্ণ, অন্ন, ভূমি—এইসব পদার্থ ব্রাহ্মণকে দান করলে, তাদের আশীর্বাদ দাতাকে পরলোকে উত্তম পথের পথিক করে। সদাচার-সম্পন্ন, অগ্নিহোত্রী এবং লোভহীন ব্রাহ্মণকে সসম্মানে পূজা করলে, তা পরলোকে কাজ দেয়। যে ব্রাহ্মণ বেদের বিদ্বান, অগ্নিহোত্রপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, শূদ্রান্ন গ্রহণ করেন না এবং দরিদ্র, তাঁকে সযত্নে পূজা করা উচিত। যে প্রত্যহ তর্পণ করে, সর্বদা যজ্ঞোপবীত ধারণ করে, স্বাধ্যায়-পরায়ণ, ঋতুকালে নিজ পত্নীতে সমাগম করে এবং বিধিপূর্বক অগ্নিহোত্র করে, সেই ব্রাহ্মণ অপরকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। যে আমার ভক্ত, আমাতে অনুরক্ত, আমার ভজন-পরায়ণ এবং আমাকেই সব কর্মফল অর্পণ করে, সেই ব্রাহ্মণ অবশ্যই অপরকে সংসার-সমুদ্র থেকে পার করতে সক্ষম হয়।

বিবিধ প্রকার দানের মহিমা

যুধিষ্ঠির বললেন—মাধব ! আপনার মুখ থেকে এই ধর্মময় অমৃত শ্রবণ করে আমার তৃপ্তি হচ্ছে না। এবার অন্য প্রকার দান, যা আপনি এখনও বলেননি, তার বর্ণনা করুন এবং কৃপা করে তার ফলও বলুন।

ভগবান বললেন—রাজন্ ! গাড়ি টানা একটি বলদ দশটি গাভীর সমান। যে ব্যক্তি শ্রোত্রিয়, সদাচারী, দরিদ্র ব্রাহ্মণকে ভারী বোঝা বহনকারী এক জোড়া বলদ দান করে, সে এক হাজার গাভীদানের ফল লাভ করে। পাণ্ডুনন্দন ! দরিদ্রকেই দান করা উচিত, ধনীকে নয়। বর্ষার সুফল পুকুরেই দেখা যায়, সমুদ্রে নয়। যে ব্যক্তি বেদজ্ঞ ধনহীন ব্রাহ্মণকে শয্যা-আসন বিভূষিত, নানাবাসন-সামগ্রীযুক্ত, ধন-ধান্য অলংকৃত, দাস-দাসী-গো-ভূমি সংবলিত, পরিপূর্ণ আলোকিত গৃহ প্রদান করে, দেবতা, পিতৃপুরুষ, অগ্নি, ঋষিগণ প্রসন্ন হয়ে তাকে সূর্যের ন্যায় তেজঃপূর্ণ বিমান প্রদান করেন। সে সেই বিমানে আরোহণ করে, অনুপম শোভাসম্পন্ন হয়ে ব্রহ্মলোকে যাত্রা করে এবং মহাপ্রলয় পর্যন্ত সেখানে অত্যন্ত আনন্দে বিরাজ করে। যে ব্যক্তি ভক্তিসহ বস্ত্র, মালা ও চন্দন দিয়ে ব্রাহ্মণের পূজা করে এবং তাঁকে শয্যাদান করে, সে বেদমন্ত্রের দ্বারা চালিত সুন্দর বিমানে করে সপ্তর্ষিলোকে গমন করে এবং সেখানে ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণ দ্বারা পূজিত হয়। সেই লোকে ত্রিশ চতুর্যুগ দেবতাদের ন্যায় ক্রীড়া করার পর ইহলোকে বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি পথশ্রমে ক্লান্ত, দুর্বল ব্রাহ্মণকে সেবা করে এবং বিশ্রাম দেয়, তার সারা বছরের পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। সে সেই ব্রাহ্মণের পা ধুয়ে দিলে তার দশ বছরের পাপ দূর হয়। যদি তাঁর পদ-সেবা করে তাঁর পূজা করে, তবে তার বারো বছরের পাপ তখনই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি গৃহাগত ব্রাহ্মণকে স্বাগত জানিয়ে, আসন দিয়ে পূজা করে, সে দেবতাদের প্রিয় হয়। অতিথিকে স্বাগত জানালে অগ্নি, আসন দিলে ইন্দ্র এবং আবাহন করলে অতিথিদের ওপর প্রীতিসম্পন্ন পিতৃপুরুষগণ প্রসন্ন হন। এইভাবে অগ্নি, ইন্দ্র ও পিতৃপুরুষগণ প্রসন্ন হলে মানুষের সারা বছরের পাপ তখনই নষ্ট হয়ে যায়। যে মানুষ ব্রাহ্মণকে ঘোড়াদান করে, সে রত্নদ্বারা চিত্রিত বিমানে স্বর্গলোকে যায়। যে ব্যক্তি ফুল-ফল-পাতা সমন্বিত বৃক্ষকে বস্ত্র ও ভূষণে বিভূষিত করে চন্দন ও ফুল দিয়ে পূজা করে এবং বেদবেত্তা ব্রাহ্মণকে ভোজন করিয়ে দক্ষিণা-সহ সেই বৃক্ষ তাঁকে দান করে, সে সুবর্ণমণ্ডিত বিমানে জয়ধ্বনি শুনতে শুনতে ইন্দ্রলোকে গমন করে এবং সেখানে কল্পবৃক্ষ তার সমস্ত মনোবাসনা পূর্ণ করে। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক মন্দির নির্মাণ করে আমার মূর্তি স্থাপন করিয়ে, অন্যের দ্বারা অথবা নিজে

ভক্তি সহকারে পূজা করে, সে এক হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে আমার পরম ধামে যায় এবং সেখান থেকে কখনো তাকে আর ইহলোকে ফিরে আসতে হয় না। যে ব্যক্তি দেবমন্দিরে, ব্রাহ্মণের গৃহে, গোশালাতে এবং চৌরাস্তায় প্রদীপ জ্বালে, সে সুবর্ণময় বিমানে চতুর্দিক আলোকিত করে সূর্যলোকে গমন করে, সেইসময় দেবতারা তার অভ্যর্থনায় উপস্থিত থাকেন। সেই মহাতপস্বী ব্যক্তি কোটি কোটি বছর সূর্যলোকে যথেচ্ছ বিহার করে মর্তলোকে এসে বেদ-বেদাঙ্গ পারঙ্গম ব্রাহ্মণ হয়ে জন্ম-গ্রহণ করে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে কমণ্ডলু, পানপাত্র এবং মহার্ঘ জলপূর্ণপাত্র দান করে, সে সর্বদা তৃপ্ত থাকে। সেই ব্যক্তি সর্বপ্রকার সুগন্ধবস্তু সুলভে প্রাপ্ত হয় এবং তার মন ও ইন্দ্রিয়াদি সর্বদা প্রসন্ন থাকে। শুধু তাই নয়, সে হংস ও সারসবাহিত সুন্দর বিমানে দিব্য গন্ধর্বদ্বারা সেবিত বরুণলোকে গমন করে। যে ব্যক্তি গ্রীষ্মের তিন মাস প্রাণীদের জীবনভূত জলদান করে, সে এক কোটি কপিলাগাভী দানের পুণ্যফল লাভ করে এবং পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় প্রকাশযুক্ত বিমানে আরোহণ করে ইন্দ্রভবনে যাত্রা করে। সেখানে দেবতা-গন্ধর্বের দ্বারা সেবিত হয়ে ত্রিশ কোটি যুগ ধরে নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগের পর ইহলোকে চার বেদের জ্ঞাতা ব্রাহ্মণরূপে জন্ম নেয়। মাথার তেল দান করলে মানুষ তেজস্বী, দর্শনীয়, সুন্দর, রূপবান, শূরবীর এবং পণ্ডিত হয়। বস্ত্রদানকারী ব্যক্তিও তেজস্বী, দর্শনীয়, সুন্দর, শ্রীসম্পন্ন ও মনোরম হয়। যে ব্যক্তি জুতা ও ছাতা দান করে সে মহাতেজসম্পন্ন হয়ে স্বর্ণনির্মিত সুন্দর রথে করে ইন্দ্রলোকে যায়। যে কাষ্ঠখড়ম দান করে, সে কাষ্ঠনির্মিত বিমানে শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ সেবিত হয়ে ধর্মরাজের রমণীয় নগরে প্রবেশ করে। দাঁতন দান করলে মানুষ মধুর ভাষী হয়, তার মুখ থেকে সুগন্ধ বার হয়, সে লক্ষ্মীবান ও বুদ্ধি-সৌভাগ্য সম্পন্ন হয়। যে ব্যক্তি বৈশাখ মাসে বিশাখা নক্ষত্রের দিনে অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক সূর্যদেবের প্রসন্নতার জন্য ব্রাহ্মণদের বিধিবৎ পূজা করে তিল ও গুড়ের নাড়ু দান করে, সে গোদানের ফললাভ করে এবং আমার লোকে প্রতিষ্ঠিত হয়।

যে ব্যক্তি অতিথি-কুটুম্বদের আহারের পর নিজে আহার করে, সর্বদা ব্রত পালন করে, সত্যভাষী, অক্রোধী, স্নানাদির দ্বারা পবিত্র, সে দিব্য বিমানে আরোহণ করে ইন্দ্রলোকে যাত্রা করে। যে এক বছর ধরে প্রত্যহ একবার আহার করে, ব্রহ্মচারী হয়ে থাকে, ক্রোধজয় করে এবং সত্য ও শৌচপালন করে, সেও দিব্য বিমানে করে ইন্দ্রলোকে পদার্পণ করে। যে ব্যক্তি এক বছর ধরে চতুর্থ প্রহর অর্থাৎ প্রতি দ্বিতীয় দিনে আহার করে, ব্রহ্মচর্য পালন করে এবং ইন্দ্রিয়াদি বশে রাখে, সে বিচিত্র পক্ষবিশিষ্ট ময়ূর বাহিত অদ্ভুত ধ্বজা শোভিত দিব্য বিমানে করে মহেন্দ্রলোকে গমন করে এবং সেখানে বারো কোটি বছর আনন্দ অনুভব করে। যে আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট করে এক মাস উপবাস করে এবং প্রত্যহ স্নান করে ইন্দ্রিয়-ক্রোধ-মন-বুদ্ধিকে বশে রাখে, এই নিয়ম পালন শেষ হওয়ার পর শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের ভোজন করিয়ে তাদের প্রসন্নচিত্তে দক্ষিণা দেয়, সেই মহাতেজস্বী ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মলোকে যায় এবং দিব্য ঋষিগণ দ্বারা সেবিত হয়ে শত কোটি বছর ধরে আনন্দ উপভোগ করে।

যে ব্যক্তি পবিত্র ও আমার সেবাপরায়ণ হয়ে আমার শ্রীবিগ্রহে মন নিবিষ্ট করে (আমার ধ্যান করে), চতুর্দশীর দিন রুদ্র বা দক্ষিণামূর্তিতে চিত্ত একাগ্র করে, সেই মহাতেজস্বী ব্যক্তি, সিদ্ধ, ব্রহ্মর্ষি ও দেবতা দ্বারা পূজিত হয়ে গন্ধর্ব ও ভূতাদির সংগীত শুনতে শুনতে আমাতে বা শংকরের মধ্যে লীন হয়ে যায়, তার আর জন্ম হয় না। যে ব্যক্তি গো-নারী-গুরু ও ব্রাহ্মণের রক্ষায় প্রাণদান করে, সে ইন্দ্রলোকে যায় এবং সেখানে ইচ্ছানুসারে বিচরণশীল স্বর্ণনির্মিত বিমানে থেকে এক মন্বন্তর দিব্য আনন্দ উপভোগ করে। দেবার প্রতিজ্ঞা করে না দিলে অথবা দান করে কেড়ে নিলে সারা জন্মের দানের পুণ্য নষ্ট হয়। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে দান না করা হলে, তার কোনো ফল লাভ হয় না। যেখানে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ আহার করে না, দেবতারাও সেখানে আহার গ্রহণ করেন না। বেদবেত্তা ব্রাহ্মণদের থেকে কোনো দেবতাই বড় নয় এবং তাঁদের আহার করাবার থেকে বড় কোনো পুণ্য নেই।

পঞ্চমহাযজ্ঞ, বিধিবৎ স্নান ও তার অঙ্গভূত কর্ম, ভগবানের প্রিয় পুষ্প ও ভগবৎ ভক্তদের বর্ণনা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—হৃষিকেশ ! দ্বিজাতিদের কীভাবে পঞ্চমহাযজ্ঞানুষ্ঠান করা উচিত ? সেই যজ্ঞগুলির নামও কৃপা করে বলুন।

ভগবান বললেন—যুধিষ্ঠির ! যে অনুষ্ঠান দ্বারা গৃহী মানুষদের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়, আমি তার বর্ণনা করছি ; শোনো। ঋভুযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ এবং পিতৃযজ্ঞ—এগুলিকে পঞ্চযজ্ঞ বলা হয়। এগুলির মধ্যে তর্পণকে 'ঋভুযজ্ঞ' বলা হয়, 'ব্রহ্মযজ্ঞ' স্বাধ্যায়ের নাম, সকল প্রাণীর জন্য অন্নদানকে 'ভূতযজ্ঞ' বলা হয়। অতিথি পূজাকে 'মনুষ্যযজ্ঞ' বলে এবং পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে যে শ্রাদ্ধাদি কর্ম করা হয়, তাকে বলা হয় 'পিতৃযজ্ঞ'। হুত, অহুত, প্রহুত, প্রাশিত ও বলিদান—এগুলিকে পাকযজ্ঞ বলা হয়। বৈশ্বদেব ইত্যাদি কর্মে যে দেবতাদের জন্য হোম করা হয়, বিদ্বান ব্যক্তিরা তাকে 'হুত' বলেন। দান করা বস্তুকে 'অহুত' বলে ; ব্রাহ্মণদের ভোজন করানোকে 'প্রহুত' বলে। প্রাণাগ্নিহোত্রের বিধিতে যে প্রাণগুলিকে পঞ্চগ্রাস অর্পণ করা হয়, তার সংজ্ঞা 'প্রাশিত' এবং গবাদি প্রাণীদের তৃপ্তির জন্য যে অন্ন দান করা হয়, তাকে বলে বলিদান। এই পাঁচ কর্মগুলিকে পাকযজ্ঞ বলা হয়। অনেক বিদ্বান এই পাকযজ্ঞগুলিকেই পঞ্চমহাযজ্ঞ বলেন। কিন্তু যাঁরা মহাযজ্ঞের যথার্থ স্বরূপ জানেন তাঁরা ব্রহ্মযজ্ঞাদিকেই পঞ্চমহাযজ্ঞ বলে মানেন। এই সবই সর্বপ্রকারের মহাযজ্ঞ বলে অভিহিত। গৃহে আগত ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণদের যথাশক্তি খাদ্য বস্তু দেওয়া উচিত, তাদের নিরাশ করে ফেরানো উচিত নয়। যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান না করেই আহার করে, আহারের নামে সে শুধু মলভক্ষণ করে। তাই বিদ্বান দ্বিজদের প্রত্যহ স্নান করে যজ্ঞানুষ্ঠান করা উচিত। তা না হলে ভোজনকারী দ্বিজ প্রায়শ্চিত্তের ভাগী হয়।

যুধিষ্ঠির বললেন—দেবদেবেশ্বর ! এবার আপনি আপনার এই ভক্তকে স্নান করার নিয়ম বলুন।

ভগবান বললেন—পাণ্ডুনন্দন ! যে নিয়মানুসারে স্নান করলে দ্বিজগণ সর্বপাপ হতে মুক্ত হয়, সেই পরম পবিত্র পাপনাশক বিধি পূর্ণরূপে শোনো। মাটি, গোবর, তিল, কুশ এবং ফুল ইত্যাদি শাস্ত্রোক্ত সামগ্রী নিয়ে জলের কাছে যাবে। শ্রেষ্ঠ দ্বিজের কর্তব্য হল নদীতে স্নান করার পর অন্য কোনো জলে স্নান না করা। বৃহৎ জলাশয় কাছে থাকলে ক্ষুদ্র জলাশয়ে স্নান করা উচিত নয়। জলাশয়ের কাছে শুদ্ধ ও পরিষ্কার স্থানে মাটি, গোবর ইত্যাদি সামগ্রী রেখে জলের বাইরে পা ধুয়ে দুবার আচমন করবে। তারপর জলাশয়কে প্রদক্ষিণ করে জলকে নমস্কার করবে। জলাশয়ের জলে হাত-পা ধোবে না, কারণ জল সমস্ত দেবতা এবং আমারও স্বরূপ। জলাশয়ের ধারটি পরিষ্কার করে নেবে, তারপর জলে নেমে শুধুমাত্র একবার ডুব দেবে, গায়ের ময়লা পরিষ্কার করবে না। পরে আবার আচমন করে দুহাত জোড় করে তিন বার জল পান করবে, তারপর পায়ে জল ছিটিয়ে মুখে জলস্পর্শ করবে। এরপর চোখ, কান, নাক ইত্যাদিতে জল দেবে, পরে দুহাত, হৃদয় ও নাভিতে জলস্পর্শ করাবে। এইভাবে প্রত্যেক অঙ্গে জল স্পর্শ করিয়ে তারপর মাথায় জল ছেটাবে। পরে 'আপঃ পুনন্তু' মন্ত্র পাঠ করে আবার আচমন করবে অথবা আচমনের সময় ওঁ-কার এবং ব্যাহৃতিয়োসহ 'সদসস্পতিম্' মন্ত্র পাঠ করবে। আচমনের পরে মাটি নিয়ে সেটি তিন ভাগ করবে এবং 'ইদং বিষ্ণু' মন্ত্র পাঠ করে শরীরের উপরিভাগ, মধ্যভাগ ও নিম্নভাগে প্রলেপ দেবে। তারপর বারুণসূক্ত দ্বারা জলকে নমস্কার করে স্নান করবে। যদি নদী হয়, তাহলে যে দিক থেকে জলধারা আসছে, সেইদিকে মুখ করে এবং অন্য জলাশয় হলে সূর্যের দিকে মুখ করে স্নান করবে। ওঁ-কার উচ্চারণপূর্বক আস্তে ডুব দেবে, জলে আলোড়ন সৃষ্টি করবে না। এরপর গোময় জলে গুলে সেটিও মাটির মতো শরীরের উপর-মধ্য ও নিম্নভাগে লাগাবে। সেই সময় প্রণব এবং গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ করবে। পরে আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট করে আচমন করে 'আপো হিষ্ঠা ময়ো' ইত্যাদি তিন মন্ত্রের দ্বারা, 'তরৎসমন্দীভিঃ' ইত্যাদি চার মন্ত্রের দ্বারা এবং গোসূক্ত, অশ্বসূক্ত, বৈষ্ণবসূক্ত, বারুণসূক্ত, সাবিত্রসূক্ত, ঐন্দ্রসূক্ত, বাসদৈবাসূক্ত এবং আমাতে সম্বন্ধিত অন্য সামমন্ত্রাদির দ্বারা শুদ্ধ জলে নিজেকে মার্জনা করবে। পরে জলে স্থিত হয়ে অঘমর্ষণসূক্ত জপ করবে অথবা প্রণব এবং গায়ত্রীমন্ত্র জপ করবে অথবা যতক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ থাকবে ততক্ষণ আমাকে স্মরণ করে প্রণব জপ করতে থাকবে।

এইভাবে স্নান করে জলাশয়ের বাইরে এসে ধৌত শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করবে। চাদর কোমরে বাঁধবে না। যারা বস্ত্রকে কোমরে দড়ির মতো বেঁধে বৈদিক কর্ম করে, তাদের কর্ম রাক্ষস-দানব-দৈত্যগণ সহর্ষে বিনাশ করে ; তাই কোমরে বস্ত্র বাঁধা উচিত নয়, একথা স্মরণে রাখা উচিত। বস্ত্র পরিধান করে হাত-পা মাটি দিয়ে মেখে ভালো করে ধুয়ে ফেলবে, তারপর গায়ত্রী মন্ত্র পড়ে আচমন করবে এবং পূর্ব বা উত্তর দিকে মুখ করে একাগ্রচিত্তে বেদাদি স্বাধ্যায় করবে। দ্বিজ জলে দাঁড়িয়ে জলেই আচমন করে শুদ্ধ হয়ে যায় এবং ভূমিতে দণ্ডায়মান দ্বিজ আচমনের দ্বারা ভূমিতে শুদ্ধি লাভ করে ; সুতরাং জলে বা স্থলে কোনো এক স্থানে স্থিত হয়ে দ্বিজের আত্মশুদ্ধি করার জন্য আচমন করা উচিত। এরপর সন্ধ্যা উপাসনা করার সময় হাতে কুশ নিয়ে পূর্বাভিমুখ হয়ে কুশাসনে বসবে এবং আমাতে মন একাগ্র করে প্রাণায়াম করবে। একাগ্রচিত্তে এক হাজার অথবা ন্যূনতম একশত বার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করবে। মন্দেহ নামক রাক্ষসদের বিনাশের উদ্দেশ্যে গায়ত্রী মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত জল নিয়ে সূর্যকে অর্ঘ্য প্রদান করবে। তারপর আচমন করে 'উদ্বর্গোঽসি' এই মন্ত্র দ্বারা প্রায়শ্চিত্তের জন্য জল নিক্ষেপ করবে। অতঃপর সুগন্ধ পুষ্প ও জল অঞ্জলিতে নিয়ে সূর্যকে অর্ঘ্য প্রদান করবে এবং আকাশমুদ্রা প্রদর্শন করবে। তারপর সূর্যের এক অক্ষর মন্ত্র দ্বাদশ বার জপ করে তার ষড়ক্ষরাদি মন্ত্র ছয় বার পুনরাবৃত্তি করবে। আকাশমুদ্রা ডানদিক দিয়ে ঘুরিয়ে নিজ মুখে বিলীন করবে। তারপর দুহাত তুলে সূর্যের দিকে তাকিয়ে একাগ্রচিত্তে তার মণ্ডলে স্থিত শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী তেজোমূর্তি নারায়ণের ধ্যান করবে। সেই সময় 'উদুত্যম্' 'চিত্রং দেবানাম্' 'তচ্চক্ষুঃ'—এই মন্ত্রগুলি, গায়ত্রী মন্ত্র ও আমার সঙ্গে সম্বন্ধিত সূক্তাদি জপ করে আমার সামমন্ত্র এবং পুরুষসূক্তও পাঠ করবে। তারপর 'হংসঃ শুচিষৎ' এই মন্ত্র পাঠ করে সূর্যের দিকে তাকাবে এবং প্রদক্ষিণ পূর্বক তাঁকে নমস্কার করবে।

এইভাবে সন্ধ্যা-উপাসনা সম্পন্ন হলে ক্রমশ ব্রহ্মার, আমার, শংকরের, প্রজাপতির, দেবতাদের ও দেবর্ষিদের, বেদ-বেদাঙ্গের, ইতিহাসের, যজ্ঞাদির, সমস্ত পুরাণের, অপ্সরাদের, ঋতু-কলা-কাষ্ঠারূপ সংবৎসর ও ভূত সমুদায়ের, ভূতাদির, নদীসমূহের, সমুদ্রাদির, পর্বতাদির, তার ওপর অবস্থিত দেবতাদের, ঔষধিসমূহের এবং বনস্পতিসমূহের জলদ্বারা তর্পণ করবে। তর্পণের সময় পৈতা বামস্কন্ধে রাখবে এবং ডান ও বাঁ হাত অঞ্জলি করে জল দেবার সময় উপরিউক্ত দেবতাদের প্রত্যেকের নাম করে 'তৃপ্যতাম্' পদটি উচ্চারণ করবে (যদি দুই বা অধিক দেবতাদের এক সঙ্গে জল দেওয়া হয় তাহলে দ্বিবচন, বহুবচন—'তৃপ্যেতাম্' এবং 'তৃপ্যন্তাম্' এই পদ উচ্চারণ করা উচিত)। বিদ্বান ব্যক্তিদের উচিত মন্ত্রদ্রষ্টা মরীচি ইত্যাদি ও নারদাদি ঋষিদের তর্পণকালে পৈতাটি গলায় মালার মতো করে একাগ্র চিত্তে তর্পণ করা। এরপর পৈতা ডান কাঁধে নিয়ে পূর্বোক্ত পিতৃসম্বন্ধীয় দেবতা এবং পিতৃপুরুষের তর্পণ করবে। কব্যবাট্ অগ্নি, সোম, বৈবস্বত, অর্যমা, অগ্নিষ্বাত্ত, সোমপা—এঁরা পিতৃ সম্বন্ধীয় দেবতা। এঁদের তিলসহ জলদ্বারা কুশের ওপর তর্পণ করবে এবং 'তৃপ্যতাম্' পদ উচ্চারণ করবে। তারপর পিতৃপুরুষদের তর্পণ করবে ; তাঁদের ক্রম হবে এই প্রকার—পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ এবং মাতা, পিতামহী এবং প্রপিতামহী। এছাড়া গুরু, আচার্য, পিতৃষসা, মাতৃষসা, মাতামহী, উপাধ্যায়, মিত্র, বন্ধু, শিষ্য, ঋত্বিক, জাতি-ভাই ইত্যাদির মধ্যে যারা মৃত, ঈর্ষা-দ্বেষ ত্যাগ করে তাদেরও তর্পণ করা কর্তব্য।

তর্পণের পর আচমন করে স্নানের সময় পরিধেয় বস্ত্র ধুয়ে নিংড়ে ফেলবে। সেই বস্ত্রের জলে কুলের মৃত সন্তানহীন পুরুষদের ভাগ থাকে। সেই জল তাঁদের স্নান ও তৃষ্ণা দূর করে। সুতরাং সেই জলের দ্বারা তাঁদের তর্পণ করা উচিত, শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা এই কথা বলে থাকেন। পূর্বোক্ত দেবতা ও পিতৃপুরুষদের তর্পণ না করে কাপড় ধোয়া উচিত নয়। যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত তর্পণের আগেই পরিধেয় বস্ত্র ধুয়ে ফেলে, সে ঋষি এবং দেবতাদের কষ্ট প্রদান করে। তখন তার পিতৃপুরুষ তাকে অভিশাপ দিয়ে ফিরে যান। তাই তর্পণের পর আচমন করে তবেই বস্ত্র ধৌত করতে হয়। তর্পণ ক্রিয়া সমাপ্ত হলে দুপায়ে মাটি লাগিয়ে তা ধুয়ে ফেলতে হয় এবং পুনরায় আচমন করে পবিত্র হয়ে কুশাসনে বসে, হাতে কুশ নিয়ে স্বাধ্যায় আরম্ভ করবে। প্রথমে বেদ পাঠ করে পরে তার অন্য অঙ্গাদি অধ্যয়ন করা হয়। নিজ শক্তি অনুসারে প্রতাহ যা অধ্যয়ন করা হয়, তাকে স্বাধ্যায় বলে। ঋক্‌বেদ, যজুর্বেদ এবং সামবেদ স্বাধ্যায় করবে। ইতিহাস ও পুরাণাদি অধ্যয়নও ত্যাগ করবে না। স্বাধ্যায় পূর্ণ করে দাঁড়িয়ে, দিক্‌সকল, তার দেবতাগণ, ব্রহ্মা, পৃথিবী, ঔষধি, বাণী, বাচস্পতি, নদীসকল ও আমাকে প্রণাম করবে। তারপর জল নিয়ে প্রণবযুক্ত

'নমোঽভ্যুদয়ঃ' মন্ত্র পাঠ করে পূর্ববৎ জলদেবতাকে নমস্কার করবে। তারপর ঘৃণি, সূর্য ও আদিত্যাদি নাম উচ্চারণ পূর্বক দুই হাত জোড় করে সূর্যদেবকে প্রণাম করবে এবং প্রণব মন্ত্র জপ করে একাগ্রচিত্তে তাঁকে দর্শন করবে। তারপর আমার প্রিয় পুষ্পের দ্বারা প্রতিদিন আমার পূজা করবে।

যুধিষ্ঠির বললেন—মাধব ! যে পুষ্প আপনার অত্যন্ত প্রিয় এবং যাতে আপনার নিবাস, সেসব আমাকে বর্ণনা করুন।

ভগবান বললেন—রাজন্ ! আমার যেসব ফুল প্রিয়, তার নাম বলছি ; শ্রবণ করো। কুমুদ, করবী, চণক, চম্পা, মালতী, জাতি-পুষ্প, নন্দ্যাবর্ত, নন্দিক, পলাশের ফুল এবং পাতা, দূর্বা, ভৃঙ্গ ও বনমালা—এই সব ফুল আমার বিশেষ প্রিয়। উৎপল ফুল হল সব ফুলের চেয়ে হাজার গুণে ভালো। উৎপলের থেকে পদ্ম, পদ্মের থেকে শতদল, শতদলের থেকে সহস্রদল, সহস্রদলের থেকে পুণ্ডরীক এবং হাজার পুণ্ডরীকের থেকে তুলসীকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। তুলসী থেকে শ্রেষ্ঠ বকফুল এবং তার থেকেও উত্তম সৌবর্ণ ; সৌবর্ণের ফুলের থেকে বেশি অন্য কোনো ফুলই আমার প্রিয় নয়। ফুল না পেলে তুলসী পাতার দ্বারা, পাতা না পাওয়া গেলে তার শাখা দিয়ে, শাখা না পেলে তুলসীর মূলের টুকরো দিয়ে আমার পূজা করবে। যদি তাও পাওয়া সম্ভব না হয়, তবে যেখানে তুলসীগাছ ছিল, তার মাটি দ্বারাই আমাকে ভক্তিসহকারে পূজা করবে। এবার যেসব ফুল ত্যজনীয় তার নাম বলছি, মন নিয়ে শোনো। কিঙ্কিণী, মুনি পুষ্প, ধুর্ধুর, পাটল, অতিমুক্তক, পুন্নাগ, নক্তমালিক, যৌধিক, ক্ষীরিকাপুষ্প, নির্গুণ্ডী, লাঙ্গুলী, জপা, অশোক, সেমলের ফুল, কঙ্কুভ, কোবিদার, বৈভীতক, পুরন্ধ্রক, কঙ্কক, কালক, অঙ্কোল, গিরিকর্ণী, নীলবর্ণ ফুল, পাখনা যুক্ত ফুল—এই সব ফুল ত্যাগ করা উচিত। আখ এবং আখের পাতার ওপর রাখা ফুলও বর্জনীয়। নিমফুলও পরিত্যাগ করা উচিত। এছাড়া যেগুলি নিষেধ করা হয়নি, তেমন শ্বেতবর্ণ ফুল, সুগন্ধযুক্ত, তা দিয়ে ভক্তের আমার পূজা করা উচিত।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—মাধব ! আপনার ভক্ত কীরূপ হয় এবং তাদের নিয়ম কেমন—কৃপা করে তা বলুন ; কারণ আমিও আপনার চরণে ভক্তি রাখি।

ভগবান বললেন—রাজন্ ! যে ব্যক্তি অন্য কোনো দিকে আকৃষ্ট না হয়ে শুধু আমারই শরণ নিয়েছে এবং আমার ভক্তগণের সঙ্গে প্রীতি-সম্পর্ক রাখে, তাদেরই আমার ভক্ত বলা হয়। যা যশ ও স্বর্গপ্রদানকারী এবং আমার বিশেষ প্রিয়, আমার ভক্তেরা এরূপ ব্রতই পালন করে। ভক্ত-পুরুষের জলে সাঁতার কাটার সময় একবস্ত্র ছাড়া দ্বিতীয় বস্ত্র ধারণ করা উচিত নয়। সুস্থ থাকলে দিবসে নিদ্রা যাওয়া উচিত নয়। মধু ও মাংস ত্যাগ করা উচিত এবং পথে ব্রাহ্মণ, গাভী, পীপল ও অগ্নি দেখলে, তা প্রদক্ষিণ করে যাওয়া উচিত। বৃষ্টিপাতের সময় দৌড়তে নেই, শুধু লবণ খাওয়া উচিত নয়। গাভীকে প্রত্যহ খাদ্য অর্পণ করবে, অন্নের সঙ্গে টক দ্রব্য খাবে না ; অন্যের ঘর থেকে তুলে আনা খাবার, বাসি অন্ন এবং ভগবানকে ভোগ না দেওয়া পদার্থ ত্যাগ করবে। কষ্টে পড়লেও ব্রাহ্মণ ও দেবতার নিন্দা করবে না। চতুর্বেদী বিদ্বান, ক্রিয়াপরায়ণ এবং বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণের দেহেও ছয়টি বৃষল বাস করে। ক্ষত্রিয়ের দেহে সাত, বৈশ্যের দেহ আট ও শূদ্রের দেহে একুশ বৃষলের নিবাস বলে মানা হয়। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মহামোহ—এই ছটি বৃষল ব্রাহ্মণ শরীরে স্থিত বলা হয়। গর্ব, স্তম্ভ (জড়ত্ব), অহংকার, ঈর্ষা, দ্রোহ, পারুষ্য (কঠোর ভাষা বলা) এবং ক্রূরতা—ক্ষত্রিয় শরীরে এই সাতটি বৃষল বাস করে। তীক্ষ্ণতা, কপটতা, মায়া, শঠতা, দম্ভ, সারল্যের অভাব, পরনিন্দা, অসত্যভাষণ—এই আটটি বৈশ্য দেহের বৃষল। তৃষ্ণা, খাওয়ার ইচ্ছা, অসময়ে নিদ্রা, আলস্য, নির্দয়তা, ক্রূরতা, মানসিক চিন্তা, বিষাদ, প্রমাদ, অধৈর্য, ভয়, অস্থিরতা, জড়ত্ব, পাপ, ক্রোধ, আশা, অশ্রদ্ধা, অনবস্থা, নিরঙ্কুশতা, অপবিত্রতা এবং মলিনতা—শূদ্রের দেহে এই একুশটি বৃষল থাকে। এই সব বৃষল যার ভেতর দেখা যায় না, তাকেই প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্মণ বলা হয়। সুতরাং ব্রাহ্মণ যদি আমার প্রিয় হতে চায়, তবে তাকে সাত্ত্বিক, পবিত্র ও ক্রোধহীন হয়ে সর্বদা আমার পূজা করা উচিত। যার জিহ্বা চঞ্চল নয়, যে ধৈর্য ধারণ করে থাকে এবং যে চার হাত সামনে দৃষ্টি রেখে চলে, যে নিজ চঞ্চল মন ও বাণী বশ করে ভয় থেকে মুক্তিলাভ করেছে, তাকে আমার ভক্ত বলা হয়। এরূপ অধ্যাত্ম জ্ঞানযুক্ত জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে তৃপ্তি সহকারে যার গৃহে আহার করেন, তার পিতৃপুরুষ সেই ভোজনে পূর্ণ তৃপ্ত হন। ধর্মের জয় হয়, অধর্মের নয় ; সত্যের বিজয় হয়, অসত্যের নয় এবং ক্ষমার জয় হয়, ক্রোধের নয়। তাই ব্রাহ্মণের ক্ষমাশীল হওয়াই উচিত।

কপিলা গাভীর মাহাত্ম্য এবং তার দশ প্রকার বিভেদ

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্! দান ও তপস্যার পুণ্য-ফল শুনে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন—'মধুসূদন! ব্রহ্মা অগ্নিহোত্র সিদ্ধির জন্য পূর্বকালে যাকে উৎপন্ন করেছিলেন এবং যাকে সর্বদা পবিত্র বলে মানা হয়, সেই কপিলা গাভী ব্রাহ্মণদের কীভাবে দান করা উচিত? সেই পবিত্র লক্ষণযুক্ত গাভী কোন দিনে, কীভাবে ব্রাহ্মণকে দিতে হয়? ব্রহ্মা কত প্রকারের কপিলা গাভীর কথা বলেছেন? এইসব আমি আপনার কাছে সঠিকভাবে শুনতে চাই।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—পাণ্ডুনন্দন! এ বিষয় অত্যন্ত পবিত্র এবং পাপনাশক, এটি শ্রবণ করলে পাপীব্যক্তিও পাপমুক্ত হয়ে যায়; সুতরাং মন দিয়ে শোনো। পূর্বকালে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা অগ্নিহোত্র এবং ব্রাহ্মণদের জন্য সমস্ত তেজ সংগ্রহ করে কপিলা গাভী উৎপন্ন করেন। কপিলা গাভী পবিত্র বস্তুর মধ্যে সব থেকে বেশি পবিত্র, মঙ্গলজনক পদার্থের মধ্যে সর্বাধিক মঙ্গলকারিণী এবং পুণ্যাদিতে পরম পুণ্যস্বরূপা। এটি তপস্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ তপস্যা, ব্রতের মধ্যে উত্তম ব্রত, দানের শ্রেষ্ঠ দান এবং সকলের অক্ষয় কারণ। পৃথিবীতে যত পবিত্র তীর্থ ও মন্দির এবং জগতে যা কিছু পবিত্র ও রমণীয় বস্তু আছে, সেই সব থেকে শক্তি নিয়ে বিশ্ববিধাতা ব্রহ্মা জগতের উদ্ধারের জন্য কপিলা গাভীকে সৃষ্টি করেন। কপিলা সমস্ত শক্তির পুঞ্জ। সে অমৃতস্বরূপ, মেধা, শুদ্ধ, পবিত্রকারী এবং উত্তম। দ্বিজাতীয়দের উচিত সকাল ও সন্ধ্যায় কপিলা গাভীর দুধ-দই অথবা ঘৃতের দ্বারা অগ্নিহোত্র করা। যে ব্রাহ্মণ কপিলা গাভীর ঘৃত, দধি অথবা দুধের দ্বারা বিধিবৎ অগ্নিহোত্র করেন, ভক্তিপূর্বক অতিথি সেবা করেন, শূদ্রান্ন থেকে দূরে থাকেন এবং দম্ভ ও অসত্য পরিত্যাগ করেন, তিনি সূর্যের ন্যায় তেজস্বী বিমানে সূর্যমণ্ডলের মধ্য দিয়ে পরম উত্তম ব্রহ্মলোকে গমন করেন। সেখানে ব্রহ্মার দিব্যধামে ইচ্ছানুযায়ী রূপ ধারণ করে যথেচ্ছ বিচরণ করে এক কল্প পর্যন্ত আনন্দ উপভোগ করেন এবং ব্রহ্মাদ্বারা সর্বদা সম্মান লাভ করেন। কপিলা গাভী এইরূপ পরম পবিত্র ও অমৃতময় দুগ্ধপ্রদানকারী অরণী। পূর্বকালে ব্রহ্মা একে অগ্নির অভ্যন্তরে উৎপন্ন করেছিলেন।

যুধিষ্ঠির! ব্রহ্মার আদেশে কপিলার শিং-এর অগ্রভাগে সর্বদা সম্পূর্ণ তীর্থ অবস্থান করে। যে ব্যক্তি প্রভাতে উঠে কপিলা গাভীর শিং থেকে পড়া জলধারা নিজ মস্তকে ধারণ করে, সে সেই পুণ্য প্রভাবে পাপরহিত হয়ে যায়। অগ্নি যেমন তৃণকে পুড়িয়ে দেয়, তেমনই ওই জল মানুষের তিন জন্মের পাপ ভস্ম করে ফেলে। যে ব্যক্তি কপিলার মূত্র নিয়ে নিজ নেত্রাদিতে লাগায় বা তাতে স্নান করে, সে ওই পুণ্যে নিষ্পাপ হয়ে যায়; তার ত্রিশ জন্মের পাপ বিনষ্ট হয়। যে প্রাতঃকালে কপিলা গাভীকে ভক্তিসহ ঘাস অর্পণ করে, তার এক মাসের পাপ নাশ হয়। যে তাকে প্রাতে উঠে প্রদক্ষিণ করে তার সমগ্র পৃথিবী পরিক্রমা করা হয় এবং এক একটি পরিক্রমাতে দশ রাতের পাপ দূর হয়। যে ব্যক্তি কপিলা গাভীর পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করে শুদ্ধ হয়, সে গঙ্গা স্নানের সমান পুণ্যলাভ করে। সেই স্নানে শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তির দশরাতের পাপ বিনাশ হয়। যে ব্যক্তি স্নানাদির দ্বারা পবিত্র হয়ে কপিলা গাভীকে স্পর্শ করে, তার এক বৎসরের পাপ দূর হয়। কোনো ব্যক্তি যদি একহাজার গাভী দান করে এবং অন্যজন একটিমাত্র কপিলা গাভী দান করে, লোকপিতামহ ব্রহ্মা দুটিরই এক ফল বলে জানিয়েছেন। তেমনই কোনো ব্যক্তি যদি ভুলবশত একটি কপিলা গাভী হত্যা করে, তবে সে এক হাজার গো-হত্যা পাপের ভাগী হয়।

ব্রহ্মা দশপ্রকার কপিলা গাভীর দশপ্রকার কথা বলেছেন; তার বর্ণনা করছি, শোনো। প্রথম স্বর্ণকপিলা[১], দ্বিতীয় গৌরপিঙ্গলা[২], তৃতীয় আরক্ত পিঙ্গাক্ষী[৩], চতুর্থ গলপিঙ্গলা[৪], পঞ্চম রক্তবর্ণাভা[৫], ষষ্ঠ শ্বেতপিঙ্গলা[৬], সপ্তম রক্তপিঙ্গাক্ষী[৭], অষ্টম খুরপিঙ্গলা[৮], নবম পাটলা[৯] এবং দশম পুচ্ছপিঙ্গলা[১০]—এই দশপ্রকার কপিলা গাভীর কথা বলা হয়েছে, যারা সর্বদা মানুষকে উদ্ধার করে থাকে। এরা সকলে মঙ্গলময়ী, পবিত্র এবং পাপনাশকারিণী।গাড়ি টানা বলদেরও এইরূপ দশপ্রকার বিভেদ বলা হয়েছে। শুধু ব্রাহ্মণই যেন সেই বলদগুলিকে গাড়ি টানতে ব্যবহার করেন। অন্য বর্ণের মানুষের সেই টানাগাড়িতে ওঠা উচিত

---

[১]সোনার মতো হলুদবর্ণ বিশিষ্ট। [২]গৌর ও হলুদবর্ণ বিশিষ্ট। [৩]ঈষৎ লাল আভাযুক্ত হলুদ চোখ, [৪]যার গলার লোম ঈষৎ হলুদবর্ণ, [৫]যার সমস্ত দেহ হলুদবর্ণ। [৬]অল্প সাদা মিশ্রিত হলুদ রোমযুক্ত। [৭]কোমল হলুদ চক্ষু বিশিষ্ট। [৮]যার খুর হলুদ বর্ণের। [৯]যার দেহবর্ণ ঈষৎ লাল। [১০]যার পুচ্ছের লোম হলুদ বর্ণের।

নয়। গাড়িতে চড়ে সেই বলদকে লাঠি বা বেত দিয়ে আঘাত করা উচিত নয়, গলার আওয়াজে অথবা ছোট ডাল দিয়ে আঘাত করতে হয়। বলদ যখন ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও পরিশ্রমে কাতর থাকে, তখন তাকে বিশ্রাম দিতে হয়। বলদের যতক্ষণ খাওয়া না হয়, ততক্ষণ নিজের আহার করা উচিত নয়। তাকে জল ও আহার দিয়ে তবেই খাবে। সেবাকারী ব্যক্তিদের কাছে কপিলা গাভী মাতা ও বলদ পিতা। দিনের প্রথম ভাগে ভারবহনকারী বলদকে দিয়ে গাড়িবহন করা উচিত। দ্বিপ্রহরে তাকে বিশ্রাম দিতে হয়, দিনের শেষভাগে প্রয়োজন থাকলে তাকে দিয়ে কাজ করাবে। যদি জরুরি প্রয়োজন থাকে অথবা পথে বিপদের সম্ভাবনা থাকে, তবে বিশ্রামের সময় গাড়ি বহন করালে পাপ হয় না। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কাজ করালে তার ভ্রূণ-হত্যার সমান পাপ হয়। এবং সেই ব্যক্তি রৌরব নরকে পতিত হয়। যে ব্যক্তি মোহবশত বলদের দেহের রক্তপাত ঘটায়, সেই ব্যক্তি তার পাপের প্রভাবে নিঃসন্দেহে নরকে পতিত হয়। সে নরকে শত শত বৎসর থেকে ইহলোকে বলদজন্ম প্রাপ্ত হয়। তাই যারা এই জগৎ থেকে মুক্ত হতে চায়, তাদের কপিলা গাভী দান করা উচিত। যে শূদ্র লোভ বশে কপিলা গাভীকে গাড়িতে জোতে, সে তেত্রিশ কোটি দেবতা এবং তার পিতৃপুরুষদেরও সর্বদা কষ্ট দেয় এবং মহাপ্রলয় পর্যন্ত এক নরক থেকে অন্য নরকে ঘুরে বেড়ায়।

কপিলা জাতির বলদ পরিশ্রান্ত হয়ে যখন দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তখন সে তার কষ্টপ্রদানকারী ব্যক্তির কুলনাশ করে দেয়। তার শরীরে যত লোম থাকে তত বৎসর তার কষ্টপ্রদানকারী ব্যক্তি নরকে কষ্ট পেতে থাকে। সর্বপ্রকার যজ্ঞে দক্ষিণা প্রদানের জন্য কপিলা গাভী সৃষ্ট হয়েছে ; তাই দ্বিজাতীয়দের যজ্ঞে অবশ্যই কপিলা গাভী দান করা উচিত। যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্র হোমের জন্য তেজস্বী, ধনহীন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে যত্ন সহকারে কপিলা গাভী দান করে, সে শুদ্ধচিত্ত হয়ে আমার গোলোকধামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কপিলার দেহে যত লোম থাকে, দাতা তত হাজার বছর স্বর্গলোকে সম্মান লাভ করে। যে ব্যক্তি কপিলার শিং ও খুর সোনায় মুড়ে, বিষুবযোগে অথবা উত্তরায়ণ-দক্ষিণায়নের প্রারম্ভে দান করে, সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পায় এবং সেই পুণ্যপ্রভাবে আমার লোকে গমন করে। যে গাভীর শিং সোনা ও খুর রূপা মণ্ডিত, যে গাভী বস্ত্রও ফুলচন্দনে সুসজ্জিত, তাকে দান করার সময় কাংস্য নির্মিত দুগ্ধপাত্র ও গোবৎস্য সঙ্গে দেওয়া উচিত। আমার বিচারে স্বর্ণ পবিত্র বস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাই গাভীকে স্বর্ণভূষণে সজ্জিত করে দান করা উচিত। এইভাবে দান করলে দাতা তার সাত পূর্বপুরুষ এবং সাত পরবর্তী পুরুষকে অবশ্যই মুক্ত করে দেয়। এক হাজার অগ্নিষ্টোমের সমান এক বাজপেয় যজ্ঞ হয়, এক হাজার বাজপেয়র সমান এক অশ্বমেধ যজ্ঞ হয় এবং এক হাজার অশ্বমেধের সমান এক রাজসূয় যজ্ঞ হয়। যে ব্যক্তি শাস্ত্রোক্ত বিধিদ্বারা এক হাজার কপিলা গাভী দান করে, সে রাজসূয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়ে আমার পরমধামে প্রতিষ্ঠিত হয় ; তার আর ইহলোকে জন্ম নিতে হয় না। যে ব্যক্তি কপিলা গাভীকে স্বর্ণালংকারে সুসজ্জিত করে গোবৎসা সহ দান করে, সেই গাভী তার কাছে ওইসব গুণাদিযুক্ত কামধেনু রূপে উপস্থিত হয়। বায়ুচালিত নৌকা যেমন মানুষকে মহাসাগরে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করে, তেমনি দানপ্রদত্ত গাভী ঘোর পাপী মানুষকে অন্ধকারপূর্ণ নরকে পতন থেকে রক্ষা করে। পুত্র-পৌত্র প্রভৃতি সাতপুরুষকে সেই গাভী উদ্ধার করে। যতদিন পৃথিবী মানুষ ধারণ করে, ততদিন সেই দানপ্রদত্ত গাভী পরলোকে দাতাকে ধারণ করে রাখে। মন্ত্রের সঙ্গে প্রদত্ত ঔষধ প্রয়োগে যেমন মানুষের রোগ নাশ হয়, তেমনই কপিলা গাভী সুপাত্রকে দান করলে মানুষের সব পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়ে যায়। প্রজ্বলিত প্রদীপ যেমন গৃহের অন্ধকারকে দূর করে, তেমনই কপিলা গাভী দান করলে মানুষের সব পাপ দূর হয়ে যায়। যে ব্যক্তি প্রত্যহ অগ্নিহোত্র করেন, অতিথি সেবা করেন, শূদ্রান্ন থেকে তফাতে থাকেন, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী এবং স্বাধ্যায়পরায়ণ, তাঁকে গাভী দান করলে, সেই দান দাতাকে পরলোকে অবশ্যই উদ্ধার করে।

কপিলা গাভীর মাহাত্ম্য, অযোগ্য ব্রাহ্মণ, নরক ও স্বর্গে নিয়ে যাওয়া পাপ ও পুণ্যের বর্ণনা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির পরম পুণ্যময় কপিলা গাভীর উত্তম দানের বর্ণনা শুনে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন, তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পুনরায় প্রশ্ন করলেন—'দেবদেবেশ্বর ! কপিলা গাভী ব্রাহ্মণদের দান করার সময় সম্পূর্ণ অঙ্গে কীভাবে অবস্থান করেন ? আপনি যে দশপ্রকার কপিলা গাভীর কথা বলেছেন, তার মধ্যে কাকে কাকে পুণ্যময় বলে মানা হয় ? দেবতা এবং পিতৃপুরুষগণ তাদের ওপর কীপ্রকার অনুগ্রহ করেছিলেন ? সেই গাভীদের রং কীরূপ হয় ?—এসব জানার জন্য আমি উৎকণ্ঠিত হয়েছি।'

ভগবান বললেন—রাজন্ ! পরম পবিত্র, গোপনীয় এবং উত্তম ধর্মের বর্ণনা করছি, শোনো। গাভী যখন বৎস প্রসব করে, মুনিগণ সেটিকেই উত্তম দানের সময় বলে জানিয়েছেন। যতক্ষণ গো-বৎস মাটিতে ভূমিষ্ঠ না হয় অর্থাৎ গো-বৎসটি মাতৃগর্ভ থেকে পূর্ণরূপে বহির্গত না হওয়া পর্যন্ত সেই গাভীকে পৃথিবীর স্বরূপ বলে মনে করা হয়, তাই সেই অবস্থায় গো-দান করা সর্বোত্তম। প্রসবকালে বৎসসহ মাতার গায়ে যত লোম থাকে, তত হাজার বছর দাতা স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়। বৎসসহ কপিলা গাভীকে স্বর্ণালংকারে সজ্জিত করে তিলের সঙ্গে দান করা উচিত। যে এইরূপ দান করে, তার নদী-পর্বত-সমুদ্র-সহ সমস্ত পৃথিবী দান করা হয়, এই দান পৃথিবী দানের সমান। মানুষ এর দ্বারা সংসার-সমুদ্র পার হয়ে প্রজাপতি লোকে যায়। ব্রহ্মহত্যা, ভ্রূণহত্যা, গো-হত্যা, গুরুপত্নীগমন ইত্যাদি মহাপাপযুক্ত মানুষও উপরিউক্ত প্রকারে কপিলা গাভী দান করলে শুদ্ধ হয়ে যায়। যে ব্যক্তি প্রভাতে উঠে আমাতে ভক্তি রেখে এই পরম পুণ্যময় উত্তম কপিলা দানের মাহাত্ম্যপাঠ করে, তার পুণ্যফলের কথা শোনো। এই অধ্যায় পাঠকারী মানুষ রাত্রে মন-বাক্য-ক্রিয়ার দ্বারা কৃত সর্বপাপ হতে মুক্ত হয়। যে শ্রাদ্ধকালে এই অধ্যায় পাঠ করে ব্রাহ্মণকে আহার দিয়ে তৃপ্ত করে, তার পিতৃপুরুষ অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে অমৃত ভোজন করেন। যে ব্যক্তি আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট করে এই প্রসঙ্গ ভক্তিপূর্বক শোনে, তার এক রাতের সমস্ত পাপ তখনই নষ্ট হয়ে যায়।

এবার আমি কপিলা গাভীর সম্পর্কে বিশেষ কথা বলছি। আগে আমি তোমাকে দশ প্রকার কপিলা গাভীর কথা বলেছিলাম, তার মধ্যে চার প্রকার কপিলা অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ, পুণ্যপ্রদানকারী ও পাপনাশকারী। সুবর্ণকপিলা, রক্তাক্ষ-পিঙ্গলা, পিঙ্গলাক্ষী এবং পিঙ্গলপিঙ্গলা—এই চার প্রকার কপিলা শ্রেষ্ঠ, পবিত্র ও পাপদূরকারী। এদের দর্শন ও নমস্কার দ্বারা মানুষের পাপ বিনাশ হয়। এই পাপনাশিনী কপিলা গাভী যে গৃহে থাকে, সেখানে শ্রী, বিজয় ও কীর্তি নিত্য নিবাস করে। এর দুধে ভগবান শংকর, দধিতে সমস্ত দেবতা এবং ঘৃতে অগ্নিদেব তৃপ্ত হন। পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহকে একবার কপিলা গাভীর দুধ দিলে কোটি বৎসর তৃপ্ত থাকেন। কপিলা গাভীর ঘি, দুধ, দই অথবা ক্ষীর একবার যদি শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে দান করা হয়, তবে মানুষ সর্বপাপ হতে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় থেকে একদিন-একরাত উপবাস করে কপিলা গাভীর পঞ্চগব্য পান করে, আমাতে চিত্ত স্থির করে শুভ মুহূর্তে কপিলা গাভীর পঞ্চগব্যের আচমন করে তার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়ে যায়। যে ব্যক্তি বিষুবযোগে পৃথক পৃথক মন্ত্র পাঠ করে কপিলার পঞ্চগব্যে আমার বা শংকরের মূর্তিকে স্নান করায়, সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পায়। সে নিষ্পাপ এবং শুদ্ধচিত্ত হয়ে আকাশের শোভাবর্ধনকারী বিমানের দ্বারা আমার অথবা রুদ্রের লোকে গমন করে। পূর্বকালে ব্রহ্মা উত্তম বেদমন্ত্রের দ্বারা অগ্নিকুণ্ড থেকে সুবর্ণের ন্যায় কান্তিময়ী কপিলা গাভী উৎপন্ন করেছিলেন। সেই হোম-ধেনুর প্রভা বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। কপিলা উৎপন্ন হতেই রুদ্র আদি দেবতা, সিদ্ধ, ব্রহ্মর্ষি, বেদ, বেদাঙ্গ, যজ্ঞ, সমুদ্র, নদী, পর্বত, মেঘ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, যক্ষ এবং নাগ সেখানে উপস্থিত হলেন। তাকে দেখে সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হলেন এবং নানাপ্রকার মন্ত্র পাঠ করে তার স্তুতি করতে লাগলেন। সেই গাভীর শিং খুব বড় ছিল না, তার তিনটি চোখ ছিল, গো-বৎস্য তার সঙ্গেই ছিল এবং সেই কপিলা-বৎসটি দুগ্ধরূপ অমৃত দান করার জন্য অরণীর ন্যায় ছিল। সকল দেবতা হাতজোড় করে সেই গাভীকে প্রণাম জানালেন এবং চতুর্মুখ ব্রহ্মাকে বললেন—'প্রজাপতি ! বলুন আমরা আপনার কী নির্দেশ পালন করব ?'

দেবতারা এইরূপ প্রশ্ন করায় ব্রহ্মা বললেন—'আপনারা এই দুগ্ধ প্রদানকারী গাভীর প্রতি অনুগ্রহ করুন। এটি হোমের সিদ্ধির জন্য সৃষ্টি হয়েছে এবং এ নিজ হবিষ্যদ্বারা তিন অগ্নিকেই তৃপ্ত করবে। অগ্নিদেব যখন নিজে

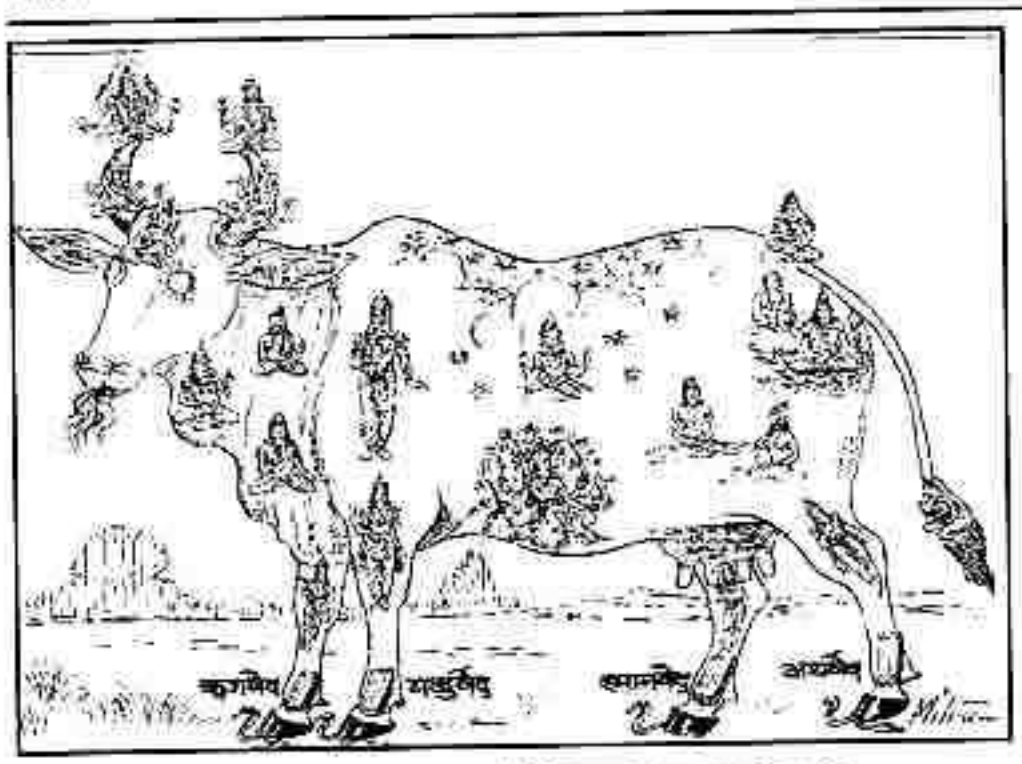

তৃপ্ত হবেন তখন আপনাদেরও তৃপ্তি হবে। তার দুগ্ধরূপ অমৃতে আপনাদের বল এবং পরাক্রম বৃদ্ধি পাবে, আপনারা ইচ্ছা করলেই দানবদের পরাজিত করতে পারবেন।' ব্রহ্মার কথা শুনে দেবতারা অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন, তাঁরা কপিলা গাভীকে বরদান করে বললেন—'দেবী ! ব্রহ্মা সমস্ত জগতের হিতের উদ্দেশ্যে তোমাকে সৃষ্টি করেছেন ; তাই তুমি পরম পবিত্র, শুদ্ধ এবং পাপনাশকারী হও। যে ব্যক্তি তোমাকে শ্রদ্ধা করবে অথবা যে নিজ হাতে তোমাকে স্পর্শ করবে, তোমাতে ভক্তিযুক্ত সেই ব্যক্তিদের এক বৎসরের পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হবে। যে তোমাকে দর্শন করে প্রণাম করবে, তার অনিচ্ছাকৃত, অজানতে অথবা অলক্ষ্যে ঘটিত পাপরাশি সেইভাবেই দূরীভূত হবে, যেভাবে সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূর হয়।'

কপিলা গাভীকে এই বরদান দিয়ে দেবতারা সেখান থেকে ফিরে গেলেন। কপিলা গাভী মানুষকে উদ্ধার করার জন্য জগতে বিচরণ করতে লাগল। তার দেহ থেকে আরও নয়টি কপিলা উৎপন্ন হল। তারা সকলেই জগতের হিতের জন্য পৃথিবীতে বিচরণ করতে লাগল। পরলোকে হিতকামী মানুষদের কপিলা গাভী অবশ্যই দান করা উচিত। অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণকে যখন কপিলা গাভী দান করা হয়, সেই সময় তার শিং-এর উপর অংশে বিষ্ণু ও ইন্দ্র নিবাস করেন। শিং-এর মূলে চন্দ্র এবং বজ্রধারী ইন্দ্র থাকেন। শিংএর মধ্যভাগে ব্রহ্মা এবং ললাটে ভগবান শংকর নিবাস করেন। দুই কানে অশ্বিনীকুমার, চক্ষুদ্বয়ে চন্দ্র ও সূর্য, দন্তগুলিতে মরুদ্‌গণ, জিহ্বাতে সরস্বতী, রোমকূপগুলিতে মুনিগণ, ত্বকে প্রজাপতি, নিঃশ্বাসে ষড়ঙ্গ, পদ ও ক্রমসহ চতুর্বেদ, নাসিকাছিদ্রে গন্ধ ও সুগন্ধ পুষ্প, নিম্নোষ্ঠে বসুগণ, মুখে অগ্নি, কক্ষে সাধ্য-দেবতা, গলায় পার্বতী, পিঠে নক্ষত্র, ককুদ স্থানে আকাশ, অপানে সর্বতীর্থ, মূত্রে সাক্ষাৎ গঙ্গা, গোবরে লক্ষ্মীদেবী, নাসিকাতে জ্যেষ্ঠাদেবী, নিতম্বে পিতৃপুরুষ, পুচ্ছে ভগবতী রমা, দুই পাঁজরে বিশ্বদেব, বুকে শক্তিধারী কার্তিক, হাঁটু, জানু ও উরুগুলিতে পঞ্চবায়ু, খুরের মধ্যে গন্ধর্ব এবং অগ্রভাগে সর্প নিবাস করে। চার সমুদ্র তার চারটি স্তন। রতি, মেধা, ক্ষমা, স্বাহা, শ্রদ্ধা, শান্তি, ধৃতি, স্মৃতি, কীর্তি, দীপ্তি, ক্রিয়া, কান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, সন্ততি, দিশা এবং প্রদিশা ইত্যাদি দেবীগণ সর্বদা কপিলা গাভীকে সেবা করে থাকেন। দেবতা, পিতৃপুরুষ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, লোক, দ্বীপ, সমুদ্র, গঙ্গা ইত্যাদি নদী এবং অঙ্গাদি ও যজ্ঞাদি-সহ সম্পূর্ণ বেদ, নানাপ্রকার মন্ত্রের দ্বারা কপিলা গাভীকে প্রসন্নতা পূর্বক স্তুতি করে থাকেন। তাঁরা বলেন—'সমস্ত দেবতাদ্বারা বন্দিতা পুণ্যময়ী কপিলা দেবী ! তোমাকে নমস্কার। ব্রহ্মা তোমাকে অগ্নিকুণ্ড থেকে উৎপন্ন করেছেন। তোমার প্রভা বিস্তৃত এবং শক্তি মহান। সমস্ত তীর্থ তোমারই স্বরূপ এবং তুমি সকলের মঙ্গলকারী। সমস্ত দেবতা আকাশে দণ্ডায়মান হয়ে বারংবার বলে থাকেন—'ওহো ! এই কপিলা, গৌরূপী রত্ন কত পবিত্র এবং উত্তম ! এ সব দুঃখ দূর করে দেয়। এ ধর্মদ্বারা উপার্জিত, শুদ্ধ, শ্রেষ্ঠ ও মহান ধন। কপিলা গাভী ইচ্ছা করলে সমস্ত ভূলোকবাসীকে ব্রহ্মলোকে নিয়ে যেতে সক্ষম। পৃথিবী, ঘোড়া, সোনা, গাভী, রূপা, তিল ও যব—এই পদার্থ প্রতাহ ব্রাহ্মণকে দান করলে দাতা মহা আনন্দ লাভ করে।'

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—দেবদেবেশ্বর ! যজ্ঞ এবং শ্রাদ্ধ করার উত্তম সময় কী ? তাতে কোন্ ব্রাহ্মণদের পূজা করা উচিত এবং কোন্ ব্রাহ্মণদের পরিত্যাগ করতে হয় ?

ভগবান বললেন—যুধিষ্ঠির ! দেবকর্ম (যজ্ঞ) পূর্বাহ্ণ কালে করা কর্তব্য। পিতৃকর্ম (শ্রাদ্ধ) অপরাহ্ণ কালে। অযোগ্য সময়ে করা দানকে রাজস মানা হয়। যে দানের কথা লোকের মধ্যে প্রচার করা হয়েছে, যার থেকে কোনো অসত্যবাদী মানুষ আহার করেছে, যা কুকুরে স্পর্শ করেছে, সেই অন্ন রাক্ষসের ভাগ বলে মনে করতে হবে। পতিত, জড় এবং উন্মত্ত ব্রাহ্মণদের দেবযজ্ঞে বা পিতৃযজ্ঞে আহ্বান

করা উচিত নয়। নপুংসক, অঙ্গহীন, কুষ্ঠরোগী, রাজযক্ষ্মা এবং মৃগী রোগীদেরও শ্রাদ্ধে স্বাগত জানানো উচিত নয়। বৈদ্য, পূজারি, কপট নিয়মধারী (পাষণ্ড) ও মদবিক্রয়কারী ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে আপ্যায়ন পাওয়ার অধিকারী নয়। নৃত্য-গীতকারী, বাকাবাগীশ, পালোয়ান, অগ্নিহোত্র বর্জনকারী, শববহনকারী, চোর, শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্মে সংলগ্ন, অপরিচিত ব্রাহ্মণ—এদেরও শ্রাদ্ধে আপ্যায়ন করা উচিত নয়। যার পিতার ঠিক নেই, যে পুত্রিকা-ধর্মানুসারে মাতামহের গৃহে থাকে, সেই ব্রাহ্মণও শ্রাদ্ধের অধিকারী নয়। যুদ্ধে নিযুক্ত, উপার্জনশীল ও পশুপক্ষী বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহকারী ব্রাহ্মণও শ্রাদ্ধে সৎকার পাওয়ার অধিকারী নয়।

কিন্তু যেসব ব্রাহ্মণ ব্রত আচরণ পরায়ণ, গুণবান, সর্বদা স্বাধ্যায়শীল, গায়ত্রী মন্ত্রের জ্ঞাতা এবং ক্রিয়ানিষ্ঠ, তাঁদের সৎকারের যোগ্য বলে মানা হয়। শ্রাদ্ধে সব থেকে দুর্লভ বস্তু হল সুযোগ্য ব্রাহ্মণ জোগাড় করা। যেসময় ব্রাহ্মণ-দধি-ঘৃত-কুশ-ফুল-উত্তম স্থান পাওয়া যায়, সেই সময়েই শ্রাদ্ধের নিমিত্ত দান করা উচিত। যে ব্রাহ্মণ সদাচারী, অল্প আয়েই জীবিকা নির্বাহ করেন, দুর্বল, তপস্বী, ভিক্ষায় দিন কাটান, তিনি যদি কিছু চাইতে আসেন, তাহলে তাঁকে প্রদত্ত দান মহান ফল দেয়। যুধিষ্ঠির ! এই সব কথা সম্পূর্ণভাবে জেনে যিনি ধনহীন এবং যিনি উপকার করেন না সেই বেদবেত্তা ব্রাহ্মণকে দান করবে। তুমি যদি তোমার দানকে অক্ষয় করতে চাও, তবে যে দান তোমার প্রিয় এবং যা বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ পছন্দ করেন, সেই দানই করো।

যুধিষ্ঠির ! এবারে যে ব্যক্তিরা নরকে যায় তাদের বর্ণনা শোনো। যে ব্রাহ্মণ গুরুকে রক্ষা করা বা নিজেকে রক্ষা করা ছাড়া অন্য সময়েও মিথ্যা কথা বলে, সে নরকে গমন করে। যারা পরস্ত্রী অপহরণ করে, পরনারীর সঙ্গে ব্যাভিচার করে এবং অন্য নারীদের পরপুরুষের সঙ্গে মিলন ঘটায়, তারাও নরকে পতিত হয়। নিন্দাকারী, চোর, অন্যের অর্থে জীবিকা নির্বাহকারী, বর্ণ ও আশ্রমের বিরুদ্ধাচরণকারী, পাষণ্ড, পাপাচারী, বেদ বিক্রয়কারী, বেদ নিন্দাকারী, বেদ লিখনকারী, বিষ ও দুধ বিক্রয়কারী মানুষও নরকগামী হয়। যে নরাধম ধনলোভে অথবা আসক্তিবশত চণ্ডালকেও দুধ প্রদান করে, পশুদের দমন করে, সেও নরকে যায়। যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ধনলোভে দান করে না, দীন ও অন্ধদের কৃপা করে না এবং নিজের সঙ্গে বহুকাল ধরে থাকা সহনশীল, জিতেন্দ্রিয়, দুর্বল ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি অশক্ত হয়ে পড়লে তাকে ত্যাগ করে, সে-ও নরকগামী হয়। যে ব্যক্তি শিশু, বৃদ্ধ এবং পরিশ্রান্ত মানুষদের খাবার না দিয়ে একাই খেতে থাকে, তাকেও নরকে যেতে হয়। প্রাচীনকালের ঋষিরা নরকগামী মানুষদের এইরূপ বর্ণনা দিয়েছেন।

এবার স্বর্গগামীদের বর্ণনা শোনো। যেসব ব্যক্তি দান, তপস্যা, সত্যভাষণ এবং ইন্দ্রিয়সংযমের দ্বারা নিরন্তর ধর্মাচরণে ব্যাপৃত থাকে, যারা উপাধ্যায়কে সেবা করে তাঁর কাছে থেকে বেদ পাঠ করে এবং প্রতিগ্রহে আসক্তি রাখে না, তারা স্বর্গগামী হয়। যারা মধু, মাংস, মদ থেকে নিবৃত্ত হয়ে উত্তম ব্রত পালন করে, পরনারী সংসর্গ থেকে দূরে থাকে, মাতাপিতার সেবা করে, ভাইদের প্রতি স্নেহশীল হয়, আহারের সময় বাইরে গিয়ে অতিথি সেবা করে, তাদের জন্য কখনো স্বর্গদ্বার বন্ধ থাকে না, তারা স্বর্গগামী হয়। যে ব্যক্তি দরিদ্র কন্যাদের ধনীদের সঙ্গে বিবাহ করায় অথবা নিজে ধনী হয়েও দরিদ্রের কন্যাকে বিবাহ করে এবং শ্রদ্ধাপূর্বক রস, বীজ ও ঔষধ দান করে, সে স্বর্গগামী হয়। যে ব্যক্তি পথে জিজ্ঞাসাকারী পথিককে ভালো-মন্দ, সুখদায়ক-দুঃখদায়ক পথের ঠিকমতো পরিচয় দেয় এবং যে ব্যক্তি অমাবস্যা, পূর্ণিমা, চতুর্দশী, অষ্টমী—এই সব তিথিতে, সন্ধিকালে, আর্দ্রা নক্ষত্রে স্ত্রী-সমাগম থেকে দূরে থাকে, সেই ব্যক্তিও স্বর্গগমন করে। রাজন্ ! এইরূপ হব্য-কব্যের বিধানের সময় বলা হয়েছে এবং স্বর্গ ও নরকে যাওয়ার ধর্ম-অধর্মের বর্ণনা করা হয়েছে। এখন আর কী শুনতে চাও ?

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—মাধব ! মানুষ ব্রাহ্মণের প্রতি হিংসা না করেই ব্রহ্মহত্যা পাপে কীভাবে লিপ্ত হয়, কৃপা করে সেই বিষয়টি ঠিকমতো বর্ণনা করুন।

ভগবান বললেন—রাজন্ ! যে ব্যক্তি জীবিকাবিহীন ব্রাহ্মণকে ডেকে পরে ভিক্ষা দিতে অস্বীকার করে, তাকে ব্রহ্মহত্যাকারী বলা হয়। যে দুষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি বেদবেত্তা ব্রাহ্মণের জীবিকা কেড়ে নেয়, সেও ব্রহ্মঘাতী হয়। যে ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয়ে কোনো আশ্রম, গৃহ অথবা গ্রামে আগুন লাগিয়ে দেয়, তৃষ্ণার্ত গাভীকে জলের কাছে যেতে বাধা দেয় এবং বৈদিক শ্রুতি বা ঋষি প্রণীত শাস্ত্রের ওপর অকারণ দোষারোপ করে, সেও ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। যে ব্যক্তি অন্ধ, পঙ্গু, বোবা মানুষের সর্বস্ব অপহরণ করে, যে

মূর্খতাবশত গুরুকে 'তুই' বলে সম্বোধন করে, হুংকার দিয়ে অপমান করে এবং তাঁর নির্দেশ লঙ্ঘন করে নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে, তাকেও ব্রহ্মঘাতী বলা হয়। যে ব্যক্তি ক্রোধ বা দ্বেষবশত অথবা কটুকথা শুনে ঋতুকালে স্ত্রীর কামবাসনা পূর্ণ করে না এবং যে দরিদ্রের সর্বস্ব অপহরণ করে, তাকেও ব্রহ্মহত্যাকারী বলে জানবে।

যুধিষ্ঠির বললেন—দেবেশ্বর ! যে দানকে সর্বদানের থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়, তার কথা বলুন এবং যে ব্রাহ্মণের অন্ন গ্রহণযোগ্য নয়, তার পরিচয় দিন।

ভগবান বললেন—রাজন্ ! ব্রহ্মাদি সকল দেবতাই অন্নের প্রশংসা করেন, সুতরাং অন্নের সমান কোনো দান হয়নি এবং হবে না ; কারণ অন্নই এই জগতে বলপ্রদানকারী এবং অন্নের আধারে প্রাণ বজায় থাকে। এবার আমি সেই সব লোকের পরিচয় জানাচ্ছি, যাদের অন্ন গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনে করা হয়—মন দিয়ে শোনো। যজ্ঞে দীক্ষিত, কদর্য, ক্রোধী, শঠ, শাপগ্রস্ত, নপুংসক, আহারে বিভেদকারী, বৈদ্য, দূত, উচ্ছিষ্টভোজী, বর্ণসংকর, এবং অশৌচে পড়া মানুষের অন্ন, শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ও শত্রুর অন্ন খাওয়া উচিত নয়। এইরূপ পতিত, নিন্দাকারী, যজ্ঞের ফল বিক্রয়কারী, নট, কাপড় বুননকারী, কৃতঘ্ন, নিষাদ, রঙ্গভূমিতে নাটক প্রদর্শনকারী, স্বর্ণকার, বীণাবাদক, শস্ত্র বিক্রেতা, সূত, মদ্য বিক্রেতা, ধোপা, স্ত্রৈণ, ক্রূর এবং মহিষচরানো ব্যক্তির অন্নও অগ্রাহ্য বলা হয়। যাদের মৃতাশৌচের দশ দিন কাটেনি, তাদের এবং বেশ্যাদের অন্নও খাওয়া উচিত নয়। কয়েদি, জুয়াড়ি, দ্যূতবিদ্যা জানা, পরিবিত্ত (বিবাহিত ছোট ভাইয়ের অবিবাহিত বড় ভাই) এবং পরিবেত্তা (অবিবাহিত বড় ভাইয়ের বিবাহিত ছোট ভাই), এদের অন্নও গ্রহণযোগ্য নয়। যার বড় বোন অবিবাহিত, সেই কন্যার সঙ্গে বিবাহকারী ব্রাহ্মণ এবং ভাইয়ের মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে উপভোগকারী পুরুষের এবং রাজার অন্নও ত্যাগ করা উচিত। রাজার অন্ন শক্তি, শূদ্রের অন্ন ব্রাহ্মণত্ব, স্বর্ণকারের অন্ন আয়ু এবং চামারের অন্ন সুযশ নাশ করে। বেশ্যার অন্নও নিন্দিত বলা হয়। ব্যাভিচারিণীর পতির অন্ন বীর্যের সমান মানা হয় ; তাই তা ত্যাগ করা উচিত। যে তার অন্নগ্রহণ করে সে তার চর্ম, রোম এবং অস্থি ভোজন করে। যদি না জেনে এদের অন্ন গ্রহণ করা হয়, তবে তিন দিন উপবাস করতে হয় ; কিন্তু জেনেশুনে একবারও এদের খাদ্য গ্রহণ করা দ্বিজকে প্রাজাপত্য-ব্রত আচরণ করা উচিত।

পাণ্ডুনন্দন ! এবার আমি দানের যথার্থ ফল বলছি, শোনো। জলদানকারী তৃপ্তি লাভ করে, অন্নদানকারী অক্ষয় সুখ লাভ করে, তিলদানকারী তার মনের মতো সন্তান এবং দীপদানকারী ব্যক্তি উত্তম নেত্র লাভ করে। ভূমিদানকারী ভূমি, স্বর্ণদানকারী দীর্ঘায়ু, গৃহদানকারী সুন্দর ভবন, রৌপ্যদানকারী উত্তম রূপ প্রাপ্ত হয়। বস্ত্রদানকারী চন্দ্রলোকে, অশ্বদানকারী অশ্বিনীকুমারদের লোকে যায়। গাড়িবহনকারী বলদ দান করলে লক্ষ্মীলাভ হয়, গো-দানকারী পুরুষ গোলোকের সুখ অনুভব করে। গাড়ি ও শয্যাদানকারী পুরুষ স্ত্রী এবং অভয়দানকারী ঐশ্বর্য লাভ করে। ধান্যদানকারী পুরুষ শাশ্বত সুখ পায় এবং বেদপ্রদানকারী পুরুষ পরব্রহ্ম স্বরূপ হয়। যে ব্যক্তি সোনা, ভূমি, গো, অশ্ব, বস্ত্র, ছাগ, শয্যা ও আসনাদি বস্তু সম্মানপূর্বক গ্রহণ করে এবং যে দাতা ন্যায়ানুসারে সম্মান সহকারে দান করে, তারা উভয়েই স্বর্গে যায় ; কিন্তু যারা এর বিপরীত আচরণ করে, তাদের দুজনকেই নরকে পতিত হতে হয়। বিদ্বান ব্যক্তি কখনো মিথ্যা বলবে না, তপস্যা করে অহংকার করবে না, কষ্টে পড়লেও ব্রাহ্মণদের অনাদর করবে না এবং দান করে প্রচার করবে না। মিথ্যা বললে যজ্ঞের, অহংকার করলে তপস্যার, ব্রাহ্মণের অপমান করলে আয়ু ও নিজ মুখে দানের কথা বললে সেসব বিনষ্ট হয়।

জীব একাকী জন্মায়, একাই মরে এবং একাই পাপ-পুণ্যের ফল ভোগ করে। বন্ধুবান্ধব মানুষের মৃত শরীরকে সৎকার করে মাটির ঢেলার মতো ফেলে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। সেই সময় শুধু ধর্মই (তার দ্বারা কৃতকর্ম) জীবকে অনুসরণ করে। মানুষের মন ভবিষ্যৎ কর্মের হিসাব করতে থাকে, তখন কাল তার বিনাশশীল দেহকে লক্ষ করে মৃদুহাস্য করে ; তাই ধর্মকে সহায়ক মনে করে সদা তার সংগ্রহতেই ব্যাপৃত থাকা উচিত। কারণ মানুষ ধর্মের সাহায্যে দুস্তর নরক পার হয়ে যায়। যাঁরা অধিক জলপূর্ণ বহু সরোবর, ধর্মশালা, কূপ ইত্যাদি নির্মাণ করেছেন এবং যাঁরা সর্বদা অন্নদান করেন ও মিষ্ট বাক্য বলেন, তাঁদের ওপর যমরাজের জোর চলে না।

ধর্ম ও শৌচের লক্ষণ, সন্ন্যাসী এবং অতিথি সৎকারের উপদেশ, শিষ্টাচার, দানের যোগ্য ব্রাহ্মণ ও অন্নদানের প্রশংসা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—জনার্দন ! মনীষী ব্যক্তিগণ ধর্মকে বহু প্রকারের এবং বহুপথ সম্পন্ন বলে থাকেন। বাস্তবে তার লক্ষণ কী তা কৃপা করে বলুন।

ভগবান বললেন—রাজন্ ! তুমি ধর্ম ও শৌচের বিধি ক্রমানুসারে সংক্ষেপে শোনো। অহিংসা, শৌচ, অক্রোধ, ক্রূরতার অভাব, দম, শম এবং সরলতা—ধর্মের এগুলি অমোঘ লক্ষণ। ব্রহ্মচর্য, তপস্যা, ক্ষমা, মদ্য-মাংস ত্যাগ, ধর্মমর্যাদার মধ্যে অবস্থান করা এবং মনকে বশে রাখা—এগুলি শৌচের (পবিত্রতার) লক্ষণ। মানুষের বাল্যকালে বিদ্যাধ্যয়ন করা কর্তব্য, যুবাবস্থায় বিবাহ করা এবং বৃদ্ধাবস্থায় বানপ্রস্থ গ্রহণ করা উচিত ; কিন্তু সর্বদা, সর্বাবস্থায় ধর্মাচরণ করা কর্তব্য। ব্রাহ্মণদের অপমান না করা, গুরুজনের নিন্দা না করা এবং সন্ন্যাসী মহাত্মাদের প্রতি অনুকূল আচরণ করা—এগুলিই সনাতন ধর্ম। সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণদের গুরু, ব্রাহ্মণ চার বর্ণের গুরু, পতি তার পত্নীর গুরু এবং রাজা সকলের গুরু। যদি সন্ন্যাসী এক রাতের জন্যও গৃহস্থের ঘরে অবস্থান করেন ; তবে জেনে-শুনে অথবা অজানতে করা সমস্ত পাপ তিনি নাশ করে দেন। সন্ন্যাসী এক দণ্ড ধারণ করুন কিংবা তিন দণ্ড, জটাজুট সমন্বিত হোন অথবা মুণ্ডিত মস্তক, গেরুয়া বসন ধারণ করুন বা না করুন, তাঁকে সর্বদা পূজা করা উচিত। যদি গৃহস্থ মানুষ সন্ন্যাসী বা অতিথির পূজা না করে, অথবা তাঁদের অপমান করে, তাহলে তাঁদের মনোবেদনা সেই গৃহস্থকে নরকে প্রেরণ করে। তাই যারা পরলোকে কল্যাণ কামনা করে, তাদের উচিত সমস্ত কর্ম আমায় অর্পণকারী আমার শরণাগত ভক্তদের ভক্তিভরে পূজা করা। ব্রাহ্মণের গায়ে হাত তুলবে না, গাভীকে মারবে না ; যারা এই দুইয়ের ওপর হাত তোলে, তাদের ভ্রূণহত্যার সমান পাপ হয়। অগ্নিতে ফুঁ দেবে না, আগুনে পা গরম করবে না, আগুনকে পা দিয়ে নেভাবে না এবং আগুনের দিকে পিঠ করবে না। দুই দিকে আগুন জ্বললে তার মাঝখান দিয়ে যাবে না। আগুনে কোনো অপবিত্র বস্তু দেবে না, উচ্ছিষ্ট বা অশৌচ অবস্থায় অগ্নি স্পর্শ করবে না। অগ্নি সর্বদেবতারূপ, সুতরাং শুদ্ধ হয়ে তাকে স্পর্শ করা উচিত। মল-মূত্রের বেগ অনুভব হলে বুদ্ধিমান মানুষের আগুন ছোঁওয়া উচিত নয় কারণ সে অবস্থায় সে অশুদ্ধ থাকে। আহার তৈরি করার জন্য অন্যের গৃহ থেকে আগুন আনা উচিত নয় ; কারণ সেই অগ্নিতে তৈরি করা অন্নের দ্বারা কোনো শুভকর্ম করলে তার অর্ধভাগ অগ্নিদানকারীর প্রাপ্য হয়। তাই নিজ গৃহের অগ্নি কখনো নেভাতে নেই। যদি অসাবধানে গৃহের আগুন নিভে যায়, তাহলে অরণী কাষ্ঠ মন্থন করে আগুন জ্বালাতে হয় অথবা কোনো শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের গৃহ থেকে তা চেয়ে আনতে হয়।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—জনার্দন ! যাঁদের দান করলে মহাফল প্রাপ্তি হয়, সেই সাধু ব্রাহ্মণেরা কেমন হয়ে থাকেন ?

ভগবান বললেন—রাজন্ ! যাঁরা ক্রোধ করেন না, সত্যবাদী, সর্বদা ধর্মে ব্যাপৃত, জিতেন্দ্রিয়, তাঁরাই সাধু ব্রাহ্মণ এবং তাঁদের দান করলে মহাফল প্রাপ্তি হয়। যাঁরা অভিমানশূন্য, সর্বংসহা, শাস্ত্রীয় অর্থ জ্ঞাতা, ইন্দ্রিয়জয়ী, সর্বপ্রাণীর হিতকারী, সকলের সঙ্গে মৈত্রী ভাবাপন্ন, নির্লোভ, পবিত্র, বিদ্বান, সত্যবাদী এবং স্বধর্মপরায়ণ এরূপ ব্রাহ্মণদের প্রদত্ত দান মহাফল-প্রাপ্তিকারী হয়। যে ব্যক্তি প্রতিদিন অঙ্গসহ চতুর্বেদ স্বাধ্যায় করেন এবং যিনি শূদ্রান্ন গ্রহণ করেননি, ঋষিগণ সেই ব্যক্তিকে দান করাকে উত্তম বলেন। যুধিষ্ঠির ! যদি শুদ্ধ বুদ্ধি, শাস্ত্রীয় জ্ঞান, সদাচার এবং উত্তম শীলযুক্ত একজন ব্রাহ্মণও দান গ্রহণ করেন, তাহলে তিনি দাতার সমস্ত কুল উদ্ধার করে দেন। এরূপ ব্রাহ্মণকে গাভী, ঘোড়া, অন্ন এবং ধন দান করা উচিত। সৎব্যক্তির দ্বারা সম্মানিত কোনো গুণবান ব্রাহ্মণের নাম শুনে তাঁকে ডেকে এনে সম্মান সহকারে তাঁর আপ্যায়ন ও পূজা করা উচিত।

যুধিষ্ঠির বললেন—দেবেশ্বর ! ধর্ম ও অধর্মের এই বিধি পিতামহ ভীষ্ম সবিস্তারে বর্ণনা করেছিলেন। আপনি তাঁর বক্তব্য সংক্ষেপ করে সারধর্ম কী সেটি বলুন।

ভগবান বললেন—রাজন্ ! চরাচর জগৎ অন্নের আধারেই অবস্থিত। অন্ন থেকেই প্রাণের উৎপত্তি। একথা প্রত্যক্ষ, তাই কল্যাণাকাঙ্ক্ষী মানুষের দেশ-কাল বিচার করে ভিক্ষুককে অবশ্যই অন্নদান করা উচিত। ব্রাহ্মণ বালক

হোক বা বৃদ্ধ. যদি সে পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে গৃহে আসে তবে গৃহস্থের উচিত সানন্দে গুরুর ন্যায় তার পূজা করা। পরলোকে কল্যাণ প্রাপ্তির জন্য নিজ উদ্‌গত ক্রোধকে বশ করে, ঈর্ষা ত্যাগ করে প্রসন্নতা সহকারে অতিথির পূজা করা উচিত। গৃহস্থ ব্যক্তি কখনো অতিথির অনাদর করবে না, তাকে মিথ্যা বলবে না এবং তার গোত্র, শাখা ও অধ্যয়নের বিষয়ে কখনো প্রশ্ন করবে না। আহারের সময় চণ্ডাল বা মহাচণ্ডাল এলেও পরলোকে হিতকামী মানুষ তাকে অন্নের দ্বারা সেবা করবে। যে (ভিক্ষুকের ভয়ে) নিজ গৃহদ্বার বন্ধ করে আনন্দে আহার করে, সে নিজ হাতে স্বর্গের দরজা বন্ধ করে দেয়। যে ব্যক্তি পিতৃপুরুষ, দেবতা, ঋষি, ব্রাহ্মণ, অতিথি ও নিরাশ্রয় মানুষদের অন্নদ্বারা তৃপ্ত করে সে মহা পুণ্যফল লাভ করে। যে ব্যক্তি বহু পাপ করে, সেও যদি যাচক ব্রাহ্মণকে বিশেষভাবে অন্নদান করে তবে সে সব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। জগতে অন্নদাতা পুরুষকে প্রাণদাতা বলে মানা হয় এবং যে প্রাণদাতা, সেই সব কিছুর দাতা হয়। অন্নকে অমৃত বলা হয় এবং অন্নকেই প্রজাদের জীবনরক্ষাকারী বলে মনে করা হয়। অন্ন নাশ হলে শরীরের পঞ্চধাতুও নাশ হয়। বলবান ব্যক্তি অন্নত্যাগ করলে বলহীন হয়ে পড়ে। তাই শ্রদ্ধাসহ চেষ্টাপূর্বক অন্নদান করা উচিত। সূর্য তার কিরণদ্বারা পৃথিবীর রস আহরণ করে, বাতাস সেই রস মেঘে স্থাপন করে। মেঘে থাকা সেই রস ইন্দ্র পুনরায় পৃথিবীতে বর্ষণ করেন। তাতে পৃথিবী বর্ষণ সিক্ত হয়ে তৃপ্ত হয় এবং তার থেকে অন্নের চারা উদ্‌গত হয়, যার দ্বারা সমস্ত প্রজার জীবন-নির্বাহ হয়। এইরূপ সূর্য-বায়ু-মেঘ ও ইন্দ্র—এগুলি একই সমুদায়ের অন্তর্গত। এর দ্বারাই ভূতাদির প্রাদুর্ভাব হয়েছে। আকাশে এই মহাত্মাদের বহু দিব্য ভবন আছে, যা বিভিন্ন প্রকারে নির্মিত এবং পৃথক-পৃথক ভূমিতে অবস্থিত। তার মধ্যে কারো ভবন চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শ্বেত বর্ণ, কারো উদয়কালীন সূর্যের ন্যায় রক্তিম। সেই লোকাদিতে স্থাবর জঙ্গম সর্বপ্রকারের প্রাণী নিবাস করে। অন্নদাতারা এই লোকই প্রাপ্ত হয়, তাই সর্বদা অন্নদান করা উচিত।

আহারের নিয়ম, গাভীদের ঘাস দেওয়ার বিধান ও মাহাত্ম্য এবং ব্রাহ্মণদের জন্য তিল ও ইক্ষু পেষণের নিষেধ বার্তা

যুধিষ্ঠির বললেন—মধুসূদন ! অন্নদানের ফল শুনে আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। এবার আপনি কৃপা করে ভোজনের নিয়ম বলুন।

ভগবান বললেন—পাণ্ডুনন্দন ! দ্বিজাতিদের ভোজনের নিয়ম শোনো। শ্রেষ্ঠ দ্বিজের উচিত স্নান করে পবিত্র হয়ে শুদ্ধ ও একান্ত স্থানে বসে অগ্নিতে হোম করা। ব্রাহ্মণ হলে চতুষ্কোণ, ক্ষত্রিয় হলে গোলাকার এবং বৈশ্য হলে অর্ধচন্দ্রাকার মণ্ডল নির্মাণ করবে। তারপর হাত-পা ধুয়ে মণ্ডল আসন পেতে পূর্বাভিমুখে উপবেশন করে দুই পা অথবা এক পায়ে ভূমি স্পর্শ করে থাকবে। এক বস্ত্র পরিধান করে বা সমস্ত দেহ আবৃত করে আহার করবে না। ভাঙা বাসনে বা উল্টো পাত্রাতেও আহার করবে না। আহার গ্রহণকারী ব্যক্তির প্রসন্নচিত্তে প্রথমে অন্নকে নমস্কার করতে হয়। অন্ন ব্যতীত অন্যত্র দৃষ্টি দেওয়া উচিত নয় এবং পরিবেশিত খাদ্যেরও নিন্দা করতে নেই। আহার শুরু করার আগে হাতে জল নিয়ে অন্নের চারদিকে প্রদক্ষিণ করবে, তারপর মন্ত্র পড়ে পৃথক পৃথক পাঁচ প্রাণকে অন্ন আহুতি দেবে। অন্ন, অন্নাদ এবং পাঁচ প্রাণের তত্ত্ব জেনে যে ব্যক্তি প্রাণাগ্নিহোত্র করে, তার পঞ্চবায়ুকে যজ্ঞ করা হয়। প্রাণেদের আহুতি দেবার পর এক এক গ্রাস করে আহার

করবে। এক গ্রাস অন্ন মুখে দেবার পর অবশিষ্ট অংশকে উচ্ছিষ্ট বলা হয়। মুখ থেকে পড়ে যাওয়া অন্নকে অখাদ্য বলে জানবে এবং সেটি খেলে চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করবে। যে নিজ উচ্ছিষ্ট খায় এবং একবার খেয়ে পরে অবশিষ্ট খাদ্য আবার গ্রহণ করে, তার চান্দ্রায়ণ, কৃচ্ছ্র অথবা প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করা উচিত। যে ব্যক্তি পত্নীর আহার করা পাত্রে ভোজন করে, স্ত্রীর উচ্ছিষ্ট খায় বা স্ত্রীর সঙ্গে এক বাসনে আহার করে, জেনো সে মদিরা পান করে। তত্ত্বদর্শী মুনিগণ সেই পাপমুক্তির জন্য কোনো প্রায়শ্চিত্ত বলেননি। জলপান করতে করতে যদি জলবিন্দু ভোজ্য সামগ্রীর ওপর পড়ে, তবে তা আর ভোজনযোগ্য থাকে না। যে সেটি খেয়ে নেয়, তার চান্দ্রায়ণ-ব্রত করা উচিত। তেমনই পান করার পর যে জল অবশিষ্ট থাকে, তা আর পানযোগ্য থাকে না। কোনো ব্রাহ্মণ যদি ভুলবশত সেই জল পান করে ফেলেন, তবে তাঁকে চান্দ্রায়ণ-ব্রত করতে হয়। ব্রাহ্মণের কোনো দিকে না তাকিয়ে আহার করা উচিত, তাঁদের উচিত কারোকে নিজ উচ্ছিষ্ট না দেওয়া, কখনো অত্যধিক বা অত্যল্প আহার গ্রহণ না করা। প্রত্যহ এমন আহার গ্রহণ করবে যাতে কষ্ট না হয়। আহার গ্রহণের সময় যদি রজস্বলা নারী, চণ্ডাল, কুকুর বা শূয়োর এসে যায়, তাহলে আহার ত্যাগ করবে। যে ভ্রমবশত এরূপ অবস্থায় আহার ত্যাগ করে না তাকে চান্দ্রায়ণ-ব্রত করতে হয়। আহারে যদি কেশ বা কীট পড়ে থাকে অথবা ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করা হয়, তবে তা অখাদ্য বলে ত্যাগ করা উচিত। এরূপ অন্ন গ্রহণ করলেও চান্দ্রায়ণ-ব্রত করতে হয়। আহারের স্থান থেকে উঠে যাওয়ার সময় যদি পা দিয়ে আহার স্পর্শ হয়ে যায় বা ডিঙিয়ে যাওয়া হয়, তবে সেই অন্ন রাক্ষসের খাওয়ার উপযুক্ত মনে করে পরিত্যাগ করতে হয়। রাক্ষসের উচ্ছিষ্ট ভাগ গ্রহণকারী ব্রাহ্মণ তার পূর্বতন এবং অধস্তন সাতপুরুষকে রৌরব নরকে প্রেরণ করে। আহার শেষ হলে, যে পাত্রে আহার করা হয়েছে, তাতে আচমন করা উচিত। আচমন না করেই যদি আহার গ্রহণকারী ব্রাহ্মণ আসন ত্যাগ করে, তাহলে তার তৎক্ষণাৎ স্নান করা উচিত, না হলে সে অপবিত্রই থেকে যায়।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—দেবেশ্বর ! গাভীদের ঘাস দেবার বিধান ও মাহাত্ম্য কী এবং ইক্ষু থেকে চন্দ্র কীভাবে উৎপন্ন হয়েছে, কৃপা করে বলুন।

ভগবান বললেন—রাজন্ ! বলদকে জগতের পিতা এবং গাভীদের জগতের মাতা বলে জানবে ; এদের পূজা করলে সমস্ত পিতৃপুরুষ এবং দেবতাদের পূজা করা হয়। যাদের গোময় লেপন করলে সভা-ভবন, গৃহ ও দেব-মন্দির শুদ্ধ হয়ে যায়, তাদের থেকে আর কোন্ প্রাণী শ্রেষ্ঠ ? যে ব্যক্তি এক বছর ধরে আহারের পূর্বে প্রত্যহ অন্যের গাভীকে এক মুষ্ঠি ঘাস খাওয়ায়, সে সবসময় এই গো-সেবার ফল পায়। (গাভীকে ঘাস দেবার বিধান এইরূপ—) গোমাতার সামনে ঘাস রেখে এইভাবে বলতে হয়—'জগতের সমস্ত গাভী আমার মাতা এবং সমস্ত বৃষভ আমার পিতা। গোমাতাগণ ! আমি তোমার সেবায় এই ঘাস অর্পণ করছি, এগুলি গ্রহণ করো।'[১] এই মন্ত্র পাঠ করে অথবা গায়ত্রী উচ্চারণ করে একাগ্রচিত্তে ঘাস অভিমন্ত্রিত করে গাভীকে খাওয়াবে। এরূপ করলে যে পুণ্যফল প্রাপ্তি হয়, তা শোনো। সেই ব্যক্তি জেনে অথবা না জেনে যেসব পাপ করে, তা সব নষ্ট হয়ে যায়, সে কখনো দুঃস্বপ্ন দেখে না। তিল অত্যন্ত পবিত্র এবং পাপনাশক ; ভগবান নারায়ণ থেকে এর উৎপত্তি, তাই শ্রাদ্ধে এর অত্যন্ত প্রশংসা করা হয়েছে। তিল দান অতি উত্তম দান বলা হয়, তিল দান করবে, তিল ভক্ষণ করবে এবং প্রভাতে তিল বাটা গায়ে লাগিয়ে স্নান করবে এবং সর্বদা 'তিল তিল' উচ্চারণ করবে। কারণ তিল সর্বপাপ বিনাশকারী। দ্বিজাতিদের তিল কিনে অথবা দানে পেয়ে বিক্রয় করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি তিল আহার করা, তিল বাটা গায়ে মাখা বা তিল দানের অতিরিক্ত অন্য কোনো কাজে তিল ব্যবহার করে, সে কীট হয়ে তার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে কুকুরের বিষ্ঠায় অবস্থান করে। ব্রাহ্মণের নিজে তিল পেষণের যন্ত্রে তিল পেষণ করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি মোহবশত তিল পেষণ করে, সে রৌরব নরকে পতিত হয়। চন্দ্র ইক্ষুর বংশে উৎপন্ন হয়েছে এবং ব্রাহ্মণ চন্দ্র বংশে উৎপন্ন, তাই ব্রাহ্মণের ইক্ষুপেষণ করা উচিত নয়। ব্রাহ্মণ যদি ইক্ষুপেষণ করে, তবে এক একটি ইক্ষুতে এক একটি ব্রহ্মহত্যার পাপে সে পাপী হয়।

---

[১] গাবো মে মাতরঃ সর্বাঃ পিতরশ্চৈব গোবৃষাঃ। গ্রাসমুষ্টিং ময়া দত্তং প্রতি গৃহ্ণন্তু মাতরঃ॥

আপদ্ ধর্ম, শ্রেষ্ঠ এবং নিন্দনীয় ব্রাহ্মণ, শ্রাদ্ধের উত্তম কাল এবং মানব ধর্মের সার বর্ণনা

যুধিষ্ঠির বললেন—কেশব ! আপনার কৃপায় আমি সর্বধর্মের কথা শুনলাম এবং কোন্ অন্ন ভোজনের যোগ্য, কোন্‌টি নয় তাও জানলাম। এবার কৃপা করে আপদ্ ধর্মের বর্ণনা করুন।

ভগবান বললেন—রাজন্ ! দেশে যখন অকাল হয়, রাষ্ট্রে কোনো বিপদ আসে, জন্ম বা মৃত্যুর অশৌচ বা ভীষণ রৌদ্রে পথ চলতে হয় এবং এই সব কারণে নিয়ম পালন করা সম্ভব না হয় বা দূরপথ অতিক্রম করার জন্য ক্লান্তি আসে, সেই অবস্থায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য না পেলে শূদ্রের কাছ থেকে জীবন-নির্বাহের জন্য সামান্য চাল (সিধা হিসাবে) গ্রহণ করা যায়। রোগী, দুঃখী, পীড়াগ্রস্ত ও ক্ষুধার্ত যদি আহার-সম্বন্ধীয় নিয়ম-পালন করতে সক্ষম না হয় তাহলেও তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় না। জল, মূল, ঘি, দুধ, হবি, ব্রাহ্মণের ইচ্ছা পূরণ করা, গুরু-আদেশ পালন করা এবং ঔষধ—এই আটটি সেবনে ব্রতভঙ্গ হয় না। যে ব্যক্তি বিধিপূর্বক প্রায়শ্চিত্ত করতে অক্ষম, সে বিদ্বানের কথায় বা দানের দ্বারাও শুদ্ধ হতে পারে। দূর-দেশে থাকা ব্যক্তি কিছুদিনের জন্য যদি গৃহে আসে, তখন ঋতুকালে বা অন্যসময়ে, রাতে বা দিনে স্ত্রীসমাগম করে, তাহলে সে প্রায়শ্চিত্তের ভাগী হয় না।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—দেবেশ্বর ! কীরূপ ব্রাহ্মণ প্রশংসার যোগ্য হন এবং কারা নিন্দার যোগ্য। অষ্ট-শ্রাদ্ধের সময় কখন—আমাকে বলুন।

ভগবান বললেন—রাজন্ ! উত্তম কুলে জন্ম, শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানকারী, বিদ্বান, দয়ালু, শ্রীসম্পন্ন, সরল এবং সত্যবাদী—এসব ব্রাহ্মণকে সুপাত্র (প্রশংসার যোগ্য) মনে করা হয়। তাঁরা সর্বাগ্রে উপবেশন করে সর্বপ্রথম ভোজনের অধিকারী এবং দর্শনমাত্রেই সেই পঙ্‌ক্তিতে উপবিষ্ট সকলকে পবিত্র করেন। যে সকল শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আমার শরণাগত ভক্ত, তাঁদের পঙ্‌ক্তিপাবন বলে জেনো। তাঁরা বিশেষভাবে পূজা পাওয়ার যোগ্য। এবার নিন্দার যোগ্য ব্রাহ্মণের বর্ণনা শোনো। যে ব্রাহ্মণ জগতে কপটতাপূর্ণ ব্যবহার করে, সে বেদপারঙ্গমী ব্রাহ্মণ হলেও পাপাচারী। যে অগ্নিহোত্র ও স্বাধ্যায় করে না, সর্বদা দান গ্রহণ করতে চায় এবং যত্র তত্র ভোজন করে, তাকে ব্রাহ্মণ জাতির কলঙ্ক বলে জানবে। যার দেহ মরণাশৌচের অন্নগ্রহণ করে হৃষ্ট হয়েছে, যে শূদ্রান্ন ভোজন করে, শূদ্রান্নের রসেই পুষ্ট, সেই ব্রাহ্মণ প্রত্যহ স্বাধ্যায়, জপ ও হোম করলেও উত্তম গতি লাভ করে না। যে ব্রাহ্মণ প্রতিদিন অগ্নিহোত্র করলেও শূদ্রান্ন থেকে দূরে থাকে না, তার আত্মা, বেদাধ্যয়ন এবং তিন অগ্নি—এই পাঁচটি বিনাশপ্রাপ্ত হয়। শূদ্রের সেবাকারী ব্রাহ্মণকে খাওয়ার জন্য মাটিতেই অন্ন দেওয়া উচিত, কারণ সে কুকুরেরই সমান। যে ব্রাহ্মণ মূর্খতাবশত মৃত শূদ্রের শবের সঙ্গে শ্মশানে যায়, তার ত্রিরাত্রি অশৌচ হয়। তিন রাত পার হলে সমুদ্রে মিলিত হওয়া নদীতে স্নান এবং একশতবার প্রাণায়াম করে ঘি পান করলে তবে সে শুদ্ধ হয়। যে শ্রেষ্ঠ দ্বিজ কোনো অনাথ ব্রাহ্মণের শব শ্মশানে নিয়ে যায়, সে পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পায় এবং সে স্নান করামাত্রই শুদ্ধ হয়ে যায়। নিবৃত্তিমার্গপরায়ণ ব্রাহ্মণের শূদ্রের গৃহে দুধ বা দই খাওয়া উচিত নয়। সেটিও শূদ্রান্ন বলে জানা উচিত। অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণের খাওয়ার অন্নে যে ব্যক্তি বিঘ্নপ্রদান করে তার থেকে বড় পাপী আর কেউ নয়।

রাজন্ ! ব্রাহ্মণ যদি শীল ও সদাচারবর্জিত হয় তাহলে ষড়াঙ্গসহ সম্পূর্ণ বেদ, সাংখ্য, পুরাণ এবং উত্তম কুলে জন্ম—এই সব মিলেও তার সদ্‌গতি করতে সক্ষম হয় না। গ্রহণের সময়, বিষুব যোগে, অয়ন সমাপ্ত হলে, পিতৃকর্মে (শ্রাদ্ধাদিতে), মঘা-নক্ষত্রে, পুত্র জন্ম হলে এবং গয়াতে পিণ্ডদানের সময় যে সামান্যতম দান করে, সেই দান এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দানের সমান হয়। বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া, কার্তিক শুক্লপক্ষের নবমী, ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী, মাঘের অমাবস্যা, চন্দ্র ও সূর্যের গ্রহণ, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের প্রারম্ভিক দিন—এগুলি শ্রাদ্ধের উত্তম কাল। এই দিনগুলিতে মানুষ পবিত্রচিত্ত হলে যদি পিতৃপুরুষের জন্য তিলমিশ্রিত জলও দান করে, তাহলে তার এক হাজার বছর ধরে শ্রাদ্ধ করার প্রয়োজন পূর্ণ হয়। এই রহস্য স্বয়ং পিতৃপুরুষের দ্বারা জানানো হয়েছে। যে ব্যক্তি স্নেহ বা ভয়ের জন্য অথবা ধনলাভের আশায় এক পঙ্‌ক্তিতে উপবিষ্ট লোকেদের আহার পরিবেশনে বিভেদ সৃষ্টি করে, তাকে বিদ্বান ব্যক্তিরা ক্রূর, দুরাচারী, অজিতাত্মা

ও ব্রহ্মঘাতক বলে থাকে। যার ধনভাণ্ডার পূর্ণ এবং যে পরলোক বিষয়ে কিছু না জানায় সর্বদা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে, সে কেবল দৈহিক সুখেই আসক্ত হয় ; তার কাছে ইহলোকের সুখই সুলভ হয়। পারলৌকিক সুখ কখনো তার কপালে থাকে না। যে বিষয়াসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে তপস্যায় ব্যাপৃত থাকে, নিত্য স্বাধ্যায় করে, ইন্দ্রিয়াদি বশে রাখে, প্রাণীদের হিত সাধনে রত থাকে, তার কাছে ইহলোকের সুখও সুলভ হয় এবং পরলোকেরও। কিন্তু যে মূর্খ বিদ্যালাভ করে না, তপস্যা করে না, দান করে না এবং অন্য সুখেরও জ্ঞান নেই তার জন্যে ইহলোকেও সুখ নেই, যার পরলোকেও নয়।

যুধিষ্ঠির বললেন—হৃষিকেশ ! আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, ঈশ্বর এবং সমস্ত জগতের নিবাসস্থান। আপনাকে নমস্কার। এখন আমি সর্বধর্মের সার শুনতে চাই।

ভগবান বললেন—মহাপ্রাজ্ঞ ! মনু যে ধর্মের সারতত্ত্ব বর্ণনা করেছেন, তা পুরাণাদির অনুকূল এবং বেদ দ্বারা সমর্থিত। আমি তা বর্ণনা করছি, শোনো। অগ্নিহোত্রী দ্বিজ, কপিলা গাভী, যজ্ঞকারী ব্যক্তি, রাজা, সন্ন্যাসী এবং মহাসাগর—এগুলি দর্শনমাত্রেই মানুষকে পবিত্র করে দেয়, তাই সর্বদা এগুলি দর্শন করা উচিত। একটি গাভী একজনকেই দান করা উচিত, অনেককে নয় (অনেককে দিলে তারা ওই গাভীকে বিক্রয় করে নিজেদের মধ্যে মূল্য ভাগ করে নেবে)। যদি সেই গাভীটি বিক্রয় করা হয়, তবে সে দাতার সাতপুরুষ পাপযুক্ত করে দেয়। একটি গাভী, একটি বস্ত্র, একটি শয্যা এবং একটি নারী কখনো অনেক মানুষের অধিকারে দিতে নেই ; কারণ তাহলে দাতা দানের ফল পায় না। ব্রাহ্মণ এবং গাভী যদি অনার্য ব্যক্তির গৃহে নিজে গিয়ে আহার গ্রহণ করে, তাহলে সেই অনার্য রাজসূয় যজ্ঞের থেকে বড় পুণ্যের ভাগী হয় । যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ ও গাভীকে খাবার দেবার সময় 'দিও না' বলে বাধা দেয়, সে একশো বার পশুপক্ষী রূপে জন্ম নেবার পর চণ্ডালরূপে জন্মগ্রহণ করে। ব্রাহ্মণের, দেবতার, দরিদ্রের এবং গুরুর ধন যদি চুরি করা হয় তাহলে সে স্বর্গবাসীদেরও নীচে পতিত করে দেয়। যে ধর্মের তত্ত্ব জানতে চায়, তার জন্য বেদ প্রধান প্রমাণ, ধর্মশাস্ত্র দ্বিতীয় প্রমাণ এবং লোকাচার তৃতীয় প্রমাণ। পূর্ব সমুদ্র থেকে পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত এবং হিমালয় ও বিন্ধ্যাচলের মধ্যবর্তী যে দেশ, তাকে বলা হয় আর্যাবর্ত। সরস্বতী এবং দৃষদ্বতী—এই দুই দেব নদীর মধ্যে দেবতা দ্বারা রচিত যে দেশ, তাকে বলা হয় ব্রহ্মাবর্ত। যে দেশে চার বর্ণ এবং তাদের অবান্তর পার্থক্যের যে আচার-ব্যবহার পূর্বপরম্পরা থেকে চলে আসছে, তাকেই তাদের সদাচার বলা হয়। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল এবং শূরসেন—এগুলি ব্রহ্মর্ষিদের দেশ এবং ব্রহ্মাবর্তের নিকটবর্তী। এই দেশের ব্রাহ্মণদের কাছে গিয়ে পৃথিবীর সব মানুষের আচার-ব্যবহার শিক্ষা করা উচিত। হিমালয় এবং বিন্ধ্যাচলের মধ্যে কুরুক্ষেত্রের পূর্বে এবং প্রয়াগের পশ্চিমে যে দেশ আছে, তাকে মধ্যদেশ বলা হয়। যে দেশে কৃষ্ণসার নামক মৃগ বিচরণ করে, সেই দেশই যজ্ঞের উপযোগী ; তার থেকে পৃথক ম্লেচ্ছদের দেশ। এই দেশগুলির পরিচয় লাভ করে দ্বিজাতীয়দের তাতে বাস করা উচিত ; কিন্তু শূদ্রেরা জীবিকা না পেলে জীবন-নির্বাহের জন্য যে কোনো দেশে নিবাস করতে পারে। সদাচার, অহিংসা, সত্য, শক্তি অনুযায়ী দান এবং যম-নিয়মাদি পালন—এগুলি মুখ্য ধর্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের গর্ভাধান থেকে অন্ত্যেষ্টি পর্যন্ত সব সংস্কার বেদোক্ত বিধি অনুসারে করা উচিত ; কারণ সংস্কার ইহলোকে ও পরলোকে পবিত্রকারী হয়ে থাকে। গর্ভাধান-সংস্কারে করা যজ্ঞের দ্বারা এবং জাতকর্ম, নামকরণ, চূড়াকরণ, যজ্ঞোপবিত (পৈতে ধারণ), বেদাধ্যয়ন, বেদোক্ত ব্রতাদি পালন, স্নাতকের পালনীয় ব্রত, বিবাহ, পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও অন্যান্য যজ্ঞের দ্বারা এই শরীরকে পরব্রহ্ম প্রাপ্তির যোগ্য তৈরি করা হয়। যার দ্বারা ধর্মেরও লাভ হয় না এবং অর্থ ও বিদ্যা-প্রাপ্তির অনুকূল সেবাও যে করে না, সেই শিষ্যকে বিদ্যাদান করা উচিত নয়, যেমন অনুর্বর খেতে বীজরোপণ করা উচিত নয়, তেমনই। যে ব্যক্তির থেকে লৌকিক, বৈদিক এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ হয়, সেই গুরুকে প্রথম প্রণাম করা উচিত। নিজ দক্ষিণ হাতে গুরুর দক্ষিণ চরণ এবং বাম হাতে বাম চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করা উচিত। গুরুকে কখনো এক হাতে প্রণাম করতে নেই। যিনি গর্ভাধান ইত্যাদি সমস্ত সংস্কার বিধিমতো করান এবং বেদপাঠ করান, তাঁকে গুরু বলা হয়। যিনি উপনয়ন সংস্কার করে কল্প ও রহস্যসহ বেদাদি নিত্য অধ্যয়ন করান, তাঁকে উপাধ্যায় বলা হয়। যিনি ষড়ঙ্গযুক্ত বেদাদি পাঠ করিয়ে বৈদিক ব্রতের শিক্ষা দেন এবং মন্ত্র-ব্যাখ্যা করেন, তাঁকে আচার্য বলা হয়। গৌরবে দশ উপাধ্যায়ের থেকে বড় একজন আচার্য, শত আচার্যের থেকে বড় পিতা, শত পিতার থেকে বড় মাতা ; কিন্তু জ্ঞান

প্রদান করেন যে গুরু, তিনি এঁদের সবার থেকে শ্রেষ্ঠ। গুরুর থেকে বড় কেউ হয়নি, হবেও না। তাই মানুষের উপরিউক্ত গুরুজনদের অধীনে থেকে তাঁদের সেবা-শুশ্রূষাতে ব্যাপৃত থাকতে হয়। গুরুজনদের অপমান করলে যে নরকে পতন হয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই। যারা কোনো অঙ্গ হীন, যার কোনো অঙ্গ অধিক, যে বিদ্যাহীন, অবস্থাগতিকে বৃদ্ধ, রূপ ও ধনহীন এবং নীচজাতির, তাদের আক্ষেপ করা উচিত নয় ; কারণ যে আক্ষেপ করে তার পুণ্য, যার জন্য আক্ষেপ করা হয়, তার কাছে চলে যায়। নাস্তিকতা, বেদ ও দেবতাদের নিন্দা, দ্বেষ, দম্ভ, অভিমান, ক্রোধ ও কঠোরতা—এগুলি পরিত্যাগ করা উচিত।

অগ্নির স্বরূপ, অগ্নিহোত্রের বিধি এবং তার মাহাত্ম্য বর্ণনা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—দেবদেবেশ্বর ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের কীভাবে যজ্ঞ করা উচিত ? অগ্নির ভেদ কয় প্রকারের ? তার পৃথক পৃথক স্বরূপ কী ? কোন্ অগ্নির কোথায় স্থান ? অগ্নিহোত্রী পুরুষ কোন্ অগ্নিতে যজ্ঞ করে কোন্ লোক প্রাপ্ত হন ? পূর্বকালে অগ্নিহোত্রের নিমিত্ত কী ছিল ? দেবতাদের জন্য কীরূপ যজ্ঞ করা হয় এবং কীভাবে তাঁদের তৃপ্তি হয় ? অগ্নিহোত্রী কোন্ গতি প্রাপ্ত হন ? তিন অগ্নির স্বরূপ না জেনে যদি তাতে অবিধিপূর্বক যজ্ঞ করা হয় অথবা উপাসনাতে ত্রুটি থেকে যায়, তবে এই ত্রিবিধ অগ্নি অগ্নিহোত্রীর কী অনিষ্ট করে ? যে ব্যক্তি অগ্নি পরিত্যাগ করেছে, সেই পাপাত্মা কী জন্ম পরিগ্রহ করে ? এই সব বিষয় আমাকে সংক্ষেপে বলুন ; কারণ আমি ভক্তিভাবে আপনার শরণ গ্রহণ করেছি। প্রভু ! আপনি সর্বজ্ঞ, সব থেকে মহান ; তাই আমি আপনাকে স্মরণ করি।

ভগবান বললেন—রাজন্ ! এই মহাপুণ্যদায়ক এবং পরম ধর্মরূপ অমৃতের বর্ণনা শোনো—ধর্মপরায়ণ অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণকে এটি ভবসাগর থেকে পার করে দেয়। আমি সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মারূপে সমস্ত লোকের সৃষ্টি করেছি এবং সকলের মঙ্গলের জন্য নিজ মুখ থেকে সর্বপ্রথম অগ্নি সৃষ্টি করেছি। এইভাবে আমা কর্তৃক সর্বভূতের আগে অগ্নি-তত্ত্ব উৎপন্ন হয়েছে, তাই পুরাণ-জ্ঞাত্বা মনীষী বিদ্বানগণ তাকে অগ্নি বলেন। সমস্ত কার্যে সর্বাগ্রে প্রজ্বলিত অগ্নিতেই আহুতি প্রদান করা হয়, তাই এর নাম অগ্নি। একে ভালোভাবে পূজা করলে ব্রাহ্মণদের অগ্রগতি (পরমপদ) প্রাপ্ত হয়, তারজন্যও দেবতাদের মধ্যে অগ্নি নাম বিখ্যাত। যদি বিধি লঙ্ঘন করে এতে যজ্ঞ করা হয়, তবে এক মুহূর্তেই এটি যজ্ঞকারীকে গ্রাস করার শক্তিধারণ করে ; তাই অগ্নিকে ক্রব্যাদ্ বলা হয় । এই অগ্নি সমস্ত ভূতের স্বরূপ এবং দেবতাদের মুখ। অন্নপাক করার জন্য একে পচন বলা হয়। একে উপাসনা করা হয়, তাই একে ঔপাসন বলা হয়। 'আহুতি' শব্দের দ্বারা সকলের বোধ হয় ; সেই সর্বস্বরূপ আহুতিতে অগ্নির আবসথ—নিবাস ; তাই ব্রহ্মবাদী মানুষেরা একে 'আবসথ্য' বলেন। যে ব্রাহ্মণের গৃহে ধর্মানুসারে পঞ্চমহাযজ্ঞানুষ্ঠান হয়, তিনি চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত হয়ে ঊর্ধ্বগতি প্রাপ্ত করেন। ইন্দ্রিয়াদি ও মন-বুদ্ধিতে সংযম রক্ষাকারী সিদ্ধ সপ্তর্ষিগণ অগ্নির আরাধনায় তৎপর থাকার জন্যই দেবতাদের স্বরূপ প্রাপ্ত হন। অন্য বিদ্বানগণ আবসথ্য অগ্নিকেই পচনাগ্নি বলেন ; কারণ এতেই পঞ্চমহাযজ্ঞের স্থিতি। স্থালীপাক ও গৃহ্যকর্ম সব এতেই প্রতিষ্ঠিত। গৃহ্যকর্মের আধার হওয়ায় একে গৃহপতিও বলা হয়। কিছু ব্রহ্মবেত্তাদের মতে ঔপাসন, আবসথ্য, সভ্য এবং পচন নামক অগ্নিও এটিই। আমারও তাই মত।

রাজন্ ! এবার একাগ্রচিত্তে অগ্নিহোত্রের প্রকার শোনো। গুণানুসারে নামধারণকারী যে ত্রিবিধ অগ্নি, তার সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা হচ্ছে। গৃহাদির আধিপত্যকেই গৃহপত্য বলা হয়। এই গৃহপত্য যে অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত, সেটিই গার্হপত্য অগ্নি নামে প্রসিদ্ধ। যে অগ্নি যজমানকে দক্ষিণ মার্গের দ্বারা স্বর্গে নিয়ে যায়, ব্রাহ্মণেরা তাকে দক্ষিণাগ্নি বলেন। 'আহুতি' শব্দ সর্বের বাচক এবং হবন হল 'যজ্ঞ'। সর্বপ্রকার যজ্ঞ স্বীকারকারী বহ্নিকে আহ্বনীয় অগ্নি বলা হয়। যে আবসথ্য নামক মূল অগ্নিতে ব্রাহ্মণ বিধিপূর্বক যজ্ঞ করে, তাকে পচনাগ্নিও বলা হয়। সেই অগ্নিতে স্থিত একটি অন্য অগ্নি আছে, যাকে সভ্য বলা হয়। আবসথ্য নামক যে প্রথম অগ্নি, সেটি প্রজাপতির স্বরূপ। গার্হস্থ্য অগ্নি ব্রহ্মার স্বরূপ ; কারণ ব্রহ্মা থেকেই তার উৎপত্তি হয়েছে এবং এই

দক্ষিণাগ্নি রুদ্রস্বরূপ। হোমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যার মুখে আহুতি প্রদান করা হয়, সেই আহ্বনীয় অগ্নি স্বয়ং আমি, সভ্য নামক যে পঞ্চ অগ্নি, তা কার্তিকেয় স্বামীর স্বরূপ। পৃথিবী গার্হপত্যাগ্নি, অন্তরীক্ষ দক্ষিণাগ্নি এবং স্বর্গ আহ্বনীয়াগ্নি। অগ্নির এইরূপ তিন প্রকার ভেদ বলা হয়েছে। গার্হপত্য অগ্নি গোলাকার ; কারণ তার স্বরূপভূতা পৃথিবী গোল। অন্তরীক্ষের আকার অর্ধচন্দ্রের ন্যায়, তাই দক্ষিণাগ্নিকেও সেইরূপ মনে করা হয়। স্বর্গলোক নির্মল, নিরাময় এবং চতুষ্কোণ বিশিষ্ট, তাই আহ্বনীয় অগ্নিকেও চতুষ্কোণ বলা হয়। যে ব্যক্তি গার্হপত্য অগ্নিতে যজ্ঞ করে, সে পৃথিবীতে বিজয়ী হয়। দক্ষিণাগ্নিতে যজ্ঞকারী ব্যক্তি অন্তরীক্ষ জয় করে, কিন্তু যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত চিত্তে প্রত্যহ আহ্বনীয় অগ্নিতে যজ্ঞ করে, সে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং ঋষিগণসহ স্বর্গলোকের ওপর বিজয় লাভ করে।

যজ্ঞে সবদিক থেকে অগ্নির মুখে হোম করা হয়, তাই সেই অত্যন্ত কান্তিমান অগ্নি 'আহ্বনীয়' সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়। অগ্নিহোত্র অথবা অন্যান্য যজ্ঞে হোমের আরম্ভেই অগ্নিতে আহুতি প্রদান করা হয়, তার জন্যও একে আহ্বনীয় বলা হয়। যে দ্বিজ আবসথ্য নামক মূল অগ্নিতে বিধিমতো হোম করে, সে তার পত্নীর সঙ্গে সপ্তর্ষিলোকে গমন করে আনন্দ উপভোগ করে এবং সমস্ত অগ্নির প্রিয় হয়। আবসথ্য অগ্নিতে যে হোম করা হয়, তাকে অগ্নিহোত্র বলা হয়। সেটি 'হো' অর্থাৎ দুঃখ থেকে যজমানকে ত্রাণ করে, তাই একে অগ্নিহোত্র বলা হয়। আত্মবেত্তা বিদ্বানেরা আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক—এই তিন প্রকারের দুঃখ হয় বলে জানিয়েছেন। বিধিবৎ হোম করলে অগ্নি এই তিন প্রকার দুঃখ থেকে সেই ব্যক্তিকে ত্রাণ করে, তাই এই কর্মকে বেদে অগ্নিহোত্র নাম দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিধাতা ব্রহ্মাই সর্বপ্রথম অগ্নিহোত্র সৃষ্টি করেছিলেন। বেদ এবং অগ্নিহোত্র স্বত উৎপন্ন হয়েছে—এর অন্য কোনো কর্তা নেই। বেদাধ্যয়নের ফল অগ্নিহোত্র (অর্থাৎ বেদপাঠ করে যে অগ্নিহোত্র করে না, তার বেদ পাঠ নিষ্ফল)। শাস্ত্রজ্ঞানের ফল শীল এবং সদাচার, স্ত্রীর ফল রতি এবং পুত্র এবং ধনের ফল সাফল্য দান এবং উপভোগ। তিন বেদের মন্ত্রাদির সংযোগে অগ্নিহোত্রের প্রবৃত্তি হয়। ঋক্, যজুঃ এবং সামবেদের পবিত্র মন্ত্রাদি ও মীমাংসা-সূত্রাদির দ্বারা অগ্নিহোত্র কর্ম প্রতিপাদন করা হয়।

বসন্ত ঋতুকে ব্রাহ্মণের স্বরূপ বলে জানা উচিত এবং তা বেদের যোনিরূপ, তাই ব্রাহ্মণের বসন্ত ঋতুতে অগ্নিস্থাপনা করা উচিত। যে বসন্ত ঋতুতে অগ্ন্যাধান করে, সেই ব্রাহ্মণের শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং তার বৈদিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বসন্ত ঋতুতে অগ্ন্যাধান শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়। যে ক্ষত্রিয় গ্রীষ্ম-ঋতুতে অগ্নিস্থাপনা করে, তার সম্পত্তি, প্রজা, পশু, ধন, তেজ, বল ও যশের অভিবৃদ্ধি হয়। শরৎকালের রাত্রি সাক্ষাৎ বৈশ্যের স্বরূপ, তাই বৈশ্যের শরৎ ঋতুতে অগ্নিস্থাপনা করতে হয়, তাহলে তার সম্পত্তি, প্রজা, আয়ু, পশু ও ধন বৃদ্ধি হয়। সর্বপ্রকারের রস, ঘি ইত্যাদি স্নিগ্ধ পদার্থ, সুগন্ধ দ্রব্য, রত্ন, মণি, সুবর্ণ ও লৌহ—এই সব অগ্নিহোত্রের জন্যই উৎপন্ন হয়েছে। অগ্নিহোত্রকে জানার জন্যই আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, মীমাংসা, বিস্তৃত ন্যায়শাস্ত্র এবং ধর্মশাস্ত্র রচনা করা হয়েছে। ছন্দ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং নিরুক্তও অগ্নিহোত্রের জন্যই উৎপন্ন হয়েছে। অগ্নিহোত্রকে জানার জন্যই আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, মীমাংসা, বিস্তৃত ন্যায়শাস্ত্র এবং ধর্মশাস্ত্র নির্মাণ করা হয়েছে। ছন্দ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং নিরুক্তও অগ্নিহোত্রের জন্যই রচিত হয়েছে। ইতিহাস, পুরাণ, গাথা, উপনিষদ এবং অথর্ববেদের কর্মও অগ্নিহোত্রেরই জন্য। তিথি, নক্ষত্র, যোগ, মুহূর্ত এবং করণরূপ কালের জ্ঞান প্রাপ্ত করার জন্য পূর্বকালে জ্যোতিষশাস্ত্র নির্মিত হয়েছিল। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদের মন্ত্রাদির ছন্দের জ্ঞান লাভ করার জন্য ও সংশয় এবং বিকল্পের নিরাকরণপূর্বক তার তাত্ত্বিক অর্থ বোঝার জন্য ছন্দঃশাস্ত্র রচিত হয়েছিল। বর্ণ, অক্ষর এবং পদের অর্থ, সন্ধি ও লিঙ্গের এবং নাম ও ধাতুর বিবেক জাগ্রত করার জন্য পূর্বকালে ব্যাকরণ-শাস্ত্রের প্রণয়ন হয়েছিল। যূপ, বেদী এবং যজ্ঞের স্বরূপ জানার জন্য, প্রোক্ষণ, শ্রপণ (চরু তৈরি) ইত্যাদি ইতি কর্তব্য বোঝার জন্য এবং যজ্ঞ ও দেবতার সম্বন্ধে লাভ প্রাপ্ত করার জন্য শিক্ষা নামক বেদাঙ্গ রচনা করা হয়েছিল। যজ্ঞপাত্রাদির শুদ্ধি, যজ্ঞ সম্বন্ধীয় সামগ্রী সমূহের সংগ্রহ এবং সমস্ত যজ্ঞের বৈকল্পিক বিধানের জ্ঞান লাভ করার জন্য কল্পের নির্মাণ হয়েছে। সমস্ত বেদে প্রযুক্ত নাম, ধাতু এবং বিকল্পাদির তাত্ত্বিক অর্থ স্থির করার জন্য ঋষিগণ নিরুক্তের রচনা করেছিলেন। যজ্ঞের বেদী নির্মাণ এবং অন্য সামগ্রী ধারণ করার জন্য ব্রহ্মা পৃথিবীর সৃষ্টি করেছিলেন। সমিধ এবং যূপ তৈরির

জন্য বনস্পতি সৃষ্টি করেছেন। যে ব্রাহ্মণ মন্ত্রাদির বিনিয়োগ, যজ্ঞীয় পদার্থের প্রোক্ষণ, চরু তৈরি, দর্শ এবং পৌর্ণমাসের অঙ্গভূত অনুযাজ এবং প্রযাজ, বায়ুদেবতার স্তব, সামবেদের উদ্‌গাতার কর্ম, প্রতিপ্রস্থাতার কর্ম, দক্ষিণা, অবভৃতস্নান, ত্রিকালপূজা, উচিত স্থানে দেবতাদের নৈবেদ্য অর্পণ করা, দেবতাদের আবাহন, বিসর্জন এবং হবিষ্য তৈয়ারি ইত্যাদি কর্ম জানে না, সে অন্ধকারময় ভীষণ রৌরব নরকে পতিত হয়।

স্বর্ণ এবং রৌপ্য—এগুলি যজ্ঞের পাত্র, কলস ইত্যাদির জন্য সৃষ্ট হয়েছে। কুশের উৎপত্তি হয়েছে যজ্ঞকুণ্ডের চারদিকে রাখার জন্য এবং রাক্ষসদের হাত থেকে যজ্ঞ রক্ষা করার জন্য। যজ্ঞ এবং পূজার কার্য করার জন্য ব্রাহ্মণদের জন্ম হয়েছে। ক্ষত্রিয়দের সৃষ্টি করা হয়েছে সকলকে রক্ষার জন্য। কৃষি, গো-রক্ষা, বাণিজ্য ইত্যাদির জীবিকার সাধন তৈরি করার জন্য বৈশ্যের উৎপত্তি। তিন বর্ণের মানুষের সেবার জন্য ব্রহ্মা শূদ্র জাতিকে সৃষ্টি করেন। সমস্ত জগৎ এইভাবে অগ্নিহোত্রের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। যে ব্যক্তি অন্ধকারে আচ্ছাদিত হওয়ায় এই কথা জানে না, সে রৌরব নামক ভয়ানক নরকে পতিত হয় এবং সেখানে পাপ ক্ষয় হলে কীটজন্ম প্রাপ্ত হয়। যে দ্বিজ বিধিপূর্বক অগ্নিহোত্র পালন করেন, তাঁর দ্বারা দান, হোম, যজ্ঞ এবং অধ্যাপন—সমস্ত কর্মই পূর্ণ হয়ে যায়। এইরূপ ব্রাহ্মণদের দ্বারা অন্য যেসব কার্য হয়, সেইসব পুণ্য নিয়ে আমি সূর্যমণ্ডলে স্থাপন করি। আমার দ্বারা স্থাপিত সংসারের পুণ্য এবং অগ্নিহোত্রাদির সুকৃতি সূর্যদেব ধারণ করেন। অগ্নিহোত্রী পুরুষ স্বর্গে গিয়ে অগ্নিহোত্রের পুণ্যফল উপভোগ করেন এবং প্রলয়কাল পর্যন্ত তিনি দেবতাদের ন্যায় সেখানেই বাস করেন। কপটতাপূর্বক বীরদের যে হত্যা করে সেই দুরাচারী মানুষ দরিদ্র, অঙ্গহীন এবং রুগ্ন হয়ে শূদ্রজন্ম প্রাপ্ত হয় (যারা অগ্নিহোত্র ত্যাগ করে, তাদেরও এই গতি হয়)। তাই যেসব দ্বিজ দূর-দেশে বাস করে না এবং ঊর্ধ্বগতি প্রাপ্ত করতে চায়, তাদের প্রত্যহ বিধিপূর্বক অগ্নিহোত্র করা উচিত। অগ্নিহোত্রকে নিজের আত্মার সমান মনে করে তাকে কখনো অপমান বা ত্যাগ করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি বালাকাল থেকে অগ্নিহোত্র পালন করে এবং শূদ্রান্ন থেকে দূরে থাকে, যার ওপর ক্রোধ বা লোভের প্রভাব পড়ে না, যে প্রত্যহ প্রভাতে স্নানের পর জিতেন্দ্রিয়ভাবে বিধিবৎ অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করে, অতিথি সেবায় ব্যাপৃত থাকে এবং শান্তভাবে দিনে দুবার আমার ধ্যান করে, সে সূর্যমণ্ডল ভেদ করে আমার পরমধাম লাভ করে, সেখান থেকে তার পুনরাগমন হয় না। সে প্রভাত সূর্যের ন্যায় বিমানে বসে স্ত্রীসহ আমার লোকে গমন করে বালসূর্যের ন্যায় তেজস্বী হয়ে ইচ্ছামতো রূপধারণ করে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করে। তারা ঈশ্বরীয় গুণসম্পন্ন হয়ে ইচ্ছামতো ক্রীড়া করে। পাণ্ডুনন্দন ! অগ্নিহোত্রীদের এমনই বিভূতি। জগতে কিছু মূর্খ শ্রুতিতে দোষারোপ করে তার নিন্দা করে এবং তাকে প্রমাণভূত বলে মানে না, তাদের অত্যন্ত দুর্গতি হয়। কিন্তু যে দ্বিজ আস্তিক্য বুদ্ধিতে বেদ ও ইতিহাসকে প্রামাণিক বলে মানে, সে দেবতার সাযুজ্য লাভ করে।

চান্দ্রায়ণ-ব্রতের বিধি, তা করার নিমিত্ত এবং মহিমার বর্ণনা

যুধিষ্ঠির বললেন—গরুড়ধ্বজ ! এবার আপনি আমাকে চান্দ্রায়ণের পরম পবিত্র বিধির বর্ণনা করুন।

ভগবান বললেন—পাণ্ডুনন্দন ! সকল পাপনাশকারী চান্দ্রায়ণ ব্রতের যথার্থ বর্ণনা শোনো। এর আচরণ দ্বারা পাপী মানুষ শুদ্ধ হয়ে যায়। উত্তম ব্রত পালনকারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য—যে কেউই চান্দ্রায়ণ-ব্রত বিধিমতো পালন করতে চায়, তার প্রথম কাজ হল, নিয়মে থেকে পঞ্চগব্যের দ্বারা সমস্ত দেহ শোধন করা। পরে কৃষ্ণপক্ষ শেষ হলে দাড়ি-গোঁফসহ মস্তক মুণ্ডন করা। তারপর স্নান করে শ্বেতবস্ত্র ধারণ করে, কোমরে মেখলা বেঁধে পলাশের দণ্ড নিয়ে ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করতে থাকা। দ্বিজের উচিত প্রথম দিন উপবাস করে শুক্লপক্ষের প্রতিপদে নদী সঙ্গমে, কোনো পবিত্র স্থানে বা গৃহেই ব্রত আরম্ভ করা। প্রথমে নিত্য নিয়ম শেষ করে একটি বেদীর ওপর অগ্নিস্থাপন করে তাতে ক্রমশ আধার, আজ্যভাগ, প্রণব, মহাব্যাহৃতি এবং পঞ্চবারুণ হোম করে সত্য, বিষ্ণু, ব্রহ্মর্ষিগণ, ব্রহ্মা, বিশ্বদেব এবং প্রজাপতি—এই ছয় দেবতার জন্য হোম করা। শেষে প্রায়শ্চিত্ত হোম করে যজ্ঞ কার্য সমাপ্ত করবে। পরে শান্তি ও পৌষ্টিক কর্মের অনুষ্ঠান করে অগ্নি ও সোমদেবকে প্রণাম করবে এবং যথানিয়মে শরীর

ভস্মাচ্ছাদিত করে নদীতীরে গিয়ে বিশুদ্ধ চিত্তে সোম, বরুণ ও আদিত্যকে প্রণাম করে একাগ্রভাবে জলে স্নান করবে। তারপর আচমন করে পূর্বাভিমুখ হয়ে বসবে এবং প্রাণায়াম করে কুশের দ্বারা শরীর মার্জনা করবে। পরে আচমন করে দুবাহু তুলে সূর্য দর্শন করে, হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে সূর্য প্রদক্ষিণ করবে। সেই সময় নারায়ণ, রুদ্র, ব্রহ্মা অথবা বরুণ সম্বন্ধীয় সূক্ত পাঠ করবে অথবা বীরঘ্ন, ঋষভ, অঘমর্ষণ, গায়ত্রী বা আমার সম্বন্ধীয় বৈষ্ণব মন্ত্র জপ করবে। এই জপ শত বার, একশো আট বার বা এক হাজার বার করা উচিত। তারপর পবিত্র এবং একাগ্র চিত্ত হয়ে মধ্যাহ্নে ক্ষীর বা যবের পায়েস তৈরি করবে। পরে সাত ব্রাহ্মণের গৃহে গিয়ে ভিক্ষা চাইবে, সাত জনের বেশি কারো গৃহে ভিক্ষার জন্য অপেক্ষা করবে না, মৌন থাকবে এবং ইন্দ্রিয়াদি বশে রাখবে। ভিক্ষাগ্রহণকারী ব্যক্তি হাসবে না, এদিক-ওদিক তাকাবে না এবং কোনো নারীর সঙ্গে কথা বলবে না। যদি মল, মূত্র, চণ্ডাল, রজস্বলা নারী, পতিত ব্যক্তি কিংবা কুকুর দৃষ্টিগোচর হয়, তবে সূর্য দর্শন করবে।

তারপর নিজ গৃহে এসে ভিক্ষাপাত্র রেখে হাত-পা ভালো করে ধোবে। পরে জল দিয়ে আচমন করে অগ্নি ও ব্রাহ্মণের পূজা করবে। এরপর সেই ভিক্ষাপ্রাপ্ত দ্রব্য পাঁচ বা সাত ভাগ করে তাতে পিণ্ড প্রস্তুত করবে। তার থেকে এক একটি পিণ্ড ক্রমশ সূর্য, ব্রহ্মা, অগ্নি, সোম, বরুণ ও বিশ্বদেবকে নিবেদন করবে, শেষে যে পিণ্ডটি থাকবে সেটি যাতে সহজে মুখে যায়, তেমন করে তৈরি করবে। তারপর পবিত্রভাবে পূর্বমুখ হয়ে সেই পিণ্ডে ডানহাতের আঙুল রেখে গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে তিন আঙুলের দ্বারা মুখে পুরতে হবে। চন্দ্রের কলা যেমন শুক্লপক্ষে প্রত্যহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও কৃষ্ণপক্ষে প্রত্যহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তেমনই পিণ্ডের মাত্রাও শুক্লপক্ষে বৃদ্ধি পাবে এবং কৃষ্ণপক্ষে ক্ষীণ হবে[১১]। চান্দ্রায়ণ ব্রতধারীদের প্রত্যহ তিন-বার, দু-বার বা এক বার স্নান করার বিধান আছে। তাকে সর্বদা ব্রহ্মচারী হয়ে থাকতে হবে। দিনে এক স্থানে দাঁড়িয়ে থাকবে না, রাত্রে বীরাসনে বসবে অথবা বেদী বা বৃক্ষমূলে শয়ন করবে। বল্কল, রেশম, সন বা সুতীবস্ত্র পরবে। এইভাবে একমাস পর চান্দ্রায়ণ-ব্রত পূর্ণ হলে, আয়োজন করে ব্রাহ্মণ ভোজন করাবে এবং তাঁদের দক্ষিণা দেবে। চান্দ্রায়ণ-ব্রতের আচরণে মানুষের সমস্ত পাপ অগ্নিতে শুষ্ক কাঠের ন্যায় একমুহূর্তে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্বর্ণের চুরি, ভ্রূণহত্যা, মদ্যপান ও গুরু-পত্নী-গমন ইত্যাদি সব পাপ চান্দ্রায়ণব্রতে নষ্ট হয়ে যায়। যে গাভীর বৎস হওয়ার দশ দিন পার হয়নি, তার দুধ বা তেমনই ভেড়ার দুধ পান করলে এবং মরণাশৌচ বা জননাশৌচের অন্ন অথবা পতিতের অন্ন এবং শূদ্রের উচ্ছিষ্ট আহার করলে চান্দ্রায়ণ-ব্রত পালন করা উচিত। বৃক্ষে ঝুলে থাকা ফল, হাতে রাখা, নীচে পড়ে থাকা এবং অন্যের হাতের থেকে অন্ন গ্রহণ করলেও চান্দ্রায়ণ ব্রত পালন করা আবশ্যক হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অবিবাহিত থাকাতে কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ করা এবং অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অন্ন, পূজারির অন্ন এবং পুরোহিতের অন্ন-গ্রহণ করলেও চান্দ্রায়ণ-ব্রত করা উচিত। মদিরা, আমক, ঘি, লাক্ষা, লবণ ও তেল বিক্রয়কারী ব্রাহ্মণেরও চান্দ্রায়ণ ব্রত করা আবশ্যক। যে দ্বিজ জনতার মধ্যে বা ভাঙা বাসনে খায়, যে উপনয়ন-সংস্কার রহিত বালক, কন্যা এবং স্ত্রীর সঙ্গে একই পাত্রে আহার করে এবং যে মোহবশত নিজ উচ্ছিষ্ট অন্যকে দেয়, সেই ব্রাহ্মণেরও চান্দ্রায়ণ-ব্রত করা উচিত। দ্বিজ যদি গাজর, পিঁয়াজ, রসুন, বাসি অন্ন, অন্যের গৃহে রাঁধা আহার সামগ্রী বা রজস্বলা নারী, কুকুর ও চণ্ডালের দ্বারা দেখা অন্ন খায়, তাহলে তার চান্দ্রায়ণ-ব্রত করা অনিবার্য হয়। পূর্বকালে ঋষিগণ আত্মশুদ্ধির জন্য এই ব্রত পালন করতেন, এটি সমস্ত প্রাণীর পবিত্রকারী ও পুণ্যরূপ। যে দ্বিজ এই পরম গোপনীয়, পবিত্র, পাপনাশক ব্রত অনুষ্ঠান করে, সে পবিত্রাত্মা এবং নির্মল সূর্যের ন্যায় তেজস্বী হয়ে স্বর্গলোক লাভ করে।

---

[১১]অর্থাৎ শুক্লপক্ষের প্রতিপদে এক পিণ্ড, দ্বিতীয়াতে দুই পিণ্ড আহার করা উচিত। তেমনই পূর্ণিমাতে পনেরো গ্রাস আহার করে কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ থেকে চতুর্দশী পর্যন্ত প্রত্যহ এক এক গ্রাস কম করা উচিত। অমাবস্যায় উপবাস করার পর এই ব্রত সমাপ্ত হয়। এটি এক প্রকারের চান্দ্রায়ণ। স্মৃতিগুলিতে আরও অনেক প্রকার চান্দ্রায়ণ-ব্রতের বর্ণনা আছে।

সর্বহিতকারী ধর্মের বর্ণনা, দ্বাদশী ব্রতের মাহাত্ম্য এবং যুধিষ্ঠির কর্তৃক ভগবানের স্তুতি

যুধিষ্ঠির বললেন—দেবেশ ! আপনি এবার আমাকে সমস্ত প্রাণীর হিতকারক ধর্মের বর্ণনা করুন।

ভগবান বললেন—যুধিষ্ঠির ! যে ধর্ম দরিদ্র মানুষেরও স্বর্গ ও সুখ প্রদানকারী এবং সমস্ত পাপনাশক, তার বর্ণনা করছি, শোনো। যে মানুষ এক বছর ধরে প্রত্যহ একবার আহার করে, ব্রহ্মচারী থাকে, ক্রোধকে বশে রাখে, মাটিতে শয়ন করে এবং ইন্দ্রিয়াদি বশে রাখে ; যে স্নান করে পবিত্র থাকে, বাগ্র হয় না, সত্যভাষণ করে, কারো দোষ দেখে না এবং আমাতে চিত্ত একাগ্র করে সর্বদা আমার পূজায় নিমগ্ন থাকে ; যে উভয় সন্ধ্যাকালে একাগ্র চিত্তে আমার সঙ্গে সম্বন্ধিত গায়ত্রী জপ করে, **'নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়'** বলে সর্বদা আমাকে প্রণাম করে, ব্রাহ্মণদের আহার করাবার পরে নিজে মৌন হয়ে ভিক্ষান্ন ভোজন করে এবং **'নমোঽস্তু বাসুদেবায়'** বলে ব্রাহ্মণদের চরণে প্রণাম করে ; যে প্রত্যেক মাসের শেষে পবিত্র ব্রাহ্মণদের আহার করায় এবং এক বছর ধরে এই নিয়ম পালন করে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণারূপে মাখন অথবা তিলের গাভী দান করে, ব্রাহ্মণের হাত থেকে স্বর্ণযুক্ত জল নিয়ে নিজ শরীরে ছেটায়, তার জেনে অথবা না জেনে করা দশ জন্মের পাপ তৎক্ষণাৎ বিনাশপ্রাপ্ত হয়—এ কথায় বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

যুধিষ্ঠির বললেন—প্রভু ! সর্বপ্রকার উপবাসের মধ্যে যা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, মহান ফলদাতা এবং কল্যাণের সর্বোত্তম সাধন, কৃপা করে তার বর্ণনা করুন।

ভগবান বললেন—রাজন্ ! যে ব্রত আমারও অত্যন্ত প্রিয়, তার বর্ণনা করছি, শোনো। যে ব্যক্তি স্নানাদির দ্বারা পবিত্র হয়ে পঞ্চমীর দিন ভক্তিপূর্বক উপবাস করে এবং তিন সন্ধ্যা আমার পূজায় সংলগ্ন থাকে, সে সমস্ত যজ্ঞের ফল লাভ করে আমার পরমধামে প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ণিমা ও অমাবস্যা—এই দুটি পর্ব, দুটি পক্ষের দ্বাদশী এবং শ্রবণ নক্ষত্রযুক্ত দ্বাদশী—এই পাঁচটি তিথিকে আমার পঞ্চমী বলা হয়। এগুলি আমার বিশেষ প্রিয়, সুতরাং শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের উচিত যে তাঁরা আমার প্রিয় কাজ করার জন্য আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট করে এই তিথিগুলিতে যেন উপবাস করেন। যাঁরা সবগুলিতে উপবাস করতে না পারেন, তাঁরা শুধু দ্বাদশীতেই যেন উপবাস করেন ; এতে আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হই। যিনি অগ্রহায়ণ মাসের দ্বাদশীতে দিন-রাত উপবাস করে 'কেশব' নামে আমার পূজা করেন, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করেন। যিনি পৌষ মাসের দ্বাদশী তিথিতে উপবাস করে 'নারায়ণ' নামে আমার পূজা করেন, তিনি বাজিমেধ-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন। যিনি মাঘের দ্বাদশীতে উপবাস করে 'মাধব' নামে আমার পূজা করেন, তিনি রাজসূয় যজ্ঞের ফল পান। ফাল্গুন মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করে যিনি 'গোবিন্দ' নামে আমার অর্চনা করেন, তিনি অতিরাত্র যাগের ফল প্রাপ্ত হন। চৈত্র মাসের দ্বাদশী তিথিতে ব্রত ধারণ করে যিনি 'বিষ্ণু' নামে আমার পূজা করেন, তিনি পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফলভাগী হন। বৈশাখের দ্বাদশীতে উপবাস করে 'মধুসূদন' নামে আমার পূজা করলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করে 'ত্রিবিক্রম' নামে আমার পূজা করেন, তিনি গোমেধ ফলের ভাগী হন। আষাঢ়-মাসের দ্বাদশীতে ব্রত রেখে 'বামন' নামে আমার পূজনকারী ব্যক্তি নরমেধ যজ্ঞের ফললাভ করেন। শ্রাবণ মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করে যিনি 'শ্রীধর' নামে আমার পূজা করেন, তিনি পঞ্চ-যজ্ঞের ফল পান। ভাদ্র মাসের দ্বাদশী তিথিতে উপবাস করে 'হৃষীকেশ' নামে আমার অর্চনাকারী সৌত্রামণি যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন। আশ্বিনের দ্বাদশীতে উপবাস করে যিনি 'পদ্মনাভ' নামে আমার অর্চনা করেন, তিনি এক সহস্র গো-দানের ফল লাভ করেন। কার্তিক মাসের দ্বাদশী তিথিতে ব্রত রেখে যিনি 'দামোদর' নামে আমার পূজা করেন, তিনি সমস্ত যজ্ঞের ফল লাভ করেন। যিনি দ্বাদশীতে শুধুমাত্র উপবাস করেন, তিনি পূর্বোক্ত ফলের অর্ধেক প্রাপ্ত করেন। উপরিউক্তভাবে প্রতিমাসে আলস্য ত্যাগ করে আমার পূজা করতে করতে এক বৎসর পূর্ণ হলে পুনরায় দ্বিতীয় বৎসরেও মাসের পূজা আরম্ভ করবে। এইভাবে তৎপরতার সঙ্গে যে ভক্ত বিনা বাধায় আমার আরাধনায় তৎপর থাকে, সে আমার স্বরূপ লাভ করে। যে ব্যক্তি দ্বাদশী তিথিতে প্রেমপূর্বক আমার এবং বেদসংহিতার পূজা করেন, তিনি নিঃসন্দেহে পূর্বোক্ত ফল লাভ করেন। যিনি দ্বাদশী তিথিতে আমাকে চন্দন, পুষ্প, ফল, জল, পত্র বা মূল অর্পণ করেন, তাঁর মতো

প্রিয়ভক্ত আমার আর কেউ নয়। যুধিষ্ঠির ! ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতা উপরিউক্ত বিধিতে আমার ভজনা করায় আজ স্বর্গীয় সুখ ভোগ করছেন।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ উপদেশ প্রদান করায় রাজা যুধিষ্ঠির করজোড়ে ভক্তিসহকারে তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন—'হৃষীকেশ ! আপনি সম্পূর্ণ জগতের প্রভু এবং দেবতাদেরও ঈশ্বর, আপনাকে প্রণাম। সহস্র সহস্র নেত্র ধারণকারী পরমেশ্বর ! আপনার সহস্র সহস্র মস্তক, আপনাকে আমি প্রণাম করি। বেদত্রয় আপনার স্বরূপ, তিন বেদের আপনি অধীশ্বর, বেদত্রয়ের দ্বারা আপনারই স্তুতি করা হয়েছে ; আপনাকে বারংবার প্রণাম। আপনি চতুর্বাহুধারী, বিশ্বরূপ, জগতের অধীশ্বর এবং সমস্ত জগতের আবাসস্থল, আপনাকে প্রণাম। নরসিংহ ! আপনিই এই জগতের সৃষ্টি এবং সংহারকারী, আপনাকে নমস্কার। ভক্তদের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ ! আপনাকে বারংবার প্রণাম। ভক্তবৎসল ! আপনি সমস্ত জগৎ চরাচর ও যোগীদের প্রিয়, যোগিগণের স্বামী। আপনিই হয়গ্রীব অবতার রূপ ধারণ করেছিলেন। চক্রপাণে ! আপনাকে বারংবার প্রণাম জানাই।'

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যখন ভক্তিগদগদ হয়ে ভগবানের স্তুতি করতে লাগলেন তখন ভগবান প্রসন্ন হয়ে ধর্মরাজের হাত ধরে তাঁকে বাধাপ্রদান করে বললেন—'রাজন্ ! এ কী ? তুমি কেন আমার স্তুতি করছ ? এসব বন্ধ করে আগের মতোই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো।'

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—প্রভু ! কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশীতে কীভাবে আপনার পূজা করা উচিত ? এই ধর্মযুক্ত বিষয় বর্ণনা করুন।

ভগবান বললেন—রাজন্ ! আমি আগের মতোই তোমার সকল প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি, শোনো ! কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশীতে আমার পূজা করলে বহু বড় ফল লাভ হয়। একাদশীতে উপবাস করে দ্বাদশীতে আমার পূজা করা উচিত। সেই দিন ভক্তিযুক্ত চিত্তে ব্রাহ্মণদেরও পূজা করা উচিত। এরূপ করলে মানুষ দক্ষিণামূর্তিকে অথবা আমাকে প্রাপ্ত করে।

বিষুব যোগ এবং গ্রহণ ইত্যাদিতে দানের মহিমা, অশ্বত্থ বৃক্ষের মহত্ত্ব, তীর্থের গুণাদির প্রশংসা ও উত্তম প্রায়শ্চিত্ত

বৈশম্পায়ন বললেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ উপদেশ দেওয়ায় রাজা যুধিষ্ঠির পুনরায় দানের সময় এবং তার বিশেষ বিধি বিষয়ে প্রশ্ন করলেন—মাধব ! বিষুব যোগে ও সূর্যগ্রহণ-চন্দ্রগ্রহণের সময় দান করলে কী ফল পাওয়া যায়, কৃপা করে তা বলুন।

ভগবান বললেন—রাজন্ ! বিষুবযোগে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সময় এবং ব্যতীপাত যোগে যে দান করা হয়, তা অক্ষয়ফল প্রদানকারী হয় ; সেই বিষয়ে বর্ণনা করছি, শোনো। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের মধ্যভাগে যখন রাত ও দিন সমান হয়, তাকে 'বিষুব যোগ' বলা হয়। সেই দিন সন্ধ্যার সময় আমি, ব্রহ্মা এবং মহাদেব ক্রিয়া, করণ এবং কার্যাদির ঐক্য বিচার করার জন্য একবার একত্রিত হই। যে মুহূর্তে আমরা মিলিত হই, তা পরম পবিত্র এবং বিষুবপর্ব নামে প্রসিদ্ধ ; তাকে অক্ষরব্রহ্ম বা পরব্রহ্মও বলা হয়। সেই মুহূর্তে সকলেই পরম পদের চিন্তা করে। দেবতা, বসু, রুদ্র, পিতৃপুরুষ, অশ্বিনীকুমার, সাধ্যগণ, বিশ্বদেব, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, সোম ইত্যাদি গ্রহ, নদী, সমুদ্র, মরুৎ, অপ্সরা, নাগ, যক্ষ, রাক্ষস ও গুহ্যক—এরা এবং অন্য দেবতাও বিষুবপর্বে ইন্দ্রিয়সংযম পূর্বক উপবাস করেন এবং যত্নপূর্বক পরমাত্মার ধ্যানে ব্যাপৃত থাকেন। তাই যুধিষ্ঠির ! তুমি অন্ন, গাভী, তিল, ভূমি, কন্যা, ঘর, বিশ্রামস্থান, ধন, বাহন, শয্যা এবং আরও যেসব বস্তু দানের যোগ্য বলা হয়েছে, সেসব বিষুবপর্বে দান করো। সেই সময় বিশেষভাবে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদের যে দান করা হয়, তা কখনোই বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, তা প্রতিদিন বৃদ্ধি পেতে পেতে কোটি গুণ হয়ে ওঠে।

আকাশে যখন সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয়, সেই সময় যে ব্যক্তি আমার অথবা ভগবান শংকরের নিমিত্ত গায়ত্রী জপ করেন এবং ভক্তি সহকারে শঙ্খ বা অন্য বাদ্যযন্ত্র বাজান, তাঁর পুণ্যফলের বর্ণনা শোনো। আমার সামনে স্তুতি, হোম,

জপ করলে বা আমার উত্তম নাম জপ করলে রাহু দুর্বল এবং চন্দ্র বলবান হয়। সূর্য ও চন্দ্রের গ্রহণের সময় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদের যে দান করা হয়, তা হাজার গুণ হয়ে দাতার কাছে ফিরে আসে। মহাপাতক মানুষও সেই দানের দ্বারা তৎক্ষণাৎ পাপরহিত হয় এবং সুন্দর বিমানে করে চন্দ্রলোকে গমন করে, সেখানে যতদিন চাঁদ-তারা বিরাজমান থাকে ততদিন সম্মানের সঙ্গে চন্দ্রলোকে নিবাস করে। সময় শেষে জগতে এসে সে বেদ-বেদাঙ্গের পারদর্শী বিদ্বানরূপে জন্মলাভ করে।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—দেবেশ ! আপনার নিমিত্ত গায়ত্রী জপ কীভাবে করা যায় এবং তার কী ফল হয়—কৃপা করে বলুন।

ভগবান বললেন—রাজন্ ! দ্বাদশী তিথিতে, বিষুব পর্বে, চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের সময়, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের আরম্ভের দিন, শ্রবণ নক্ষত্রে ও ব্যতীপাত যোগে পীপলের ও আমার দর্শন হলে আমার গায়ত্রী অথবা অষ্টাক্ষর মন্ত্র (ওঁ নমো নারায়ণায়) জপ করা উচিত। তাহলে মানুষের পূর্বার্জিত সমস্ত পাপ নিঃসন্দেহে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—দেব ! এবার বলুন অশ্বত্থ দর্শন আপনার দর্শনের সমান বলে কেন মানা হয় ; আমি তা শোনার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত।

ভগবান বললেন—রাজন্ ! আমিই অশ্বত্থ বৃক্ষরূপে ত্রিলোক পালন করি। যেখানে অশ্বত্থ বৃক্ষ নেই, সেখানে আমার বাস নেই। যেখানে আমি থাকি, সেখানে অশ্বত্থ বৃক্ষ থাকে। যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে অশ্বত্থ বৃক্ষের পূজা করে, তার দ্বারা আমার পূজা হয় এবং যে ক্রুদ্ধ হয়ে অশ্বত্থকে প্রহার করে, সে বাস্তবে আমাকেই প্রহারের লক্ষ্য করে। তাই অশ্বত্থকে সর্বদা প্রদক্ষিণ করা উচিত, তাকে কেটে ফেলা উচিত নয়। ব্রতপালন, সরলতা, দেবতাদের সেবা, গুরু শুশ্রূষা, পিতামাতার সেবা, নিজ পত্নীকে সন্তুষ্ট রাখা, গৃহস্থ ধর্ম পালন করা, অতিথি সেবায় ব্যাপৃত থাকা, বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য পালন, আহ্বানীয় তিন প্রকার অগ্নি—এগুলি সব পরম পবিত্র সনাতন তীর্থ। এই সবের মূল ধর্ম—এরূপ জেনে এগুলিতে মন নিবিষ্ট করবে এবং তীর্থভ্রমণ করবে। কারণ ধর্ম করলে ধর্মের বৃদ্ধি হয়। তীর্থ দুই প্রকারের—স্থাবর ও জঙ্গম। স্থাবর তীর্থের থেকে জঙ্গম তীর্থ শ্রেষ্ঠ ; কারণ তাতে জ্ঞানপ্রাপ্তি হয়। ইহলোকে পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা বিশুদ্ধ ব্যক্তির হৃদয়ে সব তীর্থ বাস করে, তাই তাঁকে তীর্থস্বরূপ বলা হয়। গুরুরূপী তীর্থের দ্বারা পরমাত্মার জ্ঞান লাভ হয়, তাই তার থেকে বড় কোনো তীর্থ নেই। জ্ঞানতীর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ এবং ব্রহ্মতীর্থ সনাতন।

পাণ্ডুনন্দন ! সকল তীর্থের মধ্যে ক্ষমা সবচেয়ে বড় তীর্থ। ক্ষমাশীল মানুষের ইহলোকে ও পরলোকে সুখলাভ হয়। কেউ মান দিক অথবা অপমান, পূজা করুক বা অসম্মান, গালি দিক বা অহংকার দেখাক, এই সকল অবস্থায় যে ক্ষমাশীল হয়ে থাকে, তাকে তীর্থ বলে। ক্ষমাই যশ, দান, যজ্ঞ এবং মনোনিগ্রহ। অহিংসা, ধর্ম, ইন্দ্রিয় সংযম এবং দয়াও ক্ষমারই স্বরূপ। ক্ষমার ওপরেই সমস্ত জগৎ বিরাজমান ; সুতরাং যে ব্রাহ্মণ ক্ষমাশীল, তাঁকে দেবতা বলা হয়, তিনি সবথেকে শ্রেষ্ঠ। ক্ষমাশীল ব্যক্তি স্বর্গ, যশ ও মোক্ষলাভ করেন ; তাই ক্ষমাশীল মানুষকে সাধু বলা হয়। রাজন্ ! আত্মারূপ নদী পরম পবিত্র তীর্থ, তা সব তীর্থের প্রধান। আত্মাকে সর্বদা যজ্ঞরূপ বলে মানা হয়। স্বর্গ, মোক্ষ—সবই আত্মার অধীন। যে ব্যক্তি সদাচার পালন করে অত্যন্ত নির্মল হয়ে গেছে এবং সত্য ও ক্ষমার দ্বারা যার মধ্যে অতুলনীয় শীতলতা এসেছে—এরূপ জ্ঞানরূপ জলে প্রতিনিয়ত স্নানকারী ব্যক্তির অন্য তীর্থের কী প্রয়োজন ?

যুধিষ্ঠির বললেন—হৃষিকেশ ! এখন আমাকে এমন কোনো প্রায়শ্চিত্তের কথা বলুন, যা করা সহজ এবং যা সমস্ত পাপ বিনাশক।

ভগবান বললেন—রাজন্ ! আমি তোমাকে অত্যন্ত গোপনীয় প্রায়শ্চিত্তের কথা বলছি। অধর্মে রুচি রাখা মানুষেরা একথা শোনার যোগ্য নয়। কোনো পবিত্র ব্রাহ্মণকে সামনে দেখলে সহসা আমাকে স্মরণ করবে এবং **'নমো ব্রহ্মণ্য দেবায়'** বলে ভগবৎ বুদ্ধিতে তাঁকে প্রণাম করবে। তারপর অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করে ব্রাহ্মণ দেবতাকে পরিক্রমা করবে, এরূপ করলে ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হন এবং আমি সেই প্রণামকারী মানুষের সমস্ত পাপ বিনাশ করি। যে ব্যক্তি সূর্যগ্রহণের সময় পূর্ববাহিনী নদীর তীরে গিয়ে আমার মন্দিরের কাছে দক্ষিণাবর্ত শঙ্খের জলে অথবা কপিলা গাভীর শিংয়ের স্পর্শ করা জলে একবার স্নান করে, তার সমস্ত সঞ্চিত পাপ এক মুহূর্তে বিনাশ হয়। যে পূর্ণিমায় উপবাস করে পঞ্চগব্য পান করে, তারও সমস্ত পাপ বিনাশ হয়। এখন আমি ব্রহ্মকূর্চ এবং তার পাত্রের বর্ণনা করছি, শোনো। পলাশ বা পদ্মপাত্রে অথবা তাম্র বা স্বর্ণপাত্রে

ব্রহ্মকূর্চ রেখে পান করা উচিত। এগুলিই উপযুক্ত পাত্র। (ব্রহ্মকূর্চের বিধি হল—) গায়ত্রী মন্ত্র পড়ে গোমূত্র 'গন্ধদ্বারাং' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা গোবর, 'অপ্যায়স্ব' এই মন্ত্রে গোদুগ্ধ, 'দধিক্রাব্নঃ' এই মন্ত্রে দধি, 'তেজোঽসি শুক্রম্' এই মন্ত্রে ঘি, 'দেবস্য ত্বা' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা কুশের জল এবং 'আপো হি ষ্ঠা ময়ো' এই ঋচার দ্বারা যবের আটা নিয়ে সবকিছু মিশিয়ে দেবে এবং জ্বলন্ত অগ্নিতে ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে যথাবিহিত হোম করে প্রণব উচ্চারণ পূর্বক উপরিউক্ত বস্তুগুলি আলোড়ন ও মন্থন করবে। পরে প্রণব উচ্চারণ করে সেগুলি পাত্র থেকে হাতে নেবে এবং প্রণব পাঠ করতে করতে পান করবে। এই ভাবে ব্রহ্মকূর্চ পান করলে মানুষ অতি বড় পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। যে ব্যক্তি জলের মধ্যে বসে অথবা সূর্যের দিকে দৃষ্টি রেখে 'ভদ্রং নঃ' এই মন্ত্রের একটি চরণ বা ঋক্‌সংহিতা পাঠ করে, তার সর্বপাপ দূর হয়। যে ব্যক্তি আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট করে প্রতিদিন আমার সূক্ত (পুরুষসূক্ত) পাঠ করে, সে জলে নির্লিপ্ত পদ্ম পাত্রের ন্যায় কখনো পাপে লিপ্ত হয় না।

—— ০ ——

উত্তম এবং অধম ব্রাহ্মণের লক্ষণ ; ভক্ত, গাভী, ব্রাহ্মণ এবং অশ্বত্থের মহিমা ও ব্রাহ্মণত্ব থেকে পতনকারক কর্ম

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—দেবেশ্বর ! যাঁদের ভাব শুদ্ধ, সেই পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণ কেমন হয়ে থাকেন, ব্রাহ্মণদের নিজ কর্মে সাফল্য না পাওয়ার কারণ কী—কৃপা করে আমাকে বলুন।

ভগবান বললেন—পাণ্ডুনন্দন ! ব্রাহ্মণদের কর্ম কেন সফল হয় এবং কেন নিষ্ফল—এই সব বিষয় আমি তোমাকে ক্রমান্বয়ে বলছি, শোনো ! যদি হৃদয়ের ভাব শুদ্ধ না হয়, তাহলে ত্রিদণ্ড ধারণ, মৌন অবলম্বন, জটাধারণ, মস্তক মুণ্ডন, বল্কল বা মৃগচর্ম পরিধান, ব্রত পালন, অগ্নিতে আহুতি প্রদান, গৃহস্থ-ধর্মপালন, স্বাধ্যায়ে সংলগ্ন থাকা, নিজ স্ত্রীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা—এই সবই ব্যর্থ হয়ে যায়। যে ব্যক্তি ক্ষমাশীল, দমপালনকারী, ক্রোধরহিত, মন ও ইন্দ্রিয় বশে রাখেন, তাঁকেই আমি প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলে মনে করি। এই সকল গুণ ছাড়া যারা ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত, তাদের শূদ্র বলে মানা হয়। যাঁরা অগ্নিহোত্র, ব্রত এবং স্বাধ্যায়ে ব্যাপৃত থাকেন, পবিত্র, উপবাসকারী এবং জিতেন্দ্রিয়, সেই পুরুষদেরই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলে মানেন। শুধু জাতির দ্বারা কারোর পূজা করা হয় না, উত্তম গুণই কল্যাণকারী হয়। মনঃশুদ্ধি, ক্রিয়াশুদ্ধি, কুলশুদ্ধি, শরীরশুদ্ধি এবং বাক্‌শুদ্ধি—এই পাঁচ প্রকারের শুদ্ধি বলা হয়েছে। এই পাঁচ শুদ্ধির মধ্যে হৃদয়ের শুদ্ধি সবথেকে শ্রেষ্ঠ। হৃদয়ের শুদ্ধির দ্বারাই মানুষ স্বর্গে যেতে পারে। যে ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্র পরিত্যাগ করে ক্রয়-বিক্রয়ে মনোনিবেশ করে তাকে বর্ণসংকার প্রচারকারী শূদ্রের সমকক্ষ বলে মানা হয়। যে ব্যক্তি বৈদিক শ্রুতি পরিত্যাগ করেছে, যে জমি চাষ করে এবং নিজ বর্ণের বিরুদ্ধ কাজ করে, সেই ব্রাহ্মণকে বৃষল বলা হয়। বৃষ শব্দের অর্থ ধর্ম ; তাকে যে লয় করে, দেবতারা তাকে বৃষল বলে মানেন। সে চণ্ডালের থেকেও নীচ হয়। যে পাপাত্মা ব্যক্তি ব্রহ্মগীতা ইত্যাদি দ্বারা আমার স্তুতি না করে কোনো শূদ্রের স্তব করে, সে চণ্ডালের সমান। কুকুরের স্পর্শ করা হবিষ্য যেমন অশুদ্ধ হয়, তেমনই বৃষল মানুষের বুদ্ধিতে স্থিত বেদও দূষিত হয়ে যায়। চার বেদ, ছয় অঙ্গ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণ—এই হল চোদ্দ প্রকারের বিদ্যা। ত্রিলোকের কল্যাণের জন্য এগুলির সৃষ্টি হয়েছে, সুতরাং শূদ্রদের তা স্পর্শ করা উচিত নয়। শূদ্রের সংস্পর্শে এলে সব বস্তুই অপবিত্র হয়ে যায়। এই জগতে তিন অপবিত্র এবং পাঁচ অভেদ্য বস্তু আছে। কুকুর, শূদ্র, চণ্ডাল—এই তিনটি অপবিত্র এবং অশ্লীল গায়ক, মুরগি বধ করার জন্য পশুদের যাতে বাঁধা হয় সেই খুঁটি, রজস্বলা নারী, বৃষল জাতির স্ত্রীকে বিবাহকারী দ্বিজ—এই পাঁচটিকে অভেদ্য মানা হয়, এগুলিকে কখনো স্পর্শ করা উচিত নয়। ব্রাহ্মণ এই আটজনের মধ্যে কাউকে স্পর্শ করলে বস্ত্রসহ জলে নেমে স্নান করে নেবেন। যে ব্যক্তি আমার ভক্তদের শূদ্র জাতিতে জন্মগ্রহণ করায় অপমান করে সে কোটি বৎসর নরকে বাস করে ; সুতরাং চণ্ডালও যদি আমার ভক্ত হয়, তবে বুদ্ধিমান ব্যক্তির তাকে অপমান করা উচিত নয়। অপমান করলে অপমানকারী রৌরব নরক প্রাপ্ত হয়। যে

ব্যক্তি আমার ভক্তদের ভক্ত হয়, তাদের ওপর আমার বিশেষ প্রীতি থাকে। তাই আমার ভক্তের ভক্তদের বিশেষভাবে সম্মান করা উচিত। আমাতে চিত্ত মগ্ন হলে পশুপক্ষীও ঊর্ধ্বগতি লাভ করে, জ্ঞানীদের তো কথাই নেই। শূদ্র যদি আমার ভক্ত হয়ে পত্র-পুষ্প-ফল-জল অর্পণ করে তবে আমি তা মস্তকে ধারণ করি। যে ব্রাহ্মণ সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজমান আমার এই পরমেশ্বর রূপকে বেদোক্ত রীতিতে পূজা করেন, তিনি আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হন। যুধিষ্ঠির ! আমি আমার ভক্তদের হিতার্থেই অবতাররূপ ধারণ করি, সুতরাং আমার প্রত্যেক অবতার-বিগ্রহের পূজা করা উচিত। যে ব্যক্তি আমার অবতার-মূর্তির কোনো একটিরও ভক্তিভাবে আরাধনা করেন, আমি নিঃসন্দেহে তাঁর ওপর প্রসন্ন হই। ক্রমশ মাটি, তাম্র, রৌপ্য, স্বর্ণ, মণি বা রত্নের মূর্তি তৈরি করে আমার পূজা করা উচিত। এইরূপ মূর্তি পূজাকে দশগুণ অধিক পুণ্য বলে জানবে। যদি ব্রাহ্মণের বিদ্যার, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধজয়ের, বৈশ্যের অর্থের এবং শূদ্রের সুখরূপ ফল ও নারীগণের সর্বপ্রকার কামনা থাকে, তাহলে আমার আরাধনার দ্বারা এদের সর্বপ্রকার মনোরথ পূর্ণ হয়।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—দেবেশ্বর ! আপনি কীরূপ শূদ্রের পূজা গ্রহণ করেন না ?

ভগবান বললেন—রাজন্ ! যে ব্রতপালনকারী অথচ আমার ভক্ত নয়, সেই শূদ্রকৃত পূজা আমি গ্রহণ করি না। গো, ব্রাহ্মণ, অশ্বত্থ বৃক্ষ—এই তিনটি দেবরূপ ; এগুলিকে আমার ও ভগবান শংকরের স্বরূপ বলে জানবে। আমার ভক্তরা এই তিনটিকে কখনো অপমান করবে না, কারণ এরা মানুষের সাতপুরুষকে নরকে প্রেরণ করে। যুধিষ্ঠির ! আমার স্বরূপ হওয়ায় এরা মানুষের উদ্ধারকারী হয়, অতএব তুমি যত্নসহকারে এদের পূজা করো।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—মাধব ! মানুষ ব্রাহ্মণ-শরীরে কীভাবে শূদ্র হয় ? তার ব্রাহ্মণত্ব কীভাবে বিনষ্ট হয়—কৃপা করে তা বলুন।

ভগবান বললেন—রাজন্ ! যে দ্বাদশ বৎসর শুধু কূপের জলে স্নান করে এবং তত বৎসর ধরে রাজার আশ্রয়ে থেকে জীবিকা-নির্বাহ করে, সেই ব্রাহ্মণ বেদপারঙ্গম বিদ্বান হলেও শূদ্রভাব প্রাপ্ত হয়। যে কোনো নগরে বা শহরতলিতে একাদিক্রমে দ্বাদশ বৎসর বাস করে, সেই ব্রাহ্মণ নিঃসন্দেহে শূদ্র হয়ে যায়। যে ব্রাহ্মণ কামমোহিত হয়ে শূদ্র নারীর গর্ভে সন্তানের জন্ম দেয়, তার ব্রাহ্মণত্ব তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। যুধিষ্ঠির ! যারা দুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে উপরোক্ত পথে চলে তা নাশ করে, তাদের জন্য আমার অত্যন্ত দুঃখ হয় ; তাই যে ব্রাহ্মণ আমাতে প্রীতি রাখে, তাকে যত্নশীল হতে হবে, যাতে তার ধর্মবিরুদ্ধ কর্মের দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব ভ্রষ্ট না হয়ে যায়।

ভগবানের উপদেশের উপসংহার এবং দ্বারকাগমন

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—দেবেশ্বর ! কোনো ব্রাহ্মণ যদি অন্যত্র গমন করেন এবং কালের প্রেরণায় সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়, তাহলে তাঁর অন্ত্যেষ্টি সংস্কার কীভাবে সম্ভব হবে ?

ভগবান বললেন—রাজন্ ! কোনো অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের যদি এইভাবে মৃত্যু হয়, তাহলে প্রেতকল্পের নির্দেশানুসারে তার কাঠের মূর্তি তৈরি করতে হবে, সেটি পলাশ কাঠ হওয়া চাই। মানুষের দেহে তিনশত ষাটটি অস্থি আছে। শাস্ত্ররীতিতে সেই সব কল্পনা করে সেই মূর্তি দাহ করা উচিত।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—প্রভু ! যে সকল ভক্ত তীর্থযাত্রা করতে অক্ষম, তাদের ত্রাণ করার জন্য কোনো বিশেষ তীর্থের ধর্মানুসারে বর্ণনা করুন।

ভগবান বললেন—রাজন্ ! সামবেদ গান করেন যেসব বিদ্বান তাঁরা বলেন যে, সত্য সব তীর্থকে পবিত্র করে। সত্য কথা বলা এবং কোনো জীবকে হিংসা না করা—একেই তীর্থ বলা হয়। তপ, দয়া, শীল, স্বল্পে সন্তুষ্ট থাকা—এই সকল সদ্‌গুণও তীর্থস্বরূপ। পতিব্রতা নারী, সন্তোষযুক্ত ব্রাহ্মণ এবং জ্ঞানকেও তীর্থ বলা হয়। আমার এবং শংকরের ভক্ত, সন্ন্যাসী, বিদ্বান এবং অন্যকে শরণপ্রদানকারী পুরুষও তীর্থ। জীবেদের অভয়প্রদান করাকেও তীর্থ বলা হয়। ত্রিলোকে আমি উদ্বেগশূন্য। দিন বা রাত, আমার কাছে সব সমান। দেবতা, দৈত্য বা রাক্ষস থেকেও আমি ভয় পাই না। কিন্তু যে শূদ্র বেদ উচ্চারণ করে,

তাতে আমার সর্বদা চিন্তা হয়ে থাকে। তাই শূদ্রদের আমার নামও প্রণবের সঙ্গে উচ্চারণ করা উচিত নয়। কারণ বেদবেত্তা এই জগতে প্রণবকেই সর্বোৎকৃষ্ট বেদ বলে মানেন। শূদ্র আমাতে ভক্তি বজায় রেখে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের সেবা করবে—এটিই তাদের পরম ধর্ম। দ্বিজদের সেবাদ্বারাই তারা পরম কল্যাণের ভাগী হয়। এছাড়া এদের উদ্ধারের অন্য কোনো উপায় নেই। রাগ, দ্বেষ, মোহ, কঠোরতা, ক্রূরতা, শঠতা, বেশিদিন শত্রুতা রাখা, অধিক অভিমান, সরলতার অভাব, মিথ্যা বলা ,নিন্দা করা, অত্যন্ত লোভ করা, হিংসা, চুরি, মিথ্যা, অপবাদ দেওয়া, ক্রোধ, লোভ, মূর্খতা, নাস্তিকতা, ভয়, আলস্য, অপবিত্রতা, কৃতঘ্নতা, দম্ভ, জড়তা, কপট ও অজ্ঞান—শূদ্রের শরীরে জন্মাতেই এই সমস্ত দুর্গুণ প্রবেশ করে। ব্রহ্মা শূদ্রকে সৃষ্টি করে তাকে দ্বিজদের সেবারূপ কর্মের উপদেশ দিয়েছিলেন। দ্বিজকে ভক্তি করলে শূদ্রের তামসভাব নষ্ট হয়ে যায়। শূদ্রও যদি ভক্তিপূর্বক আমাকে পত্র-পুষ্প-ফল-জল অর্পণ করে তাহলে আমি তার ভক্তিসহ প্রদত্ত উপহার সাদরে মস্তকে ধারণ করি। সমস্ত পাপযুক্ত হয়েও যদি কোনো ব্রাহ্মণ সর্বদা আমার ধ্যান করতে থাকে, তাহলে সে সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি লাভ করে। বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন এবং বেদপারঙ্গম বিদ্বান হয়েও যে ব্রাহ্মণ আমাকে ভক্তি করে না, সে চণ্ডালের সমান। যে দ্বিজ আমার ভক্ত নয় ; তার দান, তপ, যজ্ঞ, হোম এবং অতিথি সৎকার—সবই বৃথা।

পাণ্ডুনন্দন ! মানুষ যখন সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম প্রাণীদের এবং মিত্র ও শত্রুর মধ্যে সমদৃষ্টি করে, তখন সে আমার সত্যকার ভক্ত হয়ে ওঠে। ক্রূরতার অভাব, অহিংসা, সত্য, সরলতা, কোনো প্রাণীকে হিংসা না করা—এগুলি আমার ভক্তদের ব্রত। যে ব্যক্তি আমার ভক্তকে শ্রদ্ধাপূর্বক নমস্কার করে, সে যদি চণ্ডালও হয়, তাহলেও সে অক্ষয় লোক লাভ করে। ধর্মরাজ ! যারা আমার ভক্ত, যাদের প্রাণ আমাতেই সংলগ্ন, যারা সর্বদা আমারই নাম ও গুণাদি কীর্তন করে, তারা যদি লক্ষ্মীসহ আমারই পূজা করে, তবে তাদের সদ্গতির বিষয়ে আর কী চিন্তা থাকে ? বহুবৎসর ধরে তপস্যাকারী মানুষও সেই পদ লাভ করতে পারে না, যা আমার ভক্ত অনায়াসে প্রাপ্ত হয়। তাই রাজেন্দ্র ! তুমি সর্বদা সতর্ক থেকে নিরন্তর আমারই ধ্যান করতে থাকো ; তাহলেই তুমি সিদ্ধিলাভ করবে এবং পরম পদ সাক্ষাৎ করতে পারবে। যারা বৃথা বাক্যব্যয় করে, তারা আমার ভক্ত নয়, তারা শূদ্র ; কিন্তু যারা আমার ভক্ত, তারা জন্মসূত্রে শূদ্র হলেও প্রকৃতপক্ষে শূদ্র নয়। ভগবদ্ভক্তকে ব্রাহ্মণেরই সমান বলে মানা হয়। যে দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের জ্ঞাতা এবং নিরন্তর পঞ্চযাম সেবাবিধি জানে, সেই উত্তম ভক্ত। যে ব্যক্তি হোতা হয়ে ঋগ্বেদের দ্বারা, অধ্বর্যু হয়ে যজুর্বেদের দ্বারা, উদ্গাতা হয়ে পরম পবিত্র সামবেদের দ্বারা ও অথর্ববেদীয় দ্বিজরূপে অথর্ববেদের দ্বারা সবসময় আমার স্তুতি করে, তাকে ভগবদ্ভক্ত বলে মানা হয়। যজ্ঞ বেদাদির অধীন এবং দেবতা যজ্ঞ ও ব্রাহ্মণাদির অধীন হয়, তাই ব্রাহ্মণ দেবতা।

কারো সাহায্য ব্যতীত কেউ উচ্চে আরোহণ করতে পারে না, তাই সকলেরই কোনো প্রধান আশ্রয়ের সাহায্য প্রয়োজন হয়। দেবতারা ভগবান রুদ্রের আশ্রয়ে থাকেন, রুদ্র ব্রহ্মার আশ্রিত এবং ব্রহ্মা আমার আশ্রয়ে থাকেন : কিন্তু আমি কারো আশ্রিত নই। আমার কোনো আশ্রয় নেই। আমিই সকলের আশ্রয়। রাজন্ ! আমি তোমাকে এই উত্তম রহস্যের কথা জানালাম ; কারণ তুমি ধার্মিক। এবার তুমি এই উপদেশানুসারেই কর্ম পালন করো। এই পবিত্র কাহিনী পুণ্যদায়ক এবং বেদের সমান মান্য। যে আমার দ্বারা কথিত এই বৈষ্ণব ধর্ম প্রত্যহ পাঠ করবে, তার ধর্ম বৃদ্ধি হবে এবং বুদ্ধি নির্মল হবে। সেই সঙ্গে তার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়ে পরম কল্যাণের বিস্তার হবে। এই প্রসঙ্গ পরম পবিত্র, পুণ্যদায়ক, পাপনাশক এবং অত্যন্ত উৎকৃষ্ট। সকল মানুষের, বিশেষত শ্রোত্রিয় দ্বিজদের এটি শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রবণ করা উচিত। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক এটি শোনায় এবং যে পবিত্রচিত্তে এটি শোনে, তারা অবশ্যই আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। আমার ভক্তিতে তৎপর থেকে যে ভক্তপুরুষ শ্রাদ্ধে এই ধর্ম শ্রবণ করে, তার পিতৃপুরুষ ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়কাল পর্যন্ত সর্বদা তৃপ্ত থাকেন।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপ, জগদ্গুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখে ভাগবত-ধর্ম শ্রবণ করে এই অসাধারণ প্রসঙ্গ চিন্তা করতে করতে ঋষি ও পাণ্ডবগণ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং সকলে ভগবানকে প্রণাম করলেন। ধর্মনন্দন যুধিষ্ঠির বারংবার গোবিন্দকে পূজা করলেন। দেবতা, মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, ঋষি, মহাত্মা, গুহ্যক, সর্প, মহাত্মা বালখিল্য, তত্ত্বদর্শী যোগী, ভগবদ্ভক্ত পুরুষ—যারা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে উপদেশ শুনতে পদার্পণ করেছিলেন, এই পরম পবিত্র

বৈষ্ণব ধর্মের উপদেশ শুনতে শুনতে নিষ্পাপ এবং পবিত্র হয়ে গেলেন। সকলের মধ্যে ভগবদ্‌ভক্তির বিকাশ হল। তখন সকলে ভগবানের শ্রীচরণে মাথা রেখে প্রণাম করে তাঁর উপদেশের প্রশংসা করে বললেন—'দেবেশ্বর ! এবার পুনরায় আমরা দ্বারকায় আপনাকে, জগদ্‌গুরুকে দর্শন করব।' এই কথা বলে সকল ঋষি প্রসন্নচিত্তে দেবতাদের সঙ্গে নিজ নিজ স্থানে গমন করলেন। তাঁরা চলে গেলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকির সঙ্গে দারুককে স্মরণ করলেন। সারথি দারুক কাছেই বসেছিলেন, তিনি নিবেদন করলেন—'প্রভু ! রথ প্রস্তুত, পদার্পণ করুন।' তাঁর কথা শুনে পাণ্ডবেরা অত্যন্ত বিষণ্ণ হলেন। তাঁরা হাত জোড় করে সাশ্রুপূর্ণ নয়নে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের দিকে অপলকে তাকিয়ে রইলেন, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখবোধ হওয়ায় কথা প্রকাশ করতে পারলেন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও তাঁদের অবস্থা দেখে দুঃখিত হলেন। তিনি কুন্তী, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, বিদুর, দ্রৌপদী, মহর্ষি ব্যাস এবং অন্যান্য ঋষি ও মন্ত্রীদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে সুভদ্রা ও পুত্রসহ উত্তরার পিঠে

হাত রেখে তাঁদের আশীর্বাদ জানালেন। তারপর তিনি রাজভবন থেকে বাইরে এলেন এবং শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প এবং বলাহক নামক ঘোড়া সংবলিত রথে গিয়ে উঠলেন। সেই সময় কুরুদেশের রাজা যুধিষ্ঠির বিহ্বল চিত্তে তাঁর রথে গিয়ে উঠলেন এবং সাত্যকিকে তাঁর স্থান থেকে সরিয়ে ঘোড়ার রাশ নিজ হাতে নিলেন। তখন অর্জুনও রথে উঠে স্বর্ণদণ্ডযুক্ত বিশাল চামর হাতে নিয়ে ডান দিক থেকে ভগবানের মস্তকে হাওয়া করতে লাগলেন। সেইসময় মহাবলী ভীমসেনও রথে গিয়ে উঠলেন এবং ভগবানের ওপর ছাতা ধরে দাঁড়ালেন। সেই ছত্র দিব্য জ্যোতিসম্পন্ন। তার দণ্ডটি বৈদূর্যমণি মণ্ডিত এবং ছাতাটি স্বর্ণ ঝালরে শোভিত। নকুল এবং সহদেবও হাতে শ্বেত চামর নিয়ে রথে গিয়ে উঠলেন। এইভাবে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব সকলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অনুসরণ করতে লাগলেন। তিন যোজন (অর্থাৎ চব্বিশ মাইল) যাওয়ার পর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চরণে আশ্রিত পাণ্ডবদের আলিঙ্গন করে বিদায় গ্রহণ করলেন এবং দ্বারকার দিকে রওনা হলেন। এইভাবে ভগবানকে প্রণাম করে যখন তাঁরা গৃহে ফিরে এলেন তখন সর্বদা ধর্মে তৎপর থেকে কপিলা গাভী দান করতে লাগলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করে তাঁরা বারংবার মনকে সান্ত্বনা দিতেন। ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির ধ্যানদ্বারা ভগবানকে নিজ হৃদয়ে স্থাপন করে তাঁর স্মরণে মগ্ন থাকতেন, তাঁকে স্মরণ করতেন এবং যোগযুক্ত হয়ে ভগবানের যজন করে তাঁর পরায়ণ হয়ে গেলেন। জনমেজয় ! এইভাবে প্রাচীন বৈষ্ণব ধর্মের উপদেশ আমি তোমাকে শোনালাম। এটি পরম পবিত্র এবং পাপনাশকারী। ভগবান বিষ্ণুর বলা এই ধর্ম তুমি নিরন্তর শ্রবণ করতে থাকো। এর দ্বারা তুমি বিষ্ণুর পরম ধামে যেতে সক্ষম হবে। তাঁকে লাভ করার আর অন্য কোনো উপায় নেই।

॥ আশ্বমেধিকপর্ব সমাপ্ত ॥

আশ্রমবাসিকপর্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর সখা অর্জুন, তাঁর লীলা প্রকাশকারিণী ভগবতী সরস্বতী এবং তাঁর প্রবক্তা ভগবান ব্যাসকে নমস্কার করে অধর্ম ও অশুভ শক্তির পরাভবকারী চিত্তশুদ্ধিকারী মহাভারত গ্রন্থের পাঠ করা উচিত।

কুন্তী, অন্যান্য নারীগণ ও ভ্রাতাসহ রাজা যুধিষ্ঠিরের ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর অনুকূল আচরণ

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্মন্ ! আমার প্রপিতামহ মহাত্মা পাণ্ডবগণ রাজ্যে অধিকার লাভ করে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে কেমন আচরণ করতেন ? রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁর মন্ত্রী ও পুত্রদের মৃত্যুতে নিরাশ্রয় হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর ঐশ্বর্য অপহৃত হয়েছিল ; সেই অবস্থায় তিনি এবং তাঁর যশস্বিনী পত্নী গান্ধারী দেবী কীভাবে জীবন কাটাতেন ? আমার প্রপিতামহ কতদিন রাজ্য উপভোগ করেছিলেন ? কৃপা করে সেসব কথা আমাকে বলুন।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! মহাত্মা পাণ্ডবগণ রাজ্যলাভ করে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকেই শিরোমণি করে পৃথিবী পালন করতে লাগলেন। বিদুর, সঞ্জয় এবং যুযুৎসু—এঁরা সর্বদা ধৃতরাষ্ট্রের সেবায় উপস্থিত থাকতেন এবং পাণ্ডবরাও প্রত্যেক কাজে তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তাঁরা পনেরো বছর ধরে ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশানুসারেই সব কাজ করেছিলেন। বীর পাণ্ডবরা প্রত্যহ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে তাঁর চরণে প্রণাম জানিয়ে কিছুক্ষণ তাঁর সেবার জন্য কাছে বসতেন। ধৃতরাষ্ট্রও স্নেহবশত তাঁদের মস্তক আঘ্রাণ করে তাঁদের নিত্যকর্মের অনুমতি দিলে তারপর তাঁরা নিজ নিজ কাজে যেতেন। কুন্তীও সর্বদা গান্ধারীর সেবায় ব্যাপৃত থাকতেন। দ্রৌপদী, সুভদ্রা এবং পাণ্ডবদের অন্য পত্নীরাও কুন্তী ও গান্ধারী—উভয় শ্বশ্রূমাতাকে সমানভাবে সেবা করতেন। রাজা যুধিষ্ঠির বহুমূল্য শয্যা, বস্ত্র-অলংকার এবং রাজার ব্যবহারযোগ্য সর্বপ্রকার উত্তম বস্তু, ভোজ্য পদার্থ ধৃতরাষ্ট্রের ব্যবহারের জন্য তাঁকে সমর্পণ করতেন। কুন্তীদেবী গান্ধারীকে নিজ শ্বশ্রূমাতার মতো পরিচর্যা করতেন। মহান ধনুর্ধর কৃপাচার্য সেইসময় ধৃতরাষ্ট্রের

কাছেই থাকতেন। ভগবান ব্যাসদেবও প্রত্যহ তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে প্রাচীন ঋষি, দেবর্ষি, পিতৃপুরুষ এবং রাক্ষসের কাহিনী শোনাতেন। ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশে ধর্ম ও ব্যবহারিক সমস্ত কার্য বিদুরই দেখাশোনা করতেন। তাঁর সুনীতির প্রভাবে রাজার বহুপ্রকার প্রিয় কার্য সামান্য ব্যয়েই সামন্তের (অধীন ভূপতি) দ্বারা সম্পন্ন হয়ে যেত। তাঁরা বন্দিদের বন্দিদশা থেকে মুক্তিপ্রদান করতেন এবং বধের যোগ্য মানুষদেরও প্রাণ দান করে মুক্ত করে দিতেন। রাজা যুধিষ্ঠির সেসব নিয়ে তাঁদের কখনো কোনো কথা বলতেন না। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সেবায় আগের মতোই রন্ধনকার্যে নিপুণ আরালিক[১], সূপকার[২] ও রাগখাণ্ডবিক[৩] উপস্থিত থাকত। পাণ্ডবরা তাদের বহুমূল্য বস্ত্র এবং নানা প্রকার অলংকার উপহার দিতেন। পানের জন্য মিষ্ট শরবৎ এবং নানাস্বাদের খাবার দিতেন। বিভিন্ন দেশের যেসব রাজা সেখানে আসতেন তাঁরা পূর্বের মতোই রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সেবাতেই উপস্থিত হতেন। কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, নাগকন্যা উলূপী, দেবী চিত্রাঙ্গদা, ধৃষ্টকেতুর ভগ্নী ও জরাসন্ধের পুত্রি—এঁরা সকলে এবং অন্যান্য নারীগণ দাসীর ন্যায় গান্ধারীর সেবায় ব্যাপৃত থাকতেন। রাজা যুধিষ্ঠির প্রত্যহ তাঁর ভ্রাতাদের শিক্ষাপ্রদান করতেন যে, 'ধৃতরাষ্ট্রের নিজ সন্তানগণ স্বর্গারোহণ করেছেন, তোমরা কখনো এমন ব্যবহার কোরো না, যাতে তাঁর মনে একটুও আঘাত অনুভূত হয়।' ধর্মরাজের এই অর্থপূর্ণ কথা শুনে ভীমসেন ব্যতীত অন্য ভ্রাতারা তাঁর নির্দেশ বিশেষভাবে পালন করতেন। বীরবর ভীমসেন কখনো ভুলতে পারেননি—পাশা খেলার সময় যে অনর্থ হয়েছিল, তা ধৃতরাষ্ট্রের মন্দবুদ্ধিরই পরিণাম।

এইভাবে পাণ্ডবদের দ্বারা সম্মানিত হয়ে অম্বিকানন্দন রাজা ধৃতরাষ্ট্র আগের মতোই ঋষিদের সঙ্গে সুখে সময় কাটাতে লাগলেন। তিনি ব্রাহ্মণদের দানের যোগ্য শ্রেষ্ঠবস্তু দান করতেন, কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির তাঁর সর্বকার্যে সহযোগিতা করতেন। যুধিষ্ঠিরের মধ্যে ক্রূরতার লেশমাত্র ছিল না। তিনি সর্বদা প্রসন্ন থাকতেন এবং নিজ ভ্রাতা ও মন্ত্রীদের বলতেন—'রাজা ধৃতরাষ্ট্র আমার এবং আপনাদের মাননীয়, যে তাঁর আদেশ পালন করবে, সে আমার সুহৃদ আর যে তাঁর বিপরীত আচরণ করবে, সে আমার দণ্ডের ভাগী হবে।' পিতা-পিতামহদের মৃত্যু তিথি এলে এবং পুত্র ও হিতৈষীদের শ্রাদ্ধকার্যে মহামনা রাজা ধৃতরাষ্ট্র যত ধন ব্যয় করতে চাইতেন, তাই করতেন। তিনি পূজনীয় ব্রাহ্মণদের যোগ্যতা অনুসারে বহু ধন দিতেন এবং যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব তাঁর প্রিয় কাজ করার ইচ্ছায় সব কাজে তাঁকে সাহায্য করতেন। তাঁরা সবসময় চিন্তা করতেন যে পুত্র-পৌত্রদের মৃত্যুতে দুঃখিত বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র আমাদের দিক থেকে কোনো আঘাত পেয়ে যেন শোকে প্রাণত্যাগ না করেন ! তাঁর পুত্রদের জীবিতকালে তিনি যত সুখ ও ভোগ লাভ করেছিলেন—সেসব যেন এখনও পূর্ণভাবে উপভোগ করেন। পাণ্ডবেরা তার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এইভাবে শীল ও সদাচার যুক্ত হয়ে যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভ্রাতাগণ ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশের অপেক্ষায় থাকতেন। ধৃতরাষ্ট্রও তাঁদের পরম বিনীত, তাঁর নির্দেশানুসারে চালিত এবং শিষ্যভাবে সেবায় ব্যাপৃত দেখে, পিতার ন্যায় তাঁদের স্নেহ করতেন। গান্ধারী দেবীও তাঁর পুত্রদের জন্য নানা শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে, ব্রাহ্মণদের ইচ্ছানুসারে ধন দান করে পুত্রশোকের ভার মুক্ত হয়ে যান।

ধর্মাত্মাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির এইভাবে তাঁর ভ্রাতাসহ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আদর-আপ্যায়নে ব্যাপৃত থাকলেন। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের এমন কোনো আচরণ দেখেননি, যা তাঁর অপ্রিয়। পাণ্ডবদের সদাচার দেখে অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের ওপর প্রসন্ন ছিলেন এবং রাজা সুবলের কন্যা গান্ধারী দেবীও তাঁদের নিজ পুত্রের ন্যায় স্নেহ করতেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র অথবা তপস্বিনী গান্ধারী দেবী ছোট বড় যে কোনো কাজের কথা বলতেন, তাঁদের আদেশ শিরোধার্য করে যুধিষ্ঠির সেই সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ করতেন। এতে রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁর ওপর অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন এবং নিজ পুত্র দুর্যোধনের কথা স্মরণ করে অনুতাপ করতেন। প্রতিদিন প্রভাতে স্নান এবং ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করার পর তিনি পাণ্ডবদের যুদ্ধ-বিজয়ী হওয়ার আশীর্বাদ দিতেন। ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্বস্তিবাচন করিয়ে অগ্নিতে হোম করার পর সর্বদা তাঁদের শুভ কামনা করতেন 'পাণ্ডুপুত্রেরা

[১]'অরা' নামক অস্ত্র দ্বারা কেটে তৈরি করা শাকসব্জী ইত্যাদিকে 'অরালু' বলা হয় ; সেগুলি সুন্দর করে রন্ধন করা পাচককে 'আরালিক' বলা হয়। [২]ডাল ইত্যাদি রন্ধনকারীদের সাধারণত 'সূপকার' বলা হয়। [৩]নানাপ্রকার দ্রব্য মিশ্রিত করে মুগের রসা তৈরিকারী পাচককে 'রাগখাণ্ডবিক' বলা হয়।

দীর্ঘজীবী হোক।' রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুপুত্রদের ব্যবহারে এতো প্রসন্ন ছিলেন, তিনি তত প্রসন্ন কখনো নিজ পুত্রদের আচরণে হননি। যুধিষ্ঠির তাঁর সুব্যবহারের জন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—সকলেরই প্রিয় ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ তাঁদের সঙ্গে যে অসৎ ব্যবহার করেছিলেন, তিনি সেসব ভুলে ধৃতরাষ্ট্র-আদির সেবায় ব্যাপৃত থাকতেন। যুধিষ্ঠিরের ভয়ে কোনো ব্যক্তি কখনো ধৃতরাষ্ট্র বা দুর্যোধনের অনুচিত কাজের আলোচনা করত না। রাজা ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, বিদুর সকলেই অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের ব্যবহারে অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। কিন্তু ভীমসেনের ব্যবহারে তাঁরা সন্তুষ্ট ছিলেন না। যদিও ভীমসেন যুধিষ্ঠিরের নির্দেশানুসারেই চলতেন, তবুও ধৃতরাষ্ট্রকে দেখে তাঁর মনে সর্বদা দুর্ভাবনা ভেসে বেড়াত। রাজা যুধিষ্ঠিরকে ধৃতরাষ্ট্রের অনুকূল আচরণ করতে দেখে তিনি নিজেও ওপর ওপর অনুকূল আচরণ করতেন, কিন্তু তাঁর অন্তর ধৃতরাষ্ট্র থেকে বিমুখ হয়ে থাকত।

—o—

গান্ধারীসহ ধৃতরাষ্ট্রের বনে যাওয়ার প্রস্তুতি এবং যুধিষ্ঠিরের শোক

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! রাজা যুধিষ্ঠির এবং ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে যে পারস্পরিক প্রেমবন্ধন ছিল, রাজ্যের লোকেরা কখনো তাতে কোনো বিচ্ছেদ আসতে দেখেনি ; কিন্তু ভীমসেন গুপ্তভাবে ধৃতরাষ্ট্রের অপ্রিয় কাজ করতেন। তিনি তাঁর নিযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা তাঁর নির্দেশ অমান্য করাতেন। কোনো এক দিনের কথা, ভীমসেন গর্বভরে ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীকে শুনিয়ে নিজ মিত্রদের কঠোর ভাষায় বলছিলেন—'ভাই ! আমার বাহুগুলি দণ্ডের ন্যায় দৃঢ়। আমিই এই অন্ধ রাজার সমস্ত পুত্রদের যমলোকে পাঠিয়েছি। দেখো, আমার হাত দুটি, এ অতি সুদৃঢ় এবং দুর্ধর্ষ। এই হাতেই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের মৃত্যু হয়েছে।' ভীমসেনের এই মর্মভেদী কথা শুনে রাজা ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। সময়ের বিপরীত গতি উপলব্ধকারী, ধর্মজ্ঞা, বুদ্ধিমতী গান্ধারীও এই কঠোর বাক্য শুনেছিলেন। ততদিন তাঁরা পনেরো বছর যুধিষ্ঠিরের আশ্রয়ে কাটিয়েছেন। সেদিন ভীমসেনের বাক্যবাণে ব্যথিত হয়ে ধৃতরাষ্ট্রের অত্যন্ত মর্মবেদনা হল ; কিন্তু যুধিষ্ঠির তা জানতে পারলেন না। অর্জুন, কুন্তী, যশস্বিনী দ্রৌপদী এবং ধর্মজ্ঞ নকুল-সহদেব—এঁরা সকলেই ধৃতরাষ্ট্রের মনের অনুকূল ব্যবহার করতেন, কখনো কোনো অপ্রিয় কথা বলতেন না।

ধৃতরাষ্ট্র তাঁর সুহৃদদের ডেকে তাঁদের পূর্ণ সম্মান জানিয়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে গদগদ বাক্যে বললেন—'মিত্রগণ ! আপনারা তো জানেন যে কৌরবরা কীভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছিল। সেসব আমারই অপরাধের ফল। দুর্যোধন দুষ্টবুদ্ধি সম্পন্ন ছিল, সে তার জ্ঞাতি-ভাইদের ভীতি বৃদ্ধি করত ; কিন্তু আমি মূর্খতাবশত তাকে কৌরবদের রাজপদে অভিষিক্ত করেছিলাম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণকর পরামর্শ শুনিনি, পুত্রস্নেহে আমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল। তখন মনীষী ব্যক্তিরা আমাকে হিতপ্রদ বুদ্ধি দিয়েছিলেন যে, দুষ্টবুদ্ধি পাপী দুর্যোধনকে তার মন্ত্রীসহ বধ করা উচিত ; কিন্তু আমি তা করিনি। বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য এবং ভগবান ব্যাসও পদে পদে আমাকে সুপরামর্শ দিয়েছিলেন। সঞ্জয় এবং গান্ধারীও অনেক বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু আমি কারো কথায় কান দিইনি। এখন তাই অত্যন্ত অনুতাপ হচ্ছে। মহাত্মা পাণ্ডবরা গুণসম্পন্ন ছিল, তবুও আমি তাদের পিতা-পিতামহের রাজ্য ফিরিয়ে দিতে পারিনি। এইরূপ আমার কৃত হাজার হাজার ভুল আমার হৃদয়ে সঞ্চিত আছে, যা এখন কাঁটার মতো বিঁধছে। বিশেষ করে এই পনেরো বছর পরে আমার চোখ খুলে গেল। আমি পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য নিয়মপূর্বক থেকে কখনো চতুর্থ, কখনো অষ্টম প্রহরে শুধুমাত্র ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য আহার করি, একথা শুধু গান্ধারীই জানেন। অন্য সকলে জানে আমি প্রত্যহ পূর্ণ আহার করি। যুধিষ্ঠিরের ভয়েই আমার কাছে লোক আসে। আমি নিয়ম পালনের ছলে মৃগচর্ম ধারণ করে কুশ আসনে আসীন হয়ে জপে ব্যাপৃত থাকি এবং মাটিতে শয়ন করি। যশস্বিনী গান্ধারীরও আমার মতোই অবস্থা। আমাদের একশত পুত্র নিহত হয়েছে। কিন্তু তার জন্য আমার দুঃখ নেই ; কারণ তারা ক্ষত্রিয় ধর্ম অবগত ছিল এবং সেই অনুসারেই তারা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেছে।

সুহৃদদের এই কথা বলে ধৃতরাষ্ট্র রাজা যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'কুন্তীনন্দন ! তোমার কল্যাণ হোক, আমার কথা শোনো। তোমার এখানে থেকে আমি বড় সুখে দিন

কাটিয়েছি, বড় বড় দান করেছি এবং অনেক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেছি। দ্রৌপদীর সঙ্গে অত্যাচার করে তোমার ঐশ্বর্য অপহরণকারী আমার ক্রূরকর্মা পুত্ররা ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে যুদ্ধে হত হয়েছে। এখন আর তার জন্য কিছু করার প্রয়োজন নেই ; কারণ তারা শস্ত্রধারীর উপযুক্ত লোকে গমন করেছে। এখন আমার ও গান্ধারীর নিজেদের হিতার্থে পুণ্যকর্ম করার প্রয়োজন, তার জন্য তুমি অনুমতি দাও। তোমার অনুমতি পেলে আমি বনে চলে যাব এবং সেখানে গান্ধারীর সঙ্গে চীর-বল্কল ধারণ করে তোমাকে আশীর্বাদ করতে করতে বাস করব। বনে বায়ুপান করে অথবা উপবাস করে থাকব এবং সপত্নীক কঠোর তপস্যা করব। পুত্র ! তুমিও সেই তপস্যার অংশীদার হবে ; কারণ তুমি রাজা এবং রাজা তার রাজ্যের মধ্যে হওয়া সমস্ত ভালোমন্দ কর্মের ফলভাগী হয়।'

যুধিষ্ঠির বললেন—মহারাজ ! আপনি এখানে থেকে যে এরূপ দুঃখ ভোগ করছিলেন—তা জেনে আমার এই রাজ্যে একটুও সুখ পাচ্ছি না। আমার ন্যায় দুর্বুদ্ধিকে ধিক্। আমি এতো প্রমাদী এবং রাজ্যে আসক্ত যে আজ পর্যন্ত আমি এবং আমার ভাইয়েরা জানতেই পারিনি যে আপনি দুঃখভারে পীড়িত এবং উপবাস করে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে মাটিতে শয়ন করছেন। হায় ! আপনি নিজ চিন্তা লুকিয়ে আমার মতো মূর্খকে অন্ধকারে রেখেছিলেন, আমাকে বিশ্বাস করিয়েছিলেন যে আপনি সুখী অথচ দুঃখভোগ করছিলেন। এই রাজ্যে, এই সব ভোগে, নানাপ্রকার যজ্ঞ করে অথবা এইসব সুখ-সামগ্রীতে আমার কী প্রয়োজন, যখন আমার কাছে থেকে আপনাকে এতো কষ্ট সহ্য করতে হল ! আপনিই আমার পিতা, মাতা এবং পরম গুরু। আপনার থেকে পৃথক হয়ে আমি কোথায় থাকব ? যুযুৎসু আপনার ঔরসজাত পুত্র, একে বা অন্য কাউকে যাকে আপনি চান, রাজা করুন অথবা নিজেই রাজ্যশাসন করুন ; আমি বনে চলে যাব। পিতা ! আমি আগেই অপযশে জ্বলে গেছি ; আপনি আমাকে আর দগ্ধ করবেন না। আমি রাজা নই, রাজা আপনি। আমি আপনার আদেশ পালনকারী সেবক। আমি কী করে আপনাকে অনুমতি দেব ? দুর্যোধনের অপরাধের জন্য আমাদের মনে একটুও ক্ষোভ নেই। যা হয়েছে, তা হওয়ারই ছিল। দুর্যোধনাদি যেমন আপনার পুত্র ছিল, আমরাও তাই। আমার কাছে গান্ধারী ও কুন্তীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আপনি যদি আমাকে ছেড়ে চলে যান, তাহলে আমি শপথ করে বলছি যে আমিও আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাব। আপনি না থাকলে এই ধন-ধান্যপূর্ণ আসমুদ্র পৃথিবীর রাজত্ব আমাকে প্রসন্ন রাখতে পারবে না। মহারাজ ! এ সব কিছুই আপনার। আমি আপনার চরণে মাথা রেখে প্রার্থনা করছি যে, আপনি প্রসন্ন হোন ; আমরা সকলে আপনারই অধীন। সৌভাগ্যবশত যদি আমার আপনাকে সেবা করার সুযোগ হয়, তাহলে আমার মানসিক চিন্তা দূর হবে।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—পুত্র ! আমার মন তপস্যাতেই ভরে আছে এবং জীবনের অন্তিম সময়ে বনে যাওয়া আমাদের কুলের উচিত কাজ। আমি দীর্ঘকাল তোমার কাছে থেকেছি, তুমিও বহুদিন আমার সেবা-শুশ্রূষা করেছ, এখন আমার বৃদ্ধাবস্থা হয়েছে। এবার আমাকে বনে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত।

ধৃতরাষ্ট্রের কথা শুনে যুধিষ্ঠির কেঁপে উঠলেন এবং হাত জোড় করে চুপচাপ বসে রইলেন। তখন অম্বিকানন্দন রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহাত্মা সঞ্জয় এবং মহারথী কৃপাচার্যকে বললেন—'আমি আপনাদের রাজা যুধিষ্ঠিরকে বোঝাতে বলছি। একে তো আমি অধিক বৃদ্ধ, তাতে বলার পরিশ্রম, তাই আমার চিত্তবিভ্রম হচ্ছে, মুখ শুকিয়ে আসছে।'

একথা বলতে বলতে তিনি গান্ধারীর সাহায্যে নির্জীব হয়ে শয়ন করলেন। তা লক্ষ্য করে রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তিনি বলতে লাগলেন—'ওহো ! যাঁর

শরীরে সহস্র হাতির বল ছিল, সেই রাজা ধৃতরাষ্ট্র আজ তাঁর স্ত্রীর সাহায্যে শয়ন করছেন। যিনি আগে ভীমের লৌহময় মূর্তি চূর্ণ করেছিলেন, সেই মহাবলী রাজাকে এক অবলা

নারীর সাহায্য নিতে হচ্ছে। আমার মতো পাপীকে ধিক্। ধিক্ আমার বুদ্ধি এবং বিদ্যাকেও, যার জন্য মহারাজ এই সময় অসহায় অবস্থায় শুয়ে রয়েছেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং যশস্বিনী গান্ধারী দেবী যদি আহার না করেন, তাহলে আমিও এঁদের মতো উপবাস করব।'

এই কথা বলে ধর্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির হাতে ঠাণ্ডা জল নিয়ে ধীরে ধীরে ধৃতরাষ্ট্রের বুকে ও মুখে দিতে লাগলেন। তাঁর হাতের স্পর্শে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মূর্ছা দূর হল এবং তিনি চৈতন্য ফিরে পেয়ে বললেন—'পাণ্ডুনন্দন ! তুমি আমার শরীরে হাত বোলাও আর আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরো। তোমার সুখদায়ক স্পর্শে আমি যেন প্রাণ ফিরে পেলাম। তোমার দুহাতের স্পর্শে আমার মহাতৃপ্তি হচ্ছে। চারদিন ধরে আমি অন্ন গ্রহণ করিনি, তাই আমার শরীরে জোর নেই। তোমাকে অনুরোধ করার জন্য বলার সময় আমার অত্যন্ত পরিশ্রম হয়েছে ; তাই আমি অচৈতন্য-প্রায় হয়ে পড়েছিলাম। তোমার হাতের স্পর্শে শরীরে যেন অমৃত স্পর্শ পেলাম, তাতে আমি নতুন জীবন যেন ফিরে পেলাম।'

ধৃতরাষ্ট্রের কথা শুনে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির অত্যন্ত স্নেহে তাঁর সমস্ত শরীরে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। তাঁর স্পর্শে ধৃতরাষ্ট্রের দেহে যেন নতুন জীবন ফিরে এল, তিনি দুহাতে যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করে তাঁর মস্তক আঘ্রাণ করলেন। বিদুর ও অন্য সকলে এই করুণ দৃশ্য দেখে দুঃখিত চিত্তে ক্রন্দন করতে লাগলেন। কুন্তীর সঙ্গে অন্যান্য কুরুনারীও শোকগ্রস্ত হয়ে তাঁদের ঘিরে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে আবার বললেন—'পুত্র ! বারবার বলতে আমার কষ্ট হচ্ছে, আমাকে আর কষ্ট দিও না। আমাকে তপস্যা করার অনুমতি দাও।' তাঁকে এইভাবে কথা বলতে দেখে সেখানে উপস্থিত সকলে আর্তভাবে হাহাকার করতে লাগলেন। ধৃতরাষ্ট্রকে এইভাবে উপবাস পীড়িত, ক্লান্ত ও দুর্বল দেখে যুধিষ্ঠির তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন এবং নিজ শোকাশ্রু অবদমন করে বললেন—'নরশ্রেষ্ঠ ! আমার রাজ্য বা জীবনের কোনো ইচ্ছা নেই ; আপনার যাতে ভালো হয়, আমি তাই করতে চাই। আপনি যদি আমাকে আপনার কৃপার পাত্র বলে মনে করেন এবং আমি যদি আপনার প্রিয় হই, তাহলে আমার অনুরোধে আপনি এখন আহার করুন। তারপর অন্য কথা ভাবব।' তাঁর কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'পুত্র ! তুমি আমাকে বনে যাওয়ার অনুমতি দিলে তবে আমি আহার করব, এই আমার ইচ্ছা।' রাজা ধৃতরাষ্ট্র যখন এই কথা বলছিলেন, সেইসময় সত্যবতীনন্দন মহর্ষি ব্যাসদেব সেখানে উপস্থিত হলেন এবং বলতে লাগলেন—

ব্যাসদেবের যুধিষ্ঠিরকে বোঝানো এবং ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক রাজনীতির শিক্ষা প্রদান

ব্যাসদেব বললেন—যুধিষ্ঠির ! মহাতেজস্বী ধৃতরাষ্ট্র যা বলছেন, তাই করো ; তাঁর জন্য আর চিন্তা কোরো না।

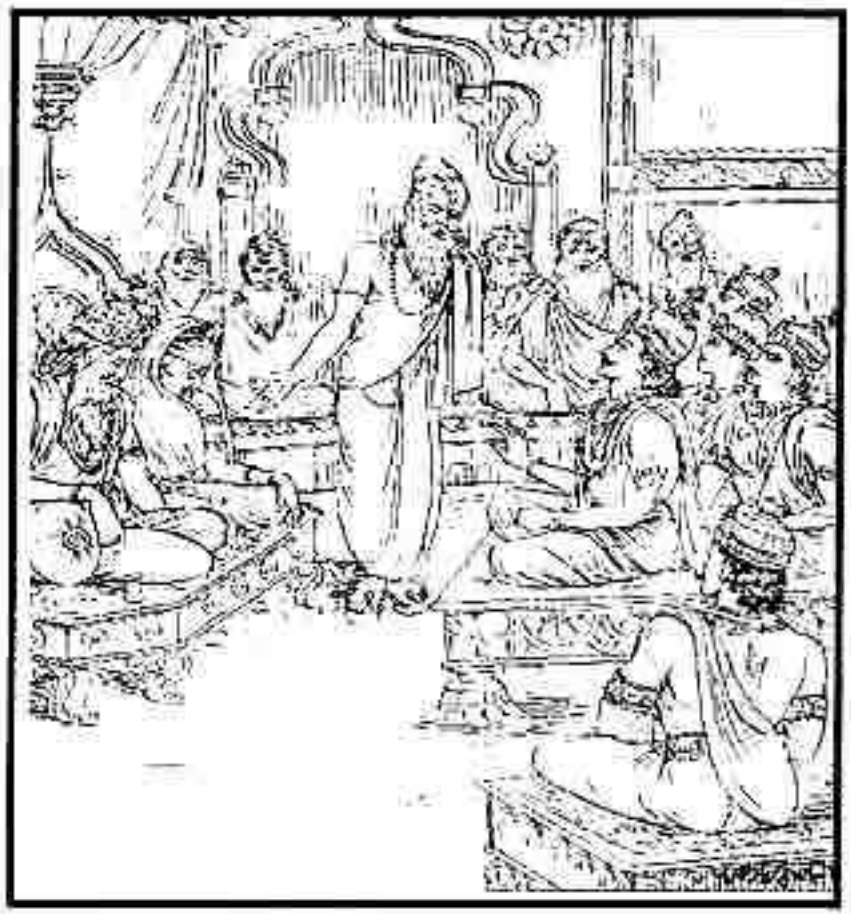

এখন তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন, বিশেষ করে এঁর সব পুত্র বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে। আমার বিশ্বাস তিনি এই কষ্ট আর বেশিদিন সহ্য করতে পারবেন না। সৌভাগ্যবতী গান্ধারী পরম বিদুষী, তাই তিনি মহাধৈর্য সহকারে পুত্রশোক সহ্য করছেন। আমার কথা শোনো, রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বনে যাওয়ার অনুমতি দাও, আমি তোমাকে এই পরামর্শই দিচ্ছি। নাহলে ইনি এখানে থাকলে মৃত্যুমুখে পতিত হবেন। তিনি যাতে প্রাচীন রাজর্ষিদের পথ অনুসরণ করতে পারেন, তাঁকে তুমি সেই সুযোগ দাও। রাজর্ষিগণ জীবনের অন্তিম সময়ে বনেরই আশ্রয় গ্রহণ করতেন।

অদ্ভুতকর্মা মহামুনি ব্যাস এইকথা বলায় মহাতেজস্বী রাজা যুধিষ্ঠির তাঁকে বললেন—'প্রভু ! আপনি আমাদের মাননীয় গুরু, এই রাজা ও কুলের পরম আধারও আপনি। আপনি আমার পিতা, আমি আপনার পুত্র। রাজা ধৃতরাষ্ট্রও তেমনই আমার গুরু (আমি কী করে তাঁকে কোনো আদেশ দিতে পারি)। পুত্রই পিতার আদেশ পালন করবে, ধর্মে তো

সেরূপ নির্দেশই দেওয়া আছে।' যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে মহাতেজস্বী ব্যাসদেব তাঁকে আবার বললেন—'রাজন্ ! তোমার কথা সত্য। কিন্তু রাজা ধৃতরাষ্ট্র বৃদ্ধ হয়েছেন এবং অন্তিম অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছেন ; তাই তিনি এখন আমার ও তোমার অনুমতি নিয়ে তপস্যার দ্বারা তাঁর মনোরথ পূর্ণ করবেন। তুমি এই শুভকার্যে বিঘ্নপ্রদান কোরো না। যুধিষ্ঠির ! রাজর্ষিদের পরমধর্ম হল যুদ্ধে বা বনে মৃত্যুবরণ করা। তোমার পিতা রাজা পাণ্ডুও ধৃতরাষ্ট্রকে গুরুর সমান মেনে শিষ্যভাবে তাঁর সেবা করেছেন, পৃথিবীর রাজ্য ভোগ করেছেন, প্রজাদের ভালোভাবে পালন করেছেন এবং বহু ধন-রত্ন দান করেছেন। নিজ সেবকদের নিয়ে তুমিও এঁকে এবং গান্ধারীকে গুরুবৎ সেবা-শুশ্রূষা ও আরাধনা করেছ। এখন এঁর তপস্যা করার সময়, সুতরাং তুমি তোমার পিতাকে বনে যাওয়ার অনুমতি দাও। তোমার ওপর এঁর মনে বিন্দুমাত্রও ক্রোধ নেই।'

এই বলে মহর্ষি ব্যাস রাজা যুধিষ্ঠিরকে রাজি করালেন এবং রাজা যুধিষ্ঠির যখন 'যথা আজ্ঞা' বলে তাঁর নির্দেশ মেনে নিলেন, তখন ব্যাসদেব বনে নিজের আশ্রমে চলে গেলেন। ভগবান ব্যাস চলে গেলে রাজা যুধিষ্ঠির অতি নম্র-ভাবে ধীরে ধীরে তাঁর বৃদ্ধ পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—'পিতা ! মহর্ষি ব্যাস যে নির্দেশ দিয়েছেন এবং আপনি যা করা স্থির করেছেন, মহা ধনুর্ধর কৃপাচার্য, বিদুর, যুযুৎসু ও সঞ্জয় যেমন বলবেন, নিঃসন্দেহে আমি তাই করব ; কিন্তু এখন আপনার পায়ে মাথা রেখে প্রার্থনা করছি, যে আপনি আগে আহার করে নিন, তারপর আশ্রমে যাবেন।'

তারপর রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সঙ্গে তাঁর মহলে গেলেন। তাঁর হাঁটার শক্তি কমে গিয়েছিল, বড় কষ্টে চলছিলেন। সেই সময় তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বিদুর, সঞ্জয় এবং কৃপাচার্যও গেলেন। মহলে গিয়ে তিনি পূর্বাহ্নের ধার্মিক ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন, তারপর শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের আহারে তৃপ্ত করে স্বয়ং আহার করলেন। মনস্বিনী গান্ধারীও কুন্তী এবং অন্যান্য পুত্রবধূদের দ্বারা পূজিত হয়ে অন্নগ্রহণ করলেন। তাঁদের আহার হলে বিদুর এবং অন্যান্য পাণ্ডবরাও আহার করে ধৃতরাষ্ট্রের সেবায় উপস্থিত হলেন। সেইসময় কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে একান্তে বসে থাকতে দেখে ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন—'কুরুনন্দন ! এই অষ্টাঙ্গসম্পন্ন রাজ্যে তুমি সর্বদা ধর্মকেই সামনেই রেখো এবং অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে

রাজ্য পরিচালনা কোরো। ধর্মের দ্বারাই রাজ্য রক্ষা করা সম্ভব—তুমি নিজেও একথা জানো, তবু আমার কাছ থেকেও শোনো। সর্বদা বিদ্বান ব্যক্তিদের সঙ্গ করবে, তাঁরা যা বলেন, মন দিয়ে শুনবে এবং বিনা বিচারে তা পালন করবে। প্রভাতে সেই বিদ্বান ব্যক্তিদের যথোচিত সম্মান করবে এবং প্রয়োজনের সময় তাঁদের কাছে তোমার কর্তব্য জিজ্ঞাসা করবে। তোমার নিজ হিতার্থে তুমি অবশ্যই তাদের সম্মান করবে। সম্মানিত হলে তাঁরা সর্বদা তোমাকে হিতের কথা বলবেন। সারথি যেমন ঘোড়াকে বশে রাখে, তুমিও তেমনই তোমার ইন্দ্রিয়াদি বশে রাখবে, তাহলে সঞ্চিত অর্থের ন্যায় এগুলি ভবিষ্যতে তোমার পক্ষে হিতকর হবে। যারা জেনেবুঝে, নিষ্কপটভাবে কাজ করে, যারা পিতা-পিতামহের সময় থেকে কাজ করে আসছে এবং যারা অন্তর-বাহিরে শুদ্ধ, সংযমী, পুণ্যকর্মকারী, পরম পবিত্র, সেই মন্ত্রীদের সর্বপ্রকার কাজে নিযুক্ত করবে। যার পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে, যে নিজ রাজ্যেই বসবাস করে এবং যাকে শত্রুরা চেনে না, এরূপ বহু গোয়েন্দা পাঠিয়ে তাদের সাহায্যে শত্রুদের গোপনীয় খবর জেনে নিতে হবে। নগর রক্ষার পূর্ণ ব্যবস্থা তোমাকে করতে হবে—তার চারদিকের প্রাচীর এবং প্রধান ফটক যেন খুব মজবুত হয়। মধ্যখানে, চারপাশে বড় বড় উঁচু অট্টালিকা থাকবে। নগরের সমস্ত দ্বার বিশাল হবে এবং তাতে পাহারা দেওয়ার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা থাকবে। দ্বারগুলি ঠিক স্থানে হওয়া চাই এবং চারদিক থেকে তার রক্ষার জন্য সশস্ত্র প্রহরী থাকা উচিত। যাদের

বংশ পরিচয় ঠিকমতো জানা আছে, তাদেরই কাজে নিযুক্ত করবে। আহার-বিহার-শয়ন, পোষাক পরিধান, মালা পরা ইত্যাদির সময় সতর্ক থেকে নিজেকে রক্ষা করবে। কুলীন, শীলবান, বিদ্বান, বিশ্বাসপাত্র এবং প্রবুদ্ধ ব্যক্তিদের দ্বারা নিজের রক্ষার পূর্ণ ব্যবস্থা করবে।

'যুধিষ্ঠির ! তুমি সেইসব ব্রাহ্মণদের মন্ত্রী করবে, যাঁরা বিদ্যায় কুশলী, বিনয়ী, কুলীন, ধর্ম ও অর্থ কুশল এবং সরল স্বভাববিশিষ্ট ; তাঁদের সঙ্গেই তুমি গূঢ় বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে। কিন্তু বেশি লোক নিয়ে বহুক্ষণ ধরে মন্ত্রণা করবে না। সমস্ত মন্ত্রীদের অথবা তাদের মধ্যে দু-একজনকে কোনো কাজের ছলে বন্ধ ঘরে অথবা উন্মুক্ত স্থানে নিয়ে গিয়ে পরামর্শ করবে। যেখানে বেশি ঘাস-পাতা নেই, তেমন জঙ্গলেও মন্ত্রণা করা যেতে পারে ; কিন্তু রাত্রিকালে এরূপস্থলে কোনো গুপ্ত পরামর্শ করা উচিত নয়। মন্ত্রণা কক্ষে পশুপক্ষী বা অন্য মানুষকে আসতে দেওয়া উচিত নয়। কারণ গুপ্ত মন্ত্রণা প্রকাশিত হলে রাজাকে যে সংকটের সম্মুখীন হতে হয়, তা নিবারণ করা সম্ভব হয় না—আমার এমনই বিশ্বাস। মন্ত্রণা প্রচার হলে যে দোষ হয়, তা তুমি সর্বদা মন্ত্রীমণ্ডলের সামনে বলতে থাকবে। তোমরা প্রতি নগর ও নগরপ্রান্তের লোকেদের হৃদয়ের ভাব সর্বদা জানতে চেষ্টা করবে। ন্যায়কার্যে তুমি সর্বদা এমন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করবে, যে বিশ্বাসের পাত্র, সন্তোষী, হিতৈষী, গুপ্তচর দ্বারা সর্বদা তার কাজের ওপর দৃষ্টি রাখবে। তোমার এমন বিধান করা উচিত, যাতে তোমার নিযুক্ত ন্যায়াধিকারী ব্যক্তি অপরাধীদের অপরাধ ঠিকমতো অনুসন্ধান করে তাকে উচিত দণ্ডপ্রদান করে। যার অপরের কাছ থেকে ঘুষ নেওয়ার অভ্যাস থাকে, যে অন্যের স্ত্রীকে অপহরণ করে, যার কঠিন দণ্ডদানের প্রবৃত্তি থাকে, যে মিথ্যা বিচার দেয়, কটুবাদী, লোভী, অপরের ধন অপহরণকারী, দুঃসাহসী, সভাভবন ভঙ্গকারী এবং বর্ণসংকর দোষের প্রচারক হয়, দেশকালের ওপর নজর রেখে সেই ব্যক্তিকে আর্থিকদণ্ড বা প্রাণদণ্ড দেওয়া উচিত। প্রাতে উঠে (নিত্য নিয়ম পালনের পর) প্রথমে সেই সব লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে যারা তোমার অর্থ খরচের কাজে নিযুক্ত ; তারপর পোষাক পরিচ্ছদ এবং আহারের দিকে নজর দেবে। পরে সৈনিকদের হর্ষ ও উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। দূত এবং গুপ্তচরদের সঙ্গে সন্ধ্যায় সাক্ষাৎ করবে। একপ্রহর রাত বাকি থাকতে উঠে আগে সারাদিনের কর্তব্য ঠিক করে নেবে। অর্ধরাত্রে এবং দ্বিপ্রহরে নিজে ঘুরে প্রজাদের অবস্থা নিরীক্ষন করবে। সর্বদা ন্যায়ের পথ অনুসরণ করেই তোমার রাজকোষ বৃদ্ধির চেষ্টা করা উচিত। ন্যায়ের বিপরীত পথ অবলম্বন করবে না। প্রথমে কাজ দেখে পরে লোককে কর্মে নিযুক্ত করবে। যে তোমার আশ্রয়ে থাকে, সে কোনো স্থায়ী কাজে নিযুক্ত হোক বা না হোক, তাকে দিয়ে সবসময় কাজ করাবে। তাকেই সেনাপতি নিযুক্ত করবে, যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, শূরবীর, কষ্ট সহ্য করতে পারে, হিতৈষী, পুরুষার্থী এবং প্রভুভক্ত। তোমার রাজ্যে বসবাসকারী কারিগর যদি তোমার কাজ করে, তাহলে তুমি তার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করবে। নিজের এবং শত্রুদের দুর্বলতাগুলি সর্বদা খেয়াল রাখবে। নিজ দেশের পুরুষদের মধ্যে যারা কোনো কাজে বিশেষ কুশল এবং হিতৈষী, তাদের নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে কর্ম দিয়ে কাছে নিযুক্ত রাখবে। বুদ্ধিমান রাজার কর্তব্য হল গুণবান ব্যক্তির গুণবৃদ্ধির চেষ্টা করা।

'ভারত ! তুমি তোমার শত্রুদের, উদাসীন রাজাদের এবং মধ্যস্থ পুরুষ সমুদায়ের ওপর দৃষ্টি রাখবে। চার প্রকারের শত্রু, ছয় প্রকারের আততায়ী, নিজ মিত্র এবং শত্রুর মিত্র—এই বারো প্রকার মানুষের সম্পর্কে সর্বদা সজাগ থাকবে। মন্ত্রী, দেশ, দুর্গ এবং সেনা—এগুলির ওপর শত্রুদের লক্ষ্য থাকে। তাই এদের সাবধানে রক্ষা করবে। উপরিউক্ত বারো প্রকারের মানুষ রাজাদের মুখ্য বিষয়। মন্ত্রীদের অধীন কৃষি ইত্যাদি ষাট গুণ এবং পূর্বোক্ত বারো মানুষ—নীতিজ্ঞ আচার্যেরা এগুলিকে 'মণ্ডল' আখ্যা দিয়েছেন। রাজার এ সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত থাকা উচিত। কারণ রাজ্য রক্ষার ছটি উপায়ের যথার্থ ব্যবহার এদেরই অধীন। রাজার নিজ বৃদ্ধি, ক্ষয় ও স্থিতির সর্বদা জ্ঞান থাকা আবশ্যক এবং যখন নিজপক্ষ বলশালী ও শত্রুপক্ষ নির্বল বলে মনে হবে, সেই সময় শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করে জেতার চেষ্টা করবে ; কিন্তু যখন শত্রুপক্ষ প্রবল ও নিজপক্ষ দুর্বল, তখন শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করবে। রাজার সবসময় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে রাখা উচিত। যখন শত্রুর ওপর আক্রমণ করতে সক্ষম হবে না, তখন সেই পরিস্থিতিতে

রাজার কর্তব্য হল বস্তুস্থিতি ভালোমতো বিচার করা। শত্রুকে কিছু অনুর্বর জমি, অল্প স্বর্ণ ও অন্যান্য কম মূল্যবান জিনিস দিয়ে সন্ধি করতে হয় ; কিন্তু যখন শত্রুপক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব আসবে, তখন উর্বর জমি, মূল্যবান ধাতু এবং বলবান মিত্রদের সঙ্গে নিয়ে সন্ধি করা উচিত অথবা প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার রাজকুমারকে জামিন হিসাবে নিজের কাছে রাখার চেষ্টা করা উচিত, এর বিপরীত আচরণ করা উচিত নয়। যদি কোনো বিপদ আসে তাহলে উচিত উপায় এবং মন্ত্রণার জ্ঞাতা রাজার তার থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। প্রজাদের মধ্যে যারা দীন-দরিদ্র, রাজার উচিত তাদের ওপর কৃপাদৃষ্টি রাখা। নিজ বৃদ্ধি চান যে রাজা তাঁর কখনো সম্মুখে উপস্থিত সামন্ত রাজাকে বধ করা উচিত নয়। যিনি সমগ্র পৃথিবী জয় করতে চান, তাঁর কখনো হিংসা করা উচিত নয়। সুবুদ্ধি ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা করবে, দুষ্ট ব্যক্তিদের বন্দি করে শাস্তি প্রদান করবে। বলবান ব্যক্তির কখনো দুর্বলের বিনাশ করা উচিত নয়। যুধিষ্ঠির ! তোমার বেতের ন্যায় নম্রনীয়তার আশ্রয় নেওয়া উচিত। যদি কোনো দুর্বল রাজাকে কোনো বলবান রাজা আক্রমণ করে, তাহলে নিজের মধ্যে যুদ্ধের শক্তি না থাকলে মন্ত্রীদের নিয়ে তার শরণ গ্রহণ করবে এবং অর্থ, নগরের মানুষ, অন্য প্রিয় বস্তু দিয়ে সাম আদি উপায়ের দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বীকে যুদ্ধে বিরত করার চেষ্টা করবে। যদি কোনোভাবেই সন্ধি করা সম্ভব না হয়, তাহলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবে। তাতে যদি মৃত্যুও হয়, তাহলে বীরপুরুষ মুক্তিলাভ করে।

যুধিষ্ঠির ! সন্ধি ও বিগ্রহের দিকেও তোমার দৃষ্টি রাখা উচিত। শত্রু প্রবল হলে তার সঙ্গে সন্ধি করা এবং দুর্বল হলে তার সঙ্গে যুদ্ধ করা—সন্ধি ও বিগ্রহের এই দুটি আধার। এগুলি প্রয়োগের নানা উপায় ও প্রকার আছে। নিজ দ্বিবিধ অবস্থা—শক্তি-সামর্থ্য ভালোমতো চিন্তা করে শত্রুর সঙ্গে সন্ধি বা যুদ্ধ করা কর্তব্য। শত্রু যদি মনস্বী হয়, তার সৈন্যদল বলশালী ও সন্তুষ্ট হয় তাহলে তাদের সহসা আক্রমণ না করে, পরাস্ত করার অন্য উপায় খুঁজতে হবে। আক্রমণ তখনই করতে হয় যখন শত্রু উপযুক্ত অবস্থায় না থাকে। শত্রুদের ওপর আক্রমণকারী রাজার নিজ এবং বিপক্ষের ত্রিবিধ শক্তি ভালোভাবে বিচার করা উচিত। শত্রু থেকে অধিক উৎসাহী, প্রভুশক্তি ও মন্ত্রশক্তিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত রাজাই সফলভাবে আক্রমণ করতে সক্ষম। এর বিপরীত অবস্থা হলে আক্রমণের চিন্তা ত্যাগ করা উচিত। রাজার নিজের সৈন্যবল, ধনবল, মিত্রবল, অরণ্যবল, ভৃত্যবল ও শ্রেণীবল সংগ্রহে থাকা উচিত। এরমধ্যে মিত্রবল ও ধনবল সর্বশ্রেষ্ঠ। দেশ-কালের আনুকূল্য থাকলে রাজা রাজোচিত গুণাদিযুক্ত হয়ে সুশিক্ষিত সৈন্যদল নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করবেন। যুদ্ধের সময় পরামর্শ করে নানাপ্রকার ব্যূহ নির্মাণ করবে। শুক্রাচার্যের গ্রন্থে এই বিধান আছে। গুপ্তচর দ্বারা শত্রুর এবং নিজের সৈন্যের গুণাগুণ নির্ধারণ করে নিজ বা শত্রুর দেশে যুদ্ধ আরম্ভ করবে। রাজার উচিত সৈন্যদের পারিতোষিক ইত্যাদির দ্বারা সন্তুষ্ট রাখা এবং বলশালী ব্যক্তিদের সেনাদলে নিয়োগ করা। যে রাজা এইসব বিষয় চিন্তা করে ঠিকমতো আচরণ ও প্রজাদের ধর্মপূর্বক পালন করে, সে মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে যায়। পুত্র ! তুমিও এইরূপ ইহলোক ও পরলোকে সুখ পাবার জন্য সর্বদা প্রজাদের হিতে ব্যাপৃত থাকবে। ভীষ্ম, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং বিদুর তোমাকে এ সকল উপদেশই দিয়েছেন। আমারও তোমার ওপর ভালোবাসা আছে, তাই আমিও তোমাকে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি ; এই সব ব্যাপার যথোচিতভাবে পালন করবে। এরদ্বারা তুমি প্রজাদের প্রিয় হবে এবং স্বর্গেও সুখ লাভ করবে। রাজা এক হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ করুক অথবা ধর্মপূর্বক প্রজাপালন করুন ; উভয়েরই সমান ফল লাভ হয়।'

প্রজাবর্গের কাছে ধৃতরাষ্ট্রের বনে যাওয়ার অনুমতি নেওয়ার সময় ক্ষমা প্রার্থনা এবং তাদের কাছে যুধিষ্ঠিরকে সমর্পণ

যুধিষ্ঠির বললেন—মহারাজ ! আপনি যেমন বলছেন, সেই মতোই কাজ করব। এখন আরও কিছু উপদেশ প্রদান করুন। ভীষ্ম স্বর্গগমন করেছেন, শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় গিয়েছেন, বিদুর এবং সঞ্জয়ও আপনার সঙ্গে যাচ্ছেন। এখন আমাকে উপদেশ দিতে আর কে থাকছেন ? আমার হিতের কথা চিন্তা করে এখন আপনি যা উপদেশ দিচ্ছেন, সেই অনুসারে আমি সব কাজ করব।

ধর্মরাজের কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'পুত্র ! এখন থাক, কথা বলায় আমার অত্যন্ত পরিশ্রম হচ্ছে। এবার আমি যাওয়ার অনুমতি চাইছি।' এই বলে তিনি গান্ধারীর মহলে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে আসনে উপবিষ্ট হলে ধর্মপরায়ণা গান্ধারী দেবী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—'প্রাণনাথ ! মহর্ষি ব্যাস নিজে এসে আপনাকে বনে যাওয়ার আদেশ দিলেন এবং যুধিষ্ঠিরের অনুমতিও পাওয়া গেছে। কবে আপনি বনগমন করবেন ?'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—গান্ধারী ! বনে যাওয়ার আর বেশি দেরি নেই। আমার ইচ্ছা প্রজাদের ডেকে আমার মৃত পুত্রদের উদ্দেশ্যে কিছু ধন দান করি।

এই কথা বলে ধৃতরাষ্ট্র ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে নিজের চিন্তাধারা জানালেন। যুধিষ্ঠির তাঁর নির্দেশানুসারে সমস্ত ব্যবস্থা করলেন। তারপর (রাজার খবর পেয়ে) কুরুজাঙ্গাল দেশের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলে এসে উপস্থিত হল। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অন্তঃপুর থেকে বাইরে এসে নগর ও প্রান্তের প্রজাদের উপস্থিত দেখে বললেন—'সজ্জনগণ ! আপনারা এবং কৌরবরা চিরকাল একসঙ্গে বসবাস করেছেন। আপনাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ স্নেহ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। আপনারা সর্বদাই একে অপরের হিতে ব্যাপৃত রয়েছেন। আমি এখন আপনাদের কিছু নিবেদন করতে চাই। বিনা বিচারে কৃপা করে তা স্বীকার করুন। আমি গান্ধারীর সঙ্গে বনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মহর্ষি ব্যাস এবং কুন্তীনন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুমতি আমরা পেয়েছি। এবার আপনারাও আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিন, এতে আর অন্য কিছু চিন্তা করবেন না। আপনাদের সঙ্গে আমার যে প্রীতি-সম্পর্ক চিরকাল ধরে চলে আসছে, আমার মনে হয় অন্য দেশের প্রজাদের সঙ্গে রাজাদের তেমন সম্পর্ক কদাচিৎ হয়। এই বৃদ্ধাবস্থা আমাকে ও গান্ধারীকে অত্যন্ত কাহিল করে দিয়েছে, তারপর উপবাস করে আমরা দুজনে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছি। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যে আমি অত্যন্ত সুখে ছিলাম। আমার মনে হয় দুর্যোধনের রাজ্যকালে আমার এত সুখ হয়নি। একে তো আমি জন্মান্ধ, আর বৃদ্ধ হয়েছি ; তারপর আমার পুত্ররাও যুদ্ধে নিহত (সেই শোক কখনো দূর হয় না)। এই অবস্থায় বনে যাওয়া ব্যতীত আমার কল্যাণের আর কী উপায় থাকতে পারে ? অতএব আপনারা আমাকে বনে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করুন।'

ধৃতরাষ্ট্রের কথা শুনে সেখানে উপস্থিত কুরুজাঙ্গাল নিবাসী সকল মানুষেরই অশ্রুধারা বইতে লাগল, তাঁরা সকলেই দুঃখে কাঁদতে লাগলেন। তাদের কোনো উত্তর দিতে না দেখে ধৃতরাষ্ট্র আবার বলতে লাগলেন—'ভ্রাতাগণ ! মহারাজ এই পৃথিবী যথাবিহিত পালন করেছিলেন। তারপর ভীষ্মের দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে রাজা বিচিত্রবীর্য রাজত্ব করেন। তিনি যেভাবে রাজ্য রক্ষা করেছিলেন, আপনারা সকলেই তা অবগত আছেন। তারপর আমার ভ্রাতা পাণ্ডু বিধিবৎ এই রাজ্য পালন করেছেন, তা-ও আপনারা জানেন। তাঁর প্রজাপালনরূপ গুণের জন্যই তিনি আপনাদের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। পাণ্ডুর পরে আমি ভালো-মন্দ যেমনই হোক, সেবা করেছি। সেই সময় আমি আপনাদের কাছে যে অপরাধ করেছি, তারজন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। দুর্যোধন যখন নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ করেছিল, তখন সেও আপনাদের কোনো ক্ষতি করেনি (শুধু পাণ্ডবদের সঙ্গেই অন্যায় ব্যবহার করেছিল)। কিন্তু তার দুর্বুদ্ধির অপরাধ ও অভিমানে এবং আমার কৃত অন্যায়ে অসংখ্য রাজার মহা সংহার হয়েছে। সেই সময় আমার দ্বারা ভালো-মন্দ যা কিছু হয়েছে, সেসব আপনারা ভুলে যান ; আমি হাত জোড় করে সেই প্রার্থনা করছি। আমাকে বৃদ্ধ, দুঃখী এবং প্রাচীন রাজাদের উত্তরাধিকারী মনে করে ক্ষমা করুন। এই বেচারি তপস্বিনী গান্ধারীও আমার সঙ্গে আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। আমার দুজনেই বৃদ্ধ এবং পুত্র শোকে কাতর—একথা জেনে আপনারা আমাদের ক্ষমা করে বনে যাওয়ার

অনুমতি দিন। আপনাদের কল্যাণ হোক। আমরা দুজনে আপনাদের শরণাগত। এই কুরুকুলভূষণ কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির আপনাদের রাজা, ভালো-মন্দ—সব সময়ে আপনারা এঁর ওপর কৃপা দৃষ্টি বজায় রাখবেন। লোকপালদের ন্যায় মহা তেজস্বী, ধর্ম ও অর্থের মর্মজ্ঞ ভীমসেন ইত্যাদি চার ভাই যাঁর মন্ত্রী, সেই রাজা যুধিষ্ঠির কখনো সংকটগ্রস্ত হন না ; তবুও আপনারা তাঁর জন্য খেয়াল রাখবেন। সমস্ত জগতের প্রভু ভগবান ব্রহ্মার ন্যায় এই মহা তেজস্বী যুধিষ্ঠির আপনাদের যথাবিহিত পালন করবেন। আমি এঁকে আপনাদের হাতে সমর্পণ করছি এবং আপনাদেরও এঁর হাতে সমর্পণ করছি। আপনারা অত্যন্ত গুরুভক্ত, তাই আমি হাত জোড় করে সকলকে প্রণাম করছি। আমার পুত্রদের বুদ্ধি চঞ্চল ছিল, তারা লোভী এবং স্বেচ্ছাচারী ছিল, তাদের অপরাধের জন্য আমি ও গান্ধারী উভয়ে আপনাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি।'

ধৃতরাষ্ট্র এইভাবে বলায় নগর ও প্রান্তের সকল ব্যক্তি চক্ষে অশ্রু নিয়ে একে অপরের দিকে দেখতে লাগলেন। কেউ কোনো উত্তর দিলেন না।

শাম্ব নামক ব্রাহ্মণের প্রজাদের হয়ে উত্তর প্রদান

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! কুরুরাজের করুণাপূর্ণ কথা শুনে সেখানে একত্রিত সকলে চাদর ও হাত দিয়ে নিজেদের মুখ ঢেকে দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। নিজের সন্তানকে বিদায় দেওয়ার সময় পিতামাতার যত দুঃখ হয়, কুরুজাঙ্গালনিবাসী মানুষেরাও ততটাই দুঃখিত হল। তারা শোকসন্তপ্ত হয়ে নিজেদের শূন্য হৃদয়ে ধৃতরাষ্ট্রের প্রবাসজনিত দুঃখ ধারণ করে হতবাক হয়ে পড়ল। তারপর ধীরে ধীরে সেই বিয়োগব্যথা প্রশমিত করে সকলে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নিজ নিজ মত ব্যক্ত করল। তারপর একমত হয়ে তারা এক ব্রাহ্মণের ওপর রাজার কথার উত্তর দেবার ভার সমর্পণ করল। সেই ব্রাহ্মণদেবতা সদাচারী, সকলের মাননীয় এবং অর্থজ্ঞানে নিপুণ ছিলেন। তাঁর নাম শাম্ব। তিনি ঋগ্বেদের বিদ্বান, নির্ভীক বক্তা এবং বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি উঠে মহারাজকে সম্মান জানিয়ে এবং সমস্ত সভাকে প্রসন্ন করে বলতে আরম্ভ করলেন —'রাজন্ ! এখানে উপস্থিত সকল ব্যক্তি তাদের কথা জানাবার সমস্ত ভার আমার ওপর ন্যস্ত করেছেন, তাই আমি তাঁদের কথা আপনাকে নিবেদন করছি। আপনি কৃপা করে শুনুন। মহারাজ ! আপনি যা বলেছেন, তা সবই ঠিক ; তাতে বিন্দুমাত্র অসত্য নেই। আমাদের সঙ্গে আপনাদের নিঃসন্দেহে ঘনিষ্ঠ স্নেহ-সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। এই রাজবংশে কখনো এমন রাজা হননি, যিনি শাসনকালে প্রজাদের প্রিয় ছিলেন না। আপনারা আমাদের পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় পালন করেছেন। রাজা দুর্যোধনও কখনো আমাদের সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করেননি। পরম ধর্মাত্মা মহর্ষি ব্যাসদেব আপনাকে যে পরামর্শ দিয়েছেন, আপনি তাই করুন ; কারণ তিনি আমাদের সকলের পরম গুরু। আপনার বিহনে আমরা অনেকদিন দুঃখ ও শোকে ডুবে থাকব। আপনার শত শত গুণের স্মৃতি আমরা কখনো ভুলব না। মহারাজ শান্তনু, রাজা চিত্রাঙ্গদ এবং ভীষ্মদ্বারা সুরক্ষিত আপনার পিতা বিচিত্রবীর্য যেভাবে এই পৃথিবী পালন করেছিলেন এবং আপনার তত্ত্বাবধানে থেকে রাজা পাণ্ডু যেভাবে এই রাজ্য রক্ষা করেছিলেন, আপনার পুত্রও আমাদের সেইভাবে পালন করেছেন। তিনি আমাদের একটুও কষ্ট দেননি। আমরা তাঁকে পিতার মতো বিশ্বাস করতাম এবং তাঁর রাজ্যে অত্যন্ত সুখে জীবন কাটিয়েছি, আপনি একথা জানেন। ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির বড় বড় দক্ষিণা প্রদান করে প্রাচীনকালের পুণ্যাত্মা রাজর্ষি কুরু ও সংবরণ প্রমুখ এবং রাজা ভরতের পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন। এঁদের রাজত্বে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র কোনো দোষ নজরে পড়ে না। তাঁদের রাজ্যে আপনার দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে আমরা সর্বদা সুখেই থেকেছি। আপনার অথবা আপনার পুত্রের কোনো সূক্ষ্ম অপরাধ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। মহাভারত যুদ্ধে যে জাতি-ভাই সংহার হয়েছে এবং সেই বিষয়ে আপনি যে দুর্যোধনের অপরাধের আলোচনা করলেন, সেই বিষয়ে আমি আপনাকে কিছু নিবেদন করতে চাই। কৌরবদের মৃত্যুতে দুর্যোধনেরও কোনো হাত নেই, আপনারও না ; কর্ণ বা শকুনিও কিছু করেননি। আমাদের মনে হয় এ সব দৈবের বিধান, যা কেউ লঙ্ঘন করতে পারে না। পুরুষার্থের দ্বারা

দৈবকে লঙ্ঘন করা অসম্ভব। সেই যুদ্ধে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য একত্রিত হয়েছিল ; কিন্তু ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কর্ণ এবং কৃপাচার্য প্রভৃতি কৌরব পক্ষের প্রধান যোদ্ধাগণ এবং সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেবাদি পাণ্ডব পক্ষের বীরগণ আঠারো দিনেই সকলকে সংহার করে। এরূপ ভয়ংকর সংহার দৈবী শক্তি ব্যতীত কখনো সম্ভব নয়। সুতরাং সেই রাজাদের সংহারের জন্য আপনার পুত্র দুর্যোধন, আপনি, আপনার সেবক, মহাবীর কর্ণ বা শকুনিও কারণ নন। সেই সময় যে হাজার হাজার রাজা মৃত্যুবরণ করেছিল, সে সবই দৈবের কাণ্ড বলে জানবেন। এই ব্যাপারে আর কে কী বলবে। আপনি এই জগতের প্রভু, তাই আমরা আপনাকে সব থেকে শ্রেষ্ঠ ও ধর্মাত্মা বলে মনে করি। আপনার ও আপনার পুত্রদের প্রতি হার্দিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি। পরমাত্মা করুন, মহারাজ দুর্যোধন ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদে তাঁর সাহায্যকারীসহ যেন বীরগতি প্রাপ্ত হন। আপনিও ধর্মে উচ্চ স্থান এবং পুণ্যলাভ করুন। আপনি সমস্ত ধর্ম সঠিক জানেন, তাই উত্তম ব্রত অনুষ্ঠানে রত হন। পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির আগের রাজাদের কাজ ঠিকমতো রক্ষা করছেন। তিনি দীর্ঘদর্শী, কোমল স্বভাববিশিষ্ট এবং জিতেন্দ্রিয়। তাঁর মন্ত্রীরাও উচ্চবিচারের, তাঁদের হৃদয়ও বিশাল। তাঁরা শত্রুদেরও দয়া করেন এবং তাঁরা পরম পবিত্র। এঁরা বুদ্ধিমান এবং আমাদের সর্বদা পুত্রবৎ পালন করেন। তাঁরা পাঁচ ভাই অত্যন্ত পরাক্রমশালী, মহাত্মা এবং পুরবাসীদের হিতে তৎপর। কুন্তী, দ্রৌপদী, উলূপী এবং সুভদ্রাও কখনো কোনো প্রজার সঙ্গে প্রতিকূল ব্যবহার করেন না। প্রজার সঙ্গে আপনার যে ব্যবহার ছিল, যুধিষ্ঠির তা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করেছেন। নগর ও প্রান্তের লোকেরা কখনো তাঁকে অবহেলা করতে পারবে না। অতএব মহারাজ ! আপনি যুধিষ্ঠিরের বিষয়ে চিন্তা পরিত্যাগ করুন এবং আপনার ধার্মিক কাজে ব্রতী হন। সমস্ত প্রজার আপনাকে প্রণাম।'

শাস্ত্রের ধর্মানুকূল ও গুণযুক্ত ভাষণ শুনে সমস্ত প্রজা তাঁকে সাধুবাদ দিতে লাগল এবং সকলেই তাঁর কথা অনুমোদন করল। ধৃতরাষ্ট্রও বারংবার শাস্ত্রের কথার প্রশংসা করতে লাগলেন এবং তিনি সমবেত সকলের দ্বারা সম্মানিত হয়ে ধীরে ধীরে সবাইকে বিদায় জানালেন। তারপর হাত জোড় করে সেই ব্রাহ্মণ-দেবতাকে আপ্যায়ন করলেন এবং গান্ধারীর সঙ্গে ধীরে ধীরে নিজ মহলে চলে গেলেন।

যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের ভীষ্ম ও অন্যান্যদের শ্রাদ্ধকর্ম করা

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! তারপর রাত্রি প্রভাত হলে অম্বিকানন্দন রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে যুধিষ্ঠিরের মহলে

পাঠালেন। রাজার নির্দেশে মহাতেজস্বী বিদুর যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে বললেন—'রাজন্ ! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বনবাসের দীক্ষা গ্রহণ করেছেন, আগামী কার্তিক পূর্ণিমাতে তিনি বনযাত্রা করবেন। এখন তোমার কাছে কিছু অর্থ চাইছেন। তাঁর ইচ্ছা মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, সোমদত্ত, বাহ্লীক এবং তাঁর মৃত পুত্রগণ ও সুহৃদগণের শ্রাদ্ধ করে তাঁদের নামে দান করা। তোমার অনুমতি থাকলে তিনি জয়দ্রথের শ্রাদ্ধও করবেন।' বিদুরের এই কথা শুনে যুধিষ্ঠির এবং অর্জুন অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁকে ধন্যবাদ দিতে লাগলেন। কিন্তু ভীমসেনের হৃদয়ে অত্যন্ত ক্রোধ জমা হয়েছিল। তাঁর দুর্যোধনের অত্যাচারের কথা মনে পড়ছিল। তাই তিনি বিদুরের কথা মেনে নিতে পারলেন না। তাঁর মনোভাব অর্জুন বুঝে গেলেন, তিনি তাই বিনীতভাবে বললেন—"ভ্রাতা ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র আমাদের জ্যেষ্ঠতাত এবং এখন তিনি বনবাসের দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। যাওয়ার আগে তিনি ভীষ্ম এবং অন্য সুহৃদদের শ্রাদ্ধ করতে চান ; আপনার

তাতে সহযোগিতা করা উচিত। সৌভাগ্যের কথা যে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র এখন আমাদের কাছে অর্থ সাহায্য চাইছেন। সময়ের বিপরীত ভাব লক্ষ্য করুন। আগে আমরা যার কাছে কিছু চাইতাম, আজ তিনিই আমাদের কাছে হাত পাতছেন। যিনি সমস্ত পৃথিবীর রাজা ছিলেন, তিনি আজ বনে যেতে চাইছেন ; সুতরাং আপনি তাঁকে অর্থ দেওয়া ছাড়া অন্য চিন্তা মনে আনবেন না। তাঁরা ইচ্ছা পূর্ণ না করলে আমরা অত্যন্ত কলঙ্কের এবং মহা অধর্মের ভাগী হব। আপনি রাজা যুধিষ্ঠিরের আচরণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন ; কারণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঈশ্বরের সমান হয়ে থাকেন।'

অর্জুনের কথা শুনে ধর্মরাজ তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করলেন। ভীমসেন তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—'অর্জুন ! আমরা নিজেরাই মহাত্মা ভীষ্ম, রাজা সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা, রাজর্ষি বাহ্লীক, মহাত্মা দ্রোণাচার্য ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের শ্রাদ্ধ করব। আমাদের মাতা কুন্তী কর্ণের পিণ্ডদান করবেন। তারজন্য রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে অর্থ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আমার মনে হয়, তাঁর উপরিউক্ত মহানুভবদের শ্রাদ্ধ না করাই উচিত। তুমি কি তাঁর সব কর্মগুলি ভুলে গেছ ? ইনিই আমাদের কুলে অগ্নিসংযোগকারী। তাঁর বুদ্ধি এমনই মন্দ যে কপট-দ্যূত আরম্ভ করিয়ে তিনি বারংবার বিদুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে 'এইবারে আমরা কী কী জিতলাম ?' ভীমকে এইকথা বলতে দেখে রাজা যুধিষ্ঠির তাকে ধমক দিয়ে বললেন—'ভীম ! চুপ করো।'

অর্জুন বললেন—ভ্রাতা ! আপনি আমার বড় এবং গুরুজন, তাই আমি আপনাকে বিশেষ কিছু বলতে সাহস পাই না। শুধু এই নিবেদন যে রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র আমাদের দ্বারা সর্বতোভাবে সম্মান পাওয়ার যোগ্য। সাধু স্বভাবসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অন্যের অপরাধ স্মরণ করেন না। বরং সকলের উপকারের কথাই স্মরণে রাখেন।

মহাত্মা অর্জুনের কথা শুনে ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির বিদুরকে বললেন—'খুল্লতাত ! আপনি আমার হয়ে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বলুন যে তিনি তাঁর পুত্রদের শ্রাদ্ধের জন্য যত অর্থ চান, তা আমি দিতে প্রস্তুত আছি। আমি আমার ভাণ্ডার থেকে এই অর্থ দেব। তারজন্য ভীমের দুঃখ পাবার কিছু নেই।' বিদুরকে একথা বলে ধর্মরাজ অর্জুনের অত্যন্ত প্রশংসা করলেন। ভীমসেন তখন একটু সংকুচিত হয়ে অর্জুনের দিকে আড়চোখে তাকাতে লাগলেন। তা লক্ষ্য করে রাজা যুধিষ্ঠির পুনরায় বিদুরকে বললেন—'আপনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে একথাও বলবেন যে আপনার বনবাসে যাওয়ার দুঃখ ভীমের ওপরে বিশেষ প্রভাব ফেলেছে ; তাই সে দুঃখে যা কিছু বলছে বা করছে, তা নিয়ে যেন কিছু না ভাবেন। আমার এবং অর্জুনের যত সম্পত্তি আছে, তার মালিক স্বয়ং মহারাজই। তিনি নিজ ইচ্ছানুযায়ী তা ব্যয় করুন এবং ব্রাহ্মণকে দান করুন ! আজ তিনি যেন তাঁর পুত্রাদি ও সুহৃদদের ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে যান। আমার শরীর ও অর্থ—এ সবই তাঁর, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।'

রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা বলায় বুদ্ধিমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে বললেন—''মহারাজ ! আমি যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে আপনার কথা বলছি। সেই কথা শুনে তিনি আপনার অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন। মহাতেজস্বী অর্জুন তো তাঁর গৃহ, সম্পত্তি এবং প্রাণ পর্যন্ত আপনার সেবায় সমর্পণ করতে প্রস্তুত। আপনার পুত্র যুধিষ্ঠিরেরও তাই মত। তিনি তাঁর রাজ্য, ধন-প্রাণ, যা কিছু আছে সবই আপনাকে দিয়ে দিতে চান। কিন্তু মহাবাহু ভীমসেন আগের সমস্ত কষ্টের কথা স্মরণ করে অত্যন্ত কষ্টে আপনার আদেশ মেনে নিয়েছেন। ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির ও অর্জুন তাঁকে ভালোভাবে বুঝিয়ে তাঁর মনে আপনার প্রতি সৌহার্দ্যের ভাব উৎপন্ন করে দিয়েছেন। ধর্মরাজ আপনাকে জানিয়েছেন যে 'ভীমসেন পূর্বের বৈরিতা স্মরণ করে যদি কখনো আপনার সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করে বসেন, তারজন্য আপনি ভীমের ওপর ক্রোধ করবেন না। ভীমসেনের খারাপ ব্যবহারের জন্য আমি ও অর্জুন দুজনে বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনি প্রসন্ন হোন। আমার যা আছে, আপনিই তার প্রভু। আপনি যত ধনদান করতে ইচ্ছুক, দান করুন। আপনিই আমার রাজ্য ও প্রাণের অধীশ্বর। পুত্রদের শ্রাদ্ধ করুন, ব্রাহ্মণদের জমিদান করুন।' যুধিষ্ঠির একথাও বলেছেন—'মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আমার থেকে নানাপ্রকার রত্ন, গাভী, দাস-দাসী নিয়ে ব্রাহ্মণদের দান করুন।' তিনি আমাকে বলেছেন—'বিদুর ! আপনি দীন-দুঃখী-কাঙালদের জন্য বিভিন্ন স্থানে প্রচুর অন্ন-পানীয়পূর্ণ ধর্মশালা নির্মাণ করিয়ে দিন এবং গাভীদের খাবার ও জলের জন্য জায়গা তৈরি করিয়ে দিন। সেই সঙ্গে অন্যান্য পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানও করুন।' আমাকে রাজা যুধিষ্ঠির ও অর্জুন যা বলেছিলেন, সে সবই আপনাকে জানালাম। এবার কী করতে হবে, বলুন।''

বিদুরের কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের অত্যন্ত প্রশংসা

করলেন এবং কার্তিক পূর্ণিমাতে বিশাল দান করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের কাজে অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। ভীষ্ম ও অন্যান্যদের শ্রাদ্ধের জন্য ধৃতরাষ্ট্র যোগ্য ব্রাহ্মণ এবং শ্রেষ্ঠ ঋষিদের হাজার হাজার সংখ্যায় নিমন্ত্রণ করে তাঁদের অন্ন, পান, গাড়ি, পরিধানের বস্ত্র, মণি, রত্ন, স্বর্ণ, কম্বল, গ্রাম, জমি, ধন ও অলংকার-সহ হাতি ঘোড়া প্রভৃতি প্রদানের ব্যবস্থা করলেন। তারপর এক একজন মৃত ব্যক্তির নাম করে সকলের জন্য পৃথক পৃথকভাবে দান করলেন। দ্রোণ, ভীষ্ম, সোমদত্ত, বাহ্লীক, রাজা দুর্যোধন ও অন্য পুত্রদের এবং জয়দ্রথ প্রভৃতি সকল আত্মীয়স্বজনের নাম উচ্চারণ করে সকলের উদ্দেশ্যে দান করলেন। যুধিষ্ঠিরের সম্মতিতে সেই শ্রাদ্ধ-যজ্ঞে বহু ধন ও নানাপ্রকারের রত্ন দক্ষিণা দেওয়া হল। ধর্মরাজের নির্দেশে বহু আজ্ঞাবহ সেখানে সর্বক্ষণ উপস্থিত থেকে ধৃতরাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করতে থাকলেন যে 'বলুন, এদের কী দেওয়া হবে ? সবই প্রস্তুত রয়েছে।' ধৃতরাষ্ট্রের মুখ থেকে কথা নিঃসৃত হতেই দান করা হত। বুদ্ধিমান যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে শতের স্থানে সহস্র এবং সহস্রের স্থানে দশ সহস্র দান করা হত। মেঘ যেমন জলবর্ষণ করে জমি ভরিয়ে দেয়, তেমনই রাজা ধৃতরাষ্ট্র অর্থবর্ষণ করে সমস্ত ব্রাহ্মণদের তৃপ্ত করে দিয়েছিলেন। পরে সকল বর্ণের লোককে নানাপ্রকার খাদ্য-পানীয়ের দ্বারা সন্তুষ্ট করেছিলেন। এইভাবে তিনি পুত্র, পৌত্র এবং পিতৃপুরুষের, এমনকি নিজের ও গান্ধারীরও শ্রাদ্ধ করলেন। বহুপ্রকার দান করে যখন তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, তখন তিনি দানযজ্ঞ বন্ধ করে দিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সেই মহাদানযজ্ঞ এইভাবে পূর্ণ হল। এক নাগাড়ে দশ দিন ধরে দান করে তিনি পুত্র ও পৌত্রাদির ঋণ থেকে নিজেকে মুক্ত বোধ করলেন।

—o—

ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর কুন্তী প্রভৃতির সঙ্গে বনগমন এবং কুন্তীর যুধিষ্ঠিরাদিকে বুঝিয়ে গৃহে ফেরত পাঠানো

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! তারপর একাদশ দিনের প্রাতে রাজা ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীসহ বনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে পাণ্ডবদের ডেকে পাঠালেন এবং তাঁদের অভিনন্দিত করলেন। সেইদিন ছিল কার্তিক পূর্ণিমা। তিনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দ্বারা যাত্রাকালোচিত ইষ্টি (যজ্ঞ) করিয়ে বল্কল ও মৃগচর্ম ধারণ করলেন এবং অগ্নিহোত্র সঙ্গে করে রাজমহল থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন ; পরে ফুলের দ্বারা সেই গৃহের পূজা করে তাঁরা ভৃত্যদের অর্থদান করলেন এবং সকলের কাছে বিদায় গ্রহণ করে রওনা হলেন। রাজা যুধিষ্ঠির হাত জোড় করে কম্পিত দেহে জলপূর্ণ নেত্রে দাঁড়িয়েছিলেন, অশ্রুতে তাঁর গলা ধরে গিয়েছিল। ভীমসেন, অর্জুন, নকুল, সহদেব, বিদুর, সঞ্জয়, যুযুৎসু, কৃপাচার্য, ধৌম্য এবং আরও বহু ব্রাহ্মণ অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তাঁদের পেছন পেছন যেতে লাগলেন। আগে আগে কুন্তী গান্ধারীর হাত ধরে চলছিলেন, গান্ধারীর চোখে কাপড়ের বন্ধনী ছিল। তিনি কুন্তীর কাঁধে হাত রেখে যাচ্ছিলেন আর রাজা ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর কাঁধে হাত দিয়ে নিশ্চিন্তে চলছিলেন। দ্রৌপদী, সুভদ্রা, চিত্রাঙ্গদা, শিশুপুত্র কোলে উত্তরা এবং কুরুকুলের অন্য নারীগণ নিজ নিজ পুত্রবধূদের

নিয়ে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে যাচ্ছিলেন এবং দুঃখের আবেগে তাঁরা বিলাপ করছিলেন। কুরুনারীদের ক্রন্দনের ধ্বনি শুনে চারদিক থেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্র নারীরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। যেসব রমণী কখনো অন্তঃপুরের বাইরে এসে সূর্য বা চন্দ্র পর্যন্ত দেখেননি,

তাঁরাও কৌরবরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বনে প্রস্থান করার সময় শোকে ব্যাকুল হয়ে উন্মুক্ত রাজপথে বেরিয়ে এলেন।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র বর্ধমান নামক দ্বার পথে হস্তিনাপুর নগরের বাইরে এলেন। সেখানে এসে তিনি বারংবার সান্ত্বনা দিয়ে তাঁর সঙ্গে আসা জনগণকে বিদায় জানালেন। বিদুর এবং সঞ্জয় রাজার সঙ্গেই বনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তাই তাঁরা দুজন ফিরলেন না ; কিন্তু কৃপাচার্য ও মহারথী যুযুৎসুকে তাঁরা যুধিষ্ঠিরের নিকট সমর্পণ করে ফিরিয়ে দিলেন। পুরবাসীগণ ফিরে গেলে রাজা যুধিষ্ঠির মহলের নারীদের নিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং বনের দিকে যেতে থাকা তাঁরা মাতা কুন্তীকে বললেন—'মাতা ! আপনি আপনার বধূদের সঙ্গে নগরে ফিরে যান। আমি মহারাজের সঙ্গে যাব। এই ধর্মাত্মা রাজা তপস্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সুতরাং এঁকে বনে যেতে দিন।' ধর্মরাজের কথা শুনে কুন্তীর চোখ জলে ভরে উঠল, তা সত্ত্বেও তিনি গান্ধারীর হাত ধরে পথ চলতে লাগলেন। যেতে যেতেই তিনি যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'মহারাজ ! তুমি সহদেবকে কখনো অনাদর কোরো না, সে তোমার ও আমার পরমভক্ত। সংগ্রামে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেনি যে কর্ণ, তোমার সেই ভ্রাতাকে সর্বদা স্মরণে রেখো ; কারণ আমারই দুর্বুদ্ধিবশত সেই বীর যুদ্ধে নিহত হয়েছে। পুত্র এই অভাগিনীর হৃদয় অবশ্যই লৌহনির্মিত, তাই আজ কর্ণকে হারিয়েও এটি শত টুকরো হয়নি। তুমি তোমার ভাইদের নিয়ে তার জন্য দান-পুণ্য করবে। আমার বধূ দ্রৌপদীরও সর্বদা প্রিয়কাজ করবে। ভীম, অর্জুন ও নকুলদের সর্বদা কুশলে রাখবে ; আজ থেকে সমস্ত কুরুকুলের ভার তোমারই ওপর। এখন আমি গান্ধারীর সঙ্গে বনে থেকে তপস্যা করব এবং তাঁদের শ্রীচরণের সেবায় ব্যাপৃত থাকব।'

কুন্তীর এবংবিধ বাক্যে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। কিছুক্ষণ মৌন থেকে তিনি কিছু ভাবলেন ; পরে শোকাকুল হয়ে মাতাকে বললেন—'মাতা ! আপনি এসব কী মনে স্থান দিয়েছেন ? আপনার এমন করা উচিত নয়। আমি এরজন্য অনুমতি দিতে পারবো না। আমাদের প্রতি কৃপা করে ফিরে চলুন। আগে আপনিই বিদুলার প্রদত্ত উপদেশ স্মরণ করিয়ে আমাদের ক্ষত্রিয়-ধর্ম পালনে উৎসাহিত করতেন। পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখেই আপনার সিদ্ধান্ত শুনে আমরা রাজাদের সংহার করে এই রাজ্য অধিকার করেছি। কোথায় আপনার সেই পরামর্শ আর কোথায় আপনার আজকের এই সিদ্ধান্ত ! আমাদের ক্ষত্রিয় ধর্মে স্থিত হওয়ার উপদেশ দিয়ে আপনি নিজেই তার থেকে সরে যেতে চাইছেন। আমাদের, আপনার এই বধূদের এবং এই রাজ্য ছেড়ে আপনি ওই দুর্গম বনে কীভাবে থাকবেন ? সুতরাং আমাদের কৃপা করুন।'

নিজ পুত্রের এই অশ্রুগদগদ কথা শুনে কুন্তীর চোখে জল ভরে এল। কিন্তু কুন্তী থামলেন না, এগোতেই লাগলেন। তখন ভীমসেন বললেন—'মাতা ! যখন পুত্রদের জয় করা এই রাজ্য ভোগ করার সময় এল, রাজধর্ম পালনের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হল, তখন আপনার বুদ্ধি কীভাবে পরিবর্তিত হল ? কী কারণে আপনি আমাদের পরিত্যাগ করে বনে যেতে চান ? যদি বনেই থাকার ছিল, তাহলে বাল্যকালে আমাদের এবং দুঃখ-শোকে কাতর এই মাদ্রীকুমারদের কেন নগরে নিয়ে এলেন ? মাতা ! আমাদের ওপর প্রসন্ন হোন এবং ধর্মযুদ্ধে প্রাপ্ত রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজলক্ষ্মী উপভোগ করুন।' একথা শুনেও কুন্তী তাঁর বনবাসের সিদ্ধান্ত থেকে বিচলিত হলেন না। তাঁর পুত্ররা নানাভাবে বিলাপ করলেও, কুন্তী তাঁদের কথা শুনলেন না। শাশুড়িকে এইভাবে বনবাসে যেতে দেখে দ্রৌপদীও অত্যন্ত বিষণ্ণ হলেন এবং সুভদ্রার সঙ্গে কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে অনুগমন করতে লাগলেন। কুন্তী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও ধৈর্যশীলা ছিলেন, তাই তিনি ক্রন্দনরত পুত্রদের দেখেও মুষড়ে পড়লেন না। পাণ্ডবরা তাঁদের সেবক এবং অন্তঃপুরের নারীদের নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলেন। তখন চোখ মুছে কুন্তী তাঁর পুত্রদের বললেন—'মহাবাহু ! তোমাদের কথা ঠিক। পূর্বে তোমরা নানাপ্রকার কষ্ট সহ্য করেছিলে, তাই আমি তোমাদের যুদ্ধে উৎসাহিত করেছিলাম। পাশা খেলায় তোমরা রাজ্য হারিয়েছিলে, তোমরা সুখ-সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়েছিলে, তোমাদের আত্মীয়-বন্ধু তোমাদের অসম্মান করত ; সেইজন্য আমি তোমাদের যুদ্ধের জন্য উৎসাহ দিয়েছিলাম। পাণ্ডুর সন্তানেরা যাতে বিনাশ প্রাপ্ত না হয় এবং তোমাদের সুযশ যেন নাশ না হয় সেই উদ্দেশ্যেই আমি তোমাদের যুদ্ধে উৎসাহিত করেছিলাম (এতে আমার কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল না)। আমি আমার স্বামী মহারাজ পাণ্ডুর বিশাল রাজ্য ভোগ করেছি। আমি নিজের লাভের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে প্রেরণ করিনি। বিদুলার কথা শুনিয়ে তার দ্বারা তোমাদের যে

সংবাদ পাঠিয়েছিলাম, সেসবই তোমাদের রক্ষার জন্য। পুত্র যুধিষ্ঠির ! এখন আমি তপস্যা করে আমার পতির পবিত্র লোকে যেতে চাই। তাই বনবাসে এঁদের সেবা করে তপস্যার দ্বারা এই শরীর শুষ্ক করব। তুমি ভীমসেনদের নিয়ে ফিরে যাও। আমি আশীর্বাদ করছি—তোমার বুদ্ধি ধর্মে স্থিত হোক এবং তোমার হৃদয় আরও উদার হোক।'

গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র প্রমুখের গঙ্গাতীরে বিশ্রাম নিতে নিতে কুরুক্ষেত্রে পৌঁছে ভয়ানক তপস্যা করা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! কুন্তীর কথা শুনে পাণ্ডবরা অত্যন্ত কাতর হলেন এবং তাঁকে ফেরাতে সফল না হয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে প্রদক্ষিণ এবং প্রণাম করে দ্রৌপদীসহ নগরে ফিরে গেলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও বিদুরের সাহায্য নিয়ে বললেন—'গান্ধারী ! যুধিষ্ঠিরের মাতা কুন্তীকে ফিরে যেতে দাও। যুধিষ্ঠির ঠিক কথাই বলছে। কুন্তী রাজ্যে বাস করে বড় বড় দান এবং তপস্যা করতে সক্ষম। ভ্রাতৃবধূ কুন্তীর সেবা-শুশ্রূষাতে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট, সুতরাং তুমি ওঁকে গৃহে যাবার নির্দেশ দাও।' রাজার কথায় গান্ধারী দেবী কুন্তীকে সেই সংবাদ জানালেন এবং নিজেও তাঁকে ফিরে যাওয়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ করলেন। কিন্তু ধর্মপরায়ণা সতী কুন্তীদেবী বনবাসের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন, তাই গান্ধারীও তাঁকে ফেরাতে পারলেন না। কুরুকুলের নারীরা কুন্তীর এই সিদ্ধান্তের কথা জেনে পাণ্ডবদের নিরাশ হয়ে ফিরতে দেখে কাঁদতে লাগলেন। বধূদের নিয়ে পাণ্ডবরা ফিরে গেলে, ধৃতরাষ্ট্র বনের দিকে রওনা হলেন। সেই সময় পাণ্ডবরা অত্যন্ত দীন ও দুঃখ-শোকে মগ্ন ছিলেন। তাঁরা বাহনে করে নারীগণ-সহ নগরে প্রবেশ করলেন। সেইদিন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাসহ সমস্ত হস্তিনাপুর নগর হর্ষ ও আনন্দরহিত, উৎসবশূন্য এবং উদাসীন হয়ে গেল। কারো কোনো উৎসাহ ছিল না। কুন্তী বিহনে পাণ্ডবদের অবস্থা আরও করুণ হয়েছিল।

অন্যদিকে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র সেদিন বহু দূর পথ যাত্রা করে গঙ্গার তীরে বিশ্রাম নিলেন। সেখানকার তপোবনে বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণের দ্বারা বিধিপূর্বক সৃষ্ট অগ্নি যত্র তত্র প্রজ্বলিত ছিল। বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রও অগ্নি সৃষ্টি করে তার বিধিবৎ আরাধনা করে তাতে আহুতি দিলেন। তারপর সূর্যদেব সন্ধ্যায় অস্ত গেলে তার উপস্থান করলেন। বিদুর ও সঞ্জয় রাজার জন্য কুশের শয্যা প্রস্তুত করলেন। গান্ধারীর জন্যও তাঁর পাশে পৃথক আসন বিছালেন। উত্তম ব্রত পালনকারী কুন্তী গান্ধারীর কাছে কুশাসনে শয়ন করে, তাতেই সুখ মনে করলেন। বিদুর ও অন্যান্য সকলে তাঁদের কাছাকাছি শয়ন করলেন, যাতে তাঁদের আওয়াজ শোনা

যায়। যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণ এবং রাজার সঙ্গে আসা বিপ্রগণও যথাযোগ্য স্থানে শয়ন করলেন। সেই তপোবনে প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণ স্বাধ্যায় করতেন, তাই বহুস্থানে অগ্নিহোত্রের অগ্নি প্রজ্বলিত ছিল। তাই সেই রাত্রি তাঁদের কাছে অত্যন্ত আনন্দদায়ক ছিল। প্রভাত হলে সকলে পূর্বাহ্ণের ক্রিয়া সমাপ্ত করে বিধিপূর্বক অগ্নিহোত্র করে উত্তর দিকে এগোতে লাগলেন। কেউ আহার করেননি, সকলেই উপবাসব্রত পালন করছিলেন।

তারপর, দিন কেটে গেলে বিদুরের কথায় রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদের বাসযোগ্য ভাগীরথীর পবিত্র তীরে বাস করতে লাগলেন। সেখানকার বনবাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বহু সংখ্যায় একত্রিত হয়ে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে নানা কথাবার্তার দ্বারা তাঁদের প্রসন্ন করলেন এবং ব্রাহ্মণ ও তাঁদের শিষ্যদের শাস্ত্রীয় রীতিতে পূজার দ্বারা সন্তুষ্ট করে বিদায় জানালেন। তারপর সায়ংকালে রাজা ও গান্ধারীদেবী

জলে পুণ্য স্নান করলেন এবং বিদুর ও অন্যান্যেরাও গঙ্গার বিভিন্ন ঘাটে স্নান করে সন্ধ্যা উপাসনা ও সমস্ত শুভক্রিয়া সম্পন্ন করলেন। স্নানাদির পর কুন্তী বৃদ্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীদেবীকে গঙ্গা কিনারে নিয়ে এলেন। সেখানে যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণগণ রাজার জন্য এক যজ্ঞবেদী প্রস্তুত করেছিলেন, সেখানে অগ্নিস্থাপন করে তিনি বিধিবৎ অগ্নি হোত্র করলেন। নিত্যকর্মের থেকে নিবৃত্ত হয়ে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ইন্দ্রিয় সংযমপূর্বক নিয়মাদি পালন করে তাঁর অনুগামীদের নিয়ে গঙ্গাতীর থেকে কুরুক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে এক আশ্রমে রাজর্ষি শতযূপের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। এই রাজর্ষি আগে কেকয়দেশের রাজা ছিলেন। নিজ পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে তিনি বনে চলে আসেন। ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে সঙ্গে নিয়ে মহর্ষি ব্যাসদেবের আশ্রমে গেলেন এবং সসম্মানে তাঁর পূজা-অর্চনা করলেন। তারপর তাঁর কাছ থেকে বনবাসের দীক্ষা গ্রহণ করে শতযূপের আশ্রমে এসে থাকতে লাগলেন। মহামতি রাজা শতযূপ ব্যাসদেবের নির্দেশে ধৃতরাষ্ট্রকে বনবাসের সমস্ত বিধি জানালেন। তখন মহামনা ধৃতরাষ্ট্র নিজেই তপ করতে লাগলেন এবং তাঁর অনুচরদেরও তপস্যায় নিয়োজিত করলেন। গান্ধারী দেবীও কুন্তীর সঙ্গে মৃগছাল ও বল্কল ধারণ করে ধৃতরাষ্ট্রের মতোই ব্রত পালন করতে লাগলেন। উভয় নারী ইন্দ্রিয় সংযত করে কায়-মনো-বাক্যে, কর্ম ও নেত্রের দ্বারা কঠোর তপস্যা

করতে লাগলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের দেহ শুষ্ক হয়ে গেল, তিনি অস্থি-চর্মবিশিষ্ট হয়ে মস্তকে জটা ও মৃগচর্ম-বল্কল ধারণ করে মহর্ষিদের ন্যায় তীব্র তপস্যায় রত হলেন। তাঁর চিত্তের সমস্ত মোহ দূর হয়েছিল। ধর্ম ও অর্থের জ্ঞাতা এবং উত্তম বুদ্ধিবিশিষ্ট বিদুরও সঞ্জয়সহ বল্কল ও চীরবস্ত্র ধারণ করে গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের সেবায় ব্যাপৃত থাকতেন এবং মনকে নিজ বশে রেখে দুর্বল শরীরে ঘোর তপস্যা করতেন।

দেবর্ষি নারদের ধৃতরাষ্ট্রকে তপস্যার মহত্ত্ব জানানো এবং পাণ্ডবদের ধৃতরাষ্ট্রের কাছে যাওয়ার প্রস্তুতি

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! অতঃপর রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য নারদ, পর্বত, মহাতপস্বী দেবল, সশিষ্য মহর্ষি ব্যাসদেব ও অন্যান্য সিদ্ধ মহর্ষি সেখানে এলেন। পরম ধার্মিক রাজর্ষি শতযূপও তাঁদের সঙ্গে এসেছিলেন। কুন্তীদেবী তাঁদের সকলকে যথারীতি স্বাগত-সৎকার করলেন, ঋষিগণও কুন্তীর সেবা ও তপস্যায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। তাঁরা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মন ভালো করার জন্য অনেক ধার্মিক কথা শোনালেন। সব কিছু প্রত্যক্ষ দর্শনকারী দেবর্ষি নারদ কোনো কথা প্রসঙ্গে বলতে লাগলেন—'রাজন ! রাজর্ষি শতযূপের পিতামহ মহারাজ সহস্রচিও কেকয়দেশের রাজা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত শ্রীসম্পন্ন ছিলেন আর কাউকে ভয় পেতেন না। তিনি তাঁর পরম ধার্মিক জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্য দিয়ে তপস্যা করার জন্য বনে প্রবেশ করেন এবং সেখানে তীব্র তপস্যা করে ইন্দ্রলোক লাভ করেছেন। তপস্যার দ্বারা তাঁর সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হয়েছে। আমি ইন্দ্রলোকে যাতায়াতের পথে অনেক বার সেই পরম প্রসন্ন রাজর্ষিকে দেখেছি। তেমনই ভগদত্তের পিতামহ রাজা শৈলালয়ও তপস্যা বলে ইন্দ্রলোকে গেছেন। রাজা পৃষঘ্র ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী ছিলেন, তিনিও তপস্যা করে স্বর্গলোক লাভ করেছেন।

থেকে ওখানে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সংকোচবশত আপনাকে বলতে পারিনি। সৌভাগ্যবশত এই সুযোগ আপনিই এসে গেল। মাতা কুন্তী তপস্যায় রত হয়েছেন, তাঁর মাথার চুল হয়তো জটায় পরিণত হয়েছে, তাঁর বৃদ্ধ শরীর কুশ ও কাশের শয্যায় শয়ন করে বোধহয় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে ; তাঁর দর্শন লাভ করলে নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করব।'

সহদেবের কথা শুনে দ্রৌপদী দেবী রাজার সৎকার করে তাঁকে প্রসন্ন করে বললেন—'প্রভু ! আমি কবে আমাদের রাজমাতা দর্শন করব ? তাঁরা কি এখনও জীবিত আছেন ? এ জীবনে তাঁদের দর্শন লাভ করলে আমি অত্যন্ত খুশি হব। অন্তঃপুরের সকল বধূই বনে যাওয়ার জন্য উৎসুক। সকলের মনে কুন্তী, গান্ধারী ও মহারাজকে দর্শন করার জন্য উৎকণ্ঠা রয়েছে।'

দ্রৌপদীর কথা শুনে ধর্মরাজ সমস্ত সেনাপতিদের ডেকে বললেন—'তোমরা অনেক রথ এবং হাতি ঘোড়ায় সুসজ্জিত সেনা তৈরি করো। আমি বনবাসী মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে দর্শন করতে যাব।' তারপর অন্তঃপুরের অধ্যক্ষদের নির্দেশ দিলেন—'তোমরা সকলে বহু সংখ্যায় নানাপ্রকার পালকি ও বাহন প্রস্তুত করো। (প্রয়োজনীয় সামগ্রীতে ভরে) বাজার, দোকান, রাজকোষ, কারিগর এবং কোষাধ্যক্ষ—এরা যেন কুরুক্ষেত্রের আশ্রমের দিকে রওনা হয়ে যায়। নগরবাসীদের মধ্যে যারা মহারাজকে দর্শন করতে চায়, তাদেরও বিনাবাধায় সুরক্ষিতভাবে নিয়ে যাওয়া হোক। পাকশালার অধ্যক্ষ এবং রন্ধনপ্রস্তুতকারী প্রয়োজনীয় সব জিনিস গাড়িতে যেন নিয়ে রওনা হয়ে যায়। নগরে ঘোষণা করা হোক যে 'কাল প্রভাতে যাত্রা করা হবে, তাই যারা যাবে, তারা যেন বিলম্ব না করে। পথে আমাদের থাকার জন্য আজই কিছু শিবির তৈরি করা হোক।' এই ভাবে নির্দেশ দিয়ে প্রভাত হতেই ভ্রাতাগণ-সহ রাজা যুধিষ্ঠির নারী ও বৃদ্ধদের সামনে রেখে নগর থেকে প্রস্থান করলেন। নগরের বাইরে তিনি পাঁচ দিন ধরে পুরবাসী মানুষদের জন্য প্রতীক্ষা করলেন। তারপর সকলকে নিয়ে বনে রওনা হলেন।

সপরিবারে কুরুক্ষেত্রে পৌঁছে পাণ্ডবদের ধৃতরাষ্ট্র ও অন্যান্যদের দর্শন এবং সব ঋষিদের সঙ্গে সঞ্জয়ের পরিচয় করানো

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! তারপর রাজা যুধিষ্ঠির লোকপালদের ন্যায় পরাক্রমশালী অর্জুন ও অন্যান্য বীরদের দ্বারা সুরক্ষিত সেনাদের এগিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন। আদেশ পেয়েই সকলে রওনা হল। কিছু লোক বাহনে করে, কিছু পদব্রজে রওনা হল। কেউ বেগসম্পন্ন ঘোড়ায়, কেউ স্বর্ণময় রথে, কেউ গজে আবার কেউ উটে চড়ে যাত্রা করল। নগর এবং নগর প্রান্তের লোকেরাও ধৃতরাষ্ট্রকে দর্শন করার জন্য নানা বাহনে করে যুধিষ্ঠিরদের অনুসরণ করল। রাজার কথায় সেনাপতি কৃপাচার্যও সেনাসহ আশ্রমের দিকে রওনা হলেন। কুরুরাজ যুধিষ্ঠির বহু ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে যাত্রা করলেন। বহু সূত, মাগধ, বন্দি রাজার স্তুতিগান করতে করতে সঙ্গে যাচ্ছিলেন। রাজার মাথায় শ্বেতছত্র ধারণ করেছিল এবং তাঁর সঙ্গে ছিল বহু রথী সৈন্য। ভীষণকর্মা ভীমসেন এক পর্বতাকার গজরাজে যাচ্ছিলেন। নকুল-সহদেব ঘোড়ায় উপবিষ্ট ছিলেন। মহাতেজস্বী অর্জুন শ্বেত অশ্ববাহিত, সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান রথে রাজা যুধিষ্ঠিরকে অনুসরণ করছিলেন। দ্রৌপদী প্রভৃতি নারীরা শিবিকায় চড়ে দরিদ্রদের ধন বিতরণ করতে করতে যাচ্ছিলেন, অন্তঃপুরের অধ্যক্ষ ছিলেন তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে। বহু বাদ্যের তুমুল ধ্বনিযুক্ত হওয়ায় তাঁদের যাত্রা অত্যন্ত শোভাযুক্ত হয়েছিল। তাঁরা নানা নদী তীরে শিবির স্থাপন করতে করতে এগোতে লাগলেন। মহাতেজস্বী যুযুৎসু এবং পুরোহিত ধৌম্য মুনি যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে হস্তিনাপুর নগর রক্ষায় ছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির চলতে চলতে পরম পবিত্র যমুনা নদী পার হয়ে কুরুক্ষেত্রে পৌঁছে দূর থেকেই রাজর্ষি শতযূপ এবং কুরুবংশী ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রম দেখতে পেলেন। আশ্রম দর্শনে সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। সকলেই বাহন থেকে নেমে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে পদব্রজে রাজার আশ্রমে গেলেন। ধৃতরাষ্ট্রের পবিত্র আশ্রমের চারদিকে মৃগের দল দেখা

যাচ্ছিল এবং কলাগাছ সেই স্থানের শোভাবর্ধন করছিল। পাণ্ডবগণ আশ্রমে পৌঁছলে বহু ব্রতধারী তপস্বী কৌতূহলবশত তাঁদের দেখতে সেখানে একত্রিত হলেন। রাজা যুধিষ্ঠির অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন—'মুনিবরগণ! আমাদের জ্যেষ্ঠতাত কোথায়?' তাঁরা উত্তর দিলেন—'রাজন্! তিনি স্নান করতে, ফুল তুলতে এবং জল আনতে যমুনা নদীর তীরে গেছেন।'

তাঁদের কথা শুনে তখন সকলেই যমুনার দিকে গেলেন। কিছুদূর যেতেই তাঁরা ধৃতরাষ্ট্রদের ফিরে আসতে দেখলেন। সকলেই তাঁকে দর্শনের আশায় দ্রুত সেইদিকে এগিয়ে চললেন। সহদেব অতি শীঘ্রই কুন্তীর কাছে গিয়ে পৌঁছলেন এবং তাঁর পায়ের ওপর পড়ে কাঁদতে লাগলেন। প্রিয় পুত্রকে এমতাবস্থায় দেখে কুন্তীও কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জুন ও নকুলকে দেখে তিনি আকুল হয়ে তাঁদের দিকে এগিয়ে গেলেন। মাতাকে আসতে দেখে পাণ্ডবরা মাটিতে মাথা রেখে প্রণাম করলেন। তারপর চোখের জল মুছে তাঁরা গান্ধারী, ধৃতরাষ্ট্র এবং কুন্তীর চরণস্পর্শ করে প্রণাম করার পর তাঁদের হাত থেকে জলপূর্ণ কলস নিয়ে নিলেন। হস্তিনাপুরের সকল লোক এবং অন্তঃপুরের নারীরা তাঁদের দর্শন করলেন, রাজা যুধিষ্ঠির সকলের নাম জানিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁদের কাছে পেয়ে ধৃতরাষ্ট্রের চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হল, তাঁর মনে হল তিনি যেন হস্তিনাপুরের রাজসভাতেই আসীন। দ্রৌপদী ও অন্যান্য রাজবধূরা ধৃতরাষ্ট্রদের প্রণাম করলে তাঁরা আশীর্বাদ জানালেন। তারপর তাঁরা আশ্রমে ফিরে এলেন, তখন মনে হল সেই আশ্রমটি যেন তারায় পরিপূর্ণ আকাশের মতো দর্শকদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে আছে।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র পঞ্চভ্রাতার সঙ্গে আশ্রমে বিরাজমান হলে বহু দেশের মহাভাগ্যশালী তপস্বীগণ পাণ্ডবদের দর্শনের নিমিত্ত সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন—'এখানে আগত লোকেদের মধ্যে যুধিষ্ঠির কে এবং ভীমসেন, অর্জুন, নকুল, সহদেব, যশস্বিনী দ্রৌপদী দেবী কোথায়? আমরা সকলের পরিচয় জানতে আগ্রহী।'

তাঁদের এবংবিধ প্রশ্নের উত্তরে সঞ্জয় সমস্ত পাণ্ডব এবং দ্রৌপদী প্রমুখ কুরুকুলের নারীদের পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন—'এই স্বর্ণের ন্যায় গৌর, উচ্চ নাসিকা, বিশাল লালিমা যুক্ত নেত্র, সিংহের মতো উপবিষ্ট, ইনি কুরুরাজ যুধিষ্ঠির। মত্ত গজের ন্যায় চাল চলন, তপ্ত স্বর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ, বৃষস্কন্ধ, বিশাল বাহু সমন্বিত, ইনি ভীমসেন। তাঁর পাশে মহাধনুর্ধর, শ্যামবর্ণের তরুণ, সিংহের ন্যায় স্কন্ধ, কমলের ন্যায় নেত্র, ইনি বীরবর অর্জুন। কুন্তীর কাছে যে দুজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ উপবিষ্ট, তাঁরা একসঙ্গে উৎপন্ন নকুল ও সহদেব। রূপ, বল ও শীলতায় এঁদের দুজনের সমকক্ষ পৃথিবীতে আর কেউ নেই। নীলকমলের ন্যায় এই শ্যামরূপা সুন্দরী, যিনি মূর্তিমতী লক্ষ্মী, দেবতাদেরও দেবী বলে প্রতীত, তিনি মহারানি দ্রৌপদী। তাঁর পাশে স্বর্ণের থেকেও অতীব কান্তিময়ী চন্দ্রের প্রভার ন্যায় বিরাজমান, ইনি অনুপম প্রভাবশালী চক্রধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রা। ওইদিকে বিশুদ্ধ স্বর্ণকান্তি সুন্দরী দেবী নাগরাজকন্যা উলূপী বসে আছেন। যাঁর শরীরের রং মধুক-পুষ্পের শোভাকেও হার মানায়—তিনি রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদা, এঁরা দুজনেই অর্জুনের পত্নী। এই যে ইন্দীবরের ন্যায় শ্যামবর্ণা রাজমহিলা বিরাজমান, ইনি রাজসেনাপতির ভগিনী, ভীমসেনের পত্নী, তাঁর সঙ্গে চম্পকবর্ণা যে সুন্দরী উপবিষ্ট, তিনি মগধরাজ জরাসন্ধের কন্যা এবং সহদেবের পত্নী। তাঁর পাশে নীলপদ্মের ন্যায় শ্যামবর্ণা নারী, মাদ্রীর জ্যেষ্ঠ পুত্র নকুলের পত্নী এবং এই তপ্ত কুন্দনের ন্যায় গৌরবর্ণা তরুণী বালক ক্রোড়ে উপবিষ্ট, ইনি রাজা বিরাটের কন্যা এবং অভিমন্যুর পত্নী উত্তরা। এঁরা ছাড়া আরও যেসব শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা বিধবা উপবিষ্ট, যাঁদের সীমান্ত সিঁদুর শূন্য—তাঁরা সকলে দুর্যোধনাদি শত ভ্রাতার পত্নী এবং বৃদ্ধ মহারাজের পুত্রবধূ। এঁদের সকলেরই পতি-পুত্র রণে মৃত হয়েছেন। মহর্ষিগণ! আপনাদের প্রশ্নের জবাবে আমি প্রধান ব্যক্তিদের পরিচয় জানালাম।'

সঞ্জয়ের কাছে সবার পরিচয় জেনে তপস্বীগণ চলে গেলেন। পাণ্ডবদের সৈনিকেরা আশ্রমের সীমানার বাইরে শিবির স্থাপন করল, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে সেই শিবিরে বিশ্রাম নিতে গেল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের সঙ্গে কুশলবার্তা বিনিময় করতে লাগলেন।

—— ৫ ——

ধৃতরাষ্ট্র ও যুধিষ্ঠিরের কথাবার্তা এবং বিদুরের যুধিষ্ঠিরের দেহে প্রবেশ

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—যুধিষ্ঠির ! তুমি নগর ও নগরপ্রান্তের সমস্ত প্রজা এবং ভ্রাতাসহ কুশলে আছো তো ? তোমার আশ্রয়ে থাকা জীবন-নির্বাহকারী মন্ত্রী, পরিচারক ও গুরুজনেরা নীরোগে আছে তো ? তোমার রাজ্যে এরা নির্ভয়ে বাস করে তো ? তুমি প্রাচীন রাজর্ষি পালিত পুরাতন রীতি-নীতি পালন করো তো ? অন্যায়ভাবে রাজস্ব আদায় কর না তো ? শত্রু-মিত্র ও উদাসীন ব্যক্তিদের সঙ্গে যথাযোগ্য ব্যবহার করো তো ? তোমার আচরণে ব্রাহ্মণেরা সন্তুষ্ট থাকেন তো ? পুরবাসী, সেবক, স্বজনদের কথা বাদ দাও, শত্রুরাও তোমার ব্যবহারে সন্তুষ্ট থাকে তো ? তুমি শ্রদ্ধা সহকারে দেবতা ও পিতৃপুরুষের পূজা এবং অতিথি সৎকার করো তো ? তোমার রাজ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং কুটুম্বেরা ন্যায়পথে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে তো ? নারী-পুরুষ-বালককে কোনো কষ্ট ভোগ করতে হয় না তো ? কেউ জীবিকার জন্য ভিক্ষা করে না তো ? তোমার গৃহে নারীরা সম্মান লাভ করে তো ?

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ধৃতরাষ্ট্র এইভাবে কুশল সমাচার জানতে চাইলে ন্যায়বেত্তা রাজা যুধিষ্ঠির তাঁকে বললেন—'রাজন্ ! আমার ওখানে সব কুশল। আপনার তপ, ইন্দ্রিয়সংযম এবং মনোনিগ্রহ ইত্যাদি সদ্‌গুণ বৃদ্ধিলাভ করছে তো ? আমার মাতা কুন্তীর আপনার সেবা করায় কোনো ত্রুটি হচ্ছে না তো ? আমার জ্যেষ্ঠা মাতা, ভয়ানক তপস্যারতা গান্ধারী দেবী তাঁর মহাপরাক্রমশালী মৃত পুত্রদের জন্য আর শোক করেন না তো ? পিতা ! সঞ্জয় কুশলতা সহকারে তপস্যারত আছেন তো ? বিদুর এখন কোথায়, তাঁকে এখনও দেখতে পেলাম না ?'

যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'পুত্র ! বিদুর কুশলে আছেন। তিনি অত্যন্ত কঠোর তপস্যায় রত। নিরন্তর উপবাসে এবং বায়ুপান করে থাকায় অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গেছেন। তাঁর দেহের শিরা-উপশিরা দেখা যায়। এই নির্জন বনে কখনো কখনো ব্রাহ্মণেরা তাঁর সাক্ষাৎ পান।' রাজা ধৃতরাষ্ট্র যখন এই কথা বলছিলেন তখনই মুখে পাথরের টুকরো নিয়ে জটাধারী বিদুরকে দূর থেকে আসতে দেখা গেল। তাঁর উলঙ্গ দেহ ধুলো-বালিতে ভরা, তাঁকে অত্যন্ত দুর্বল দেখাচ্ছিল। তিনি আশ্রমের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ফিরে

গেলেন। তা লক্ষ্য করে রাজা যুধিষ্ঠির একাকী তাঁর পেছনে দৌড়লেন। বিদুরকে কখনো দেখা যাচ্ছিল, কখনো তিনি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিলেন। এইভাবে তিনি ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিলেন আর রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর পেছন পেছন এই বলে দৌড়চ্ছিলেন যে, 'পিতৃব্য ! আমি আপনার পরম প্রিয় যুধিষ্ঠির (আপনাকে দর্শন করতে এসেছি)।' এইভাবে অত্যন্ত নির্জন বনের মধ্যে পৌঁছে বুদ্ধিমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদুর একটি গাছকে আশ্রয় করে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তিনি এতো দুর্বল হয়েছিলেন যে তাঁর দেহ অস্থিসার হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও পরম বুদ্ধিমান যুধিষ্ঠির তাঁকে চিনতে পেরে 'আমি যুধিষ্ঠির'—বলে তাঁর সামনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে পৌঁছে যুধিষ্ঠির তাঁকে প্রণাম করলেন।

তখন মহাত্মা বিদুর একাগ্রচিত্তে রাজা যুধিষ্ঠিরের দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকলেন। তিনি তাঁর দৃষ্টি যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টিতে, শরীর শরীরে, প্রাণকে প্রাণে এবং ইন্দ্রিয়াদিকে ইন্দ্রিয়াদিতে মিশিয়ে তাঁর সঙ্গে একাকার হয়ে গেলেন। এইভাবে নিজ তেজে প্রজ্বলিত হয়ে বিদুর ধর্মরাজের দেহে প্রবেশ করলেন। রাজা যুধিষ্ঠির দেখলেন বিদুরের চোখ আগের মতোই স্থির, তাঁর শরীরও আগের মতোই বৃক্ষের সাহায্যে দণ্ডায়মান, কিন্তু তাঁর দেহে আর চেতনা নেই। অন্য দিকে যুধিষ্ঠির নিজের মধ্যে বিশেষ বল

এবং গুণ অনুভব করলেন। তখন তাঁর মনে বিদুরের দেহ দাহ-সংস্কারের ইচ্ছা হল। সেইসময় আকাশবাণী শোনা গেল—'রাজন্! বিদুর সন্ন্যাসধর্ম পালন করতেন, সুতরাং তাঁর দেহ দাহ কোরো না, সেটিই সনাতন ধর্ম। তিনি সান্তানিক নামক লোক লাভ করবেন, অতএব তাঁর জন্য শোক করা উচিত নয়।'

সেকথা শুনে যুধিষ্ঠির সেখান থেকে ফিরে এসে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সব কথা জানালেন। বিদুরের দেহত্যাগের অদ্ভুত খবর শুনে তেজস্বী রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং ভীম সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তারপর ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'পুত্র! আমার প্রদত্ত ফল-মূল-জল গ্রহণ করো। মানুষের কাছে তার ব্যবহারের যে বস্তু থাকে, তাই দিয়েই অতিথির সৎকার করা উচিত।' তাঁর কথা শুনে যুধিষ্ঠির 'যথা আজ্ঞা' বলে তাঁর নির্দেশ স্বীকার করে তাঁর প্রদত্ত ফল-মূল নিয়ে ভ্রাতাদের সঙ্গে আহার করলেন। তারপর সকলে বৃক্ষের নীচে শয়ন করে রাত্রি কাটালেন।

যুধিষ্ঠিরাদির ঋষিদের আশ্রম পরিদর্শন এবং মহর্ষি ব্যাসের ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা প্রদান

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয়! পরদিন প্রভাতে রাজা যুধিষ্ঠির পূর্বাহ্ণের নিত্য নিয়মাদি সম্পূর্ণ করে ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি নিয়ে মুনিদের আশ্রম দেখতে গেলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর চার ভ্রাতা, অন্তঃপুরের নারীগণ, পরিচারক এবং পুরোহিতও গেলেন। তাঁরা বিভিন্ন স্থান ঘুরে ঘুরে দেখলেন—বেদীর ওপর আগুন রয়েছে এবং ঋষি-মুনিগণ স্নান সমাপ্ত করে আগুনে আহুতি প্রদান করছেন। কোনো কোনো স্থানে দ্বিজগণ মনোহর ধ্বনিতে বেদের স্বাধ্যায় দ্বারা আশ্রমের শ্রীবৃদ্ধি করছেন। রাজা যুধিষ্ঠির সেই সময় তপস্বীগণের জন্য আনীত স্বর্ণ, তাম্রকলস, মৃগচর্ম, কম্বল, কমণ্ডলু, থালা ইত্যাদি তাঁদের প্রদান করলেন। তাঁর কাছে যে যা চাইল, তিনি তাকে তাই দিলেন। এইভাবে নানাস্থানে ঘুরে যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে ফিরে এলেন। আশ্রমে এসে তিনি দেখলেন রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিত্যকর্মের পর গান্ধারীর সঙ্গে শান্তভাবে উপবিষ্ট এবং কিছু দূরে শিষ্টাচার পালনকারী মাতা কুন্তী শিষ্যার ন্যায় বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। যুধিষ্ঠির নিজের নাম বলে ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করলেন এবং ধৃতরাষ্ট্র বসার অনুমতি দিলে তিনি কুশাসনে বসলেন। ভীমসেন প্রভৃতি সকলেই তাঁকে প্রণাম করে তাঁর নির্দেশে বসলেন। এঁরা বসার পর কুরুক্ষেত্র নিবাসী শতযূপ ও অন্যান্য মহর্ষিগণ এবং মহাতেজস্বী ব্যাস দর্শন দিলেন। ব্যাসদেবের সঙ্গে অনেক দেবর্ষি এবং শিষ্যবৃন্দও ছিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির ভ্রাতা-গণসহ উঠে তাঁদের প্রণাম করলেন। ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে বসার অনুমতি দিলেন এবং তাঁর জন্য কালো মৃগচর্ম আচ্ছাদিত যে কুশাসন পাতা হয়েছিল, তাতে উপবেশন করলেন। পরে ব্যাসদেবের নির্দেশে অন্য ঋষি- মহর্ষিগণও কুশাসনে উপবেশন করলেন।

তারপর সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—'রাজন্! তোমার তপস্যা ঠিকমতো চলছে তো? বনবাসে তোমার মন লাগছে তো? এখন আর তোমার মনে পুত্রশোক নেই তো? তোমার সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় নির্মল হয়েছে তো? তুমি তোমার বুদ্ধিকে দৃঢ় করে বনবাসের কঠোর নিয়মাদি পালন করছো তো? আমার বধূমাতা গান্ধারী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, সে ধর্ম ও অর্থ সম্পর্কে জ্ঞাত এবং জন্ম-মৃত্যুতত্ত্বও জানে; সে শোকগ্রস্ত হয় না তো? আর কুন্তী—যে তার পুত্রদের মমতা ত্যাগ করে গুরুজনের সেবায় ব্যাপৃত হয়েছে, অহংভাব ত্যাগ করে তোমাদের সেবা করছে তো? তুমি যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেবকে সান্ত্বনা দিয়েছো তো? এদের দেখে তুমি খুশি হয়েছো তো? এদের প্রতি তোমার মন প্রসন্ন তো? তোমার হৃদয়ের ভাব শুদ্ধ হয়েছে তো? মহারাজ! কারো প্রতি শত্রুতা রেখো না, সত্যভাষণ করো এবং ক্রোধ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করো—এই তিনটি গুণ সর্বপ্রাণীর জন্য শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। মহাত্মা বিদুরের পরলোক গমনের সংবাদ তো তুমি জানো। সাক্ষাৎ ধর্মই মাণ্ডব্য ঋষির শাপে বিদুরের রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি পরম বুদ্ধিমান, মহাযোগী, মহাত্মা এবং মহামনস্বী ছিলেন। দেবতাদের মধ্যে বৃহস্পতি এবং অসুরদের মধ্যে শুক্রাচার্যও এতো বুদ্ধিমান ছিলেন না, যেমন ছিলেন কুরুশ্রেষ্ঠ বিদুর। তোমার ভ্রাতা বিদুর দেবতাদেরও দেবতা এবং সনাতন ধর্মের সাক্ষাৎ স্বরূপ ছিলেন। যিনি সত্য,

ইন্দ্রিয়সংযম, মনোনিগ্রহ, অহিংসা এবং দান ইত্যাদির রূপে বিশ্বের কল্যাণ করেন, সেই তেজস্বী সনাতন ধর্ম বিদুরের থেকে পৃথক নয়। যিনি যোগবলে কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরের জন্ম দিয়েছেন, সেই ধর্ম নামক দেবতাও বিদুরেরই স্বরূপ। যেমন অগ্নি, বায়ু, জল, মাটি ও আকাশের অস্তিত্ব ইহলোকে এবং পরলোকেও আছে, ধর্মও তেমনই উভয় লোকে পরিব্যাপ্ত। ধর্মের গতি সর্বত্র এবং তা সমস্ত জগৎ চরাচর ব্যাপ্ত করে নিত্য স্থিত। যাঁর সমস্ত পাপ ধৌত হয়েছে, সেই সিদ্ধ পুরুষ এবং দেবতাদের দেবতাই ধর্মের সাক্ষাৎ লাভ করেন। যাকে ধর্ম বলা হয়, তিনিই ছিলেন বিদুর এবং যিনি বিদুর ছিলেন তিনিই এই পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির—যিনি এখন তোমার সামনে দাসের ন্যায় দণ্ডায়মান। মহাযোগবলসম্পন্ন এবং বুদ্ধিমানেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তোমার ভ্রাতা বিদুর কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে সামনে দেখে এঁরই দেহে প্রবিষ্ট হয়েছেন। এবার তোমাকেও শীঘ্রই কল্যাণের ভাগী করব। পুত্র ! এখন আমি তোমার সংশয় দূর করতে এসেছি। যে কাজ পূর্বকালে কোনো মহর্ষি আজ পর্যন্ত করেননি, সেই চমৎকারপূর্ণ কাজ আমি আজ তোমাদের প্রত্যক্ষ করে দেখাবো। আজ আমি তোমাকে আমার তপস্যার আশ্চর্যজনক প্রভাব দেখাচ্ছি। বলো, তুমি কোন অভীষ্ট বস্তু আমার কাছ থেকে পেতে চাও ? যদি কাউকে দেখতে, শুনতে বা স্পর্শ করতে তোমার ইচ্ছা হয় তো বল, আমি তা অবশ্যই পূর্ণ করব।'

ব্যাসদেবের কাছে গান্ধারী ও কুন্তীর মৃত পুত্রাদিকে দর্শন করানোর জন্য অনুরোধ

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্মন্ ! ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে পাণ্ডবদের থাকাকালীন পরম তেজস্বী মহর্ষি ব্যাসদেব যে আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখাবার শপথ করেছিলেন, তা কীরূপ ছিল, কৃপা করে বলুন। রাজা যুধিষ্ঠির পুরবাসী-সহ কতদিন বনে ছিলেন ? তিনি তাঁর সৈন্য-সামন্ত এবং অন্তঃপুরের নারীদের সঙ্গে কী আহার করতেন ?

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! পাণ্ডবরা ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশে নানাপ্রকার আহার করতেন এবং তাঁর আশ্রমে সুখে থাকতেন। তাঁরা একমাস সেই তপোবনে বাস করেছিলেন। মহর্ষি ব্যাসদেব যখন রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে উপরিউক্ত কথা বলেন, তখন সেই সময় সেখানে আরও অনেক ঋষি উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে নারদ, পর্বত, দেবল, বিশ্বাবসু, তুম্বুরু এবং চিত্রসেনও ছিলেন। কুরুরাজ যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশে সেই সব মহাত্মাদেরও স্বাগত-সম্ভাষণ জানান। তাঁরা উত্তম আসনে উপবেশন করলে পাণ্ডব-সহ রাজা ধৃতরাষ্ট্রও আসন গ্রহণ করেন। গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদী এবং অন্যান্য নারীগণও নিজ নিজ আসন গ্রহণ করেন। তখন সেই স্থলে নানা ধর্মবিষয়ক আলোচনা হতে লাগল। আলোচনার শেষে বক্তাশ্রেষ্ঠ মহাতেজস্বী, বেদবিদ মহর্ষি ব্যাস প্রসন্ন হয়ে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—'মহারাজ ! তুমি এবং গান্ধারী নিরন্তর মৃত পুত্রদের শোকে দগ্ধ হচ্ছ, তোমাদের হৃদয়ে সর্বদা দুঃখের যে জ্বালা রয়েছে, আমি তা জানি। কুন্তী এবং দ্রৌপদীর অন্তরেও সেই দুঃখ আছে এবং শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী তার পুত্র অভিমন্যুর মৃত্যুর যে তীব্র দুঃখ সহ্য করছে, তা আমার অজানা নয়। প্রকৃতপক্ষে তোমাদের সকলের এখানে আসার খবর শুনেই আমি তোমাদের মানসিক সন্দেহ দূর করার জন্যই এখানে এসেছি। দেবতা, গন্ধর্ব এবং মহর্ষিগণ আজ আমার চিরসঞ্চিত তপস্যার প্রভাব দেখুন। মহারাজ ! বলো, তোমার কোন্ কামনা আমি পূর্ণ করব ? আজ আমি তোমাকে মনোবাঞ্ছিত বর দিতে প্রস্তুত। তুমি আমার তপস্যার ফল দেখো।'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—মুনিশ্রেষ্ঠ ! আজ আপনার মতো সাধু-পুরুষদের সমাগম হয়েছে—আমার প্রতি আপনার এ মহান অনুগ্রহ। আমি এতে নিজেকে ধন্য মনে করছি, আমার জীবন সার্থক। আপনাদের দর্শনে আমি যে পবিত্র হয়েছি, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার মনে একটি সংশয় আছে—মহাভারত যুদ্ধে আমার যে পুত্র ও পৌত্রেরা নিহত হয়েছে, তাদের কী গতি হবে ? তাদের স্মরণ করে আমার হৃদয় সর্বদা সন্তপ্ত থাকে। আমার পাপী পুত্র পৃথিবীর রাজ্য পাওয়ার লোভে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্যের সঙ্গে বিশাল সৈন্যদের হত্যা করিয়ে সমস্ত কুলকে সংহার করেছে—এই সব বিষয় নিরন্তর স্মরণ করে আমি অনুতাপের আগুনে পুড়ে যাচ্ছি। দুঃখ শোকের আঘাতে এক মুহূর্তের জন্যও আমি শান্তি

পাচ্ছি না।

রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্রের এইরূপ বিলাপ শুনে গান্ধারীর শোক পুনর্জীবিত হল। তিনি পুত্র শোকে অধীর হয়ে শ্বশুরের কাছে হাত জোড় করে বললেন—'মুনিবর ! মৃত পুত্রদের জন্য শোক করতে করতে এই মহারাজের ষোলো বছর কেটে গেছে ; কিন্তু এখনো তিনি শান্তিলাভ করেননি। পুত্রশোকে সন্তপ্ত হয়ে সর্বদা হাহাকার করে থাকেন। রাতভোর তাঁর চোখে নিদ্রা আসে না (সুতরাং একবার এঁকে তাঁর পুত্রদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দিন, তাহলে তাঁর দুঃখ কমবে)। আপনি নিজ তপোবলে নতুন লোক সৃষ্টি করতে সক্ষম ; তাই রাজাকে তাঁর পরলোকবাসী পুত্রদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করানো আপনার কাছে কোনো সমস্যার বিষয় নয়। দ্রুপদকুমারী কৃষ্ণা আমার সমস্ত পুত্রবধূদের মধ্যে সব থেকে প্রিয়। এরও ভাই-বন্ধু-পুত্র সকলেই মারা গেছে, তাই এও অত্যন্ত শোকমগ্ন থাকে। সর্বদা কল্যাণময় কথা বলেন যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর ভগিনী সুভদ্রাও অভিমন্যু-বধে শোক-সন্তপ্ত হয়ে আছে ; আর এই ভূরিশ্রবার পত্নী, সেও স্বামীর মৃত্যুতে বড়ই দুঃখে আছে। এই মহারাজের যে শতপুত্র রণাঙ্গণে নিহত হয়েছে, তাদের শত পত্নীও এখানে উপস্থিত। এই সব আমার বিধবা পুত্রবধূরা দুঃখ ও শোকের আঘাত সহ্য করে আমাদের শোককে আরও বাড়িয়ে তুলছে। আমার মহাত্মা শ্বশুর ভীষ্ম এবং মহারথী সোমদত্ত কোন্ গতি লাভ করবেন, এই মহা সন্দেহ দূর হচ্ছে না। মুনিশ্রেষ্ঠ ! আপনি এমন কৃপা করুন যাতে এই মহারাজের, আমার আপনার বধূ মাতা কুন্তীরও শোক দূরীভূত হয়।'

গান্ধারী যখন এই কথাগুলি বলছেন, তখন কুন্তী গুপ্তভাবে জাত সূর্যসম তেজস্বী তাঁর পুত্র কর্ণকে স্মরণ করলেন। ভগবান ব্যাসদেব তাঁর দুঃখ দেখে বললেন—'পুত্রী ! তোমার যদি কিছু বলার থাকে, তবে বলো।' তাঁর কথা শুনে কুন্তী দেবী মাথা নত করে শ্বশুরকে প্রণাম করলেন এবং লজ্জিত কণ্ঠে বললেন—'মুনিবর ! আপনি আমার শ্বশুর, আমার দেবতারও দেবতা ; সুতরাং আমার কাছে দেবতার থেকে বড়। আমি আপনার কাছে (নিজের জীবনের গুপ্ত কথা প্রকাশ করছি) সত্য কথা জানাচ্ছি, শুনুন। কোনো এক সময়—পরম ক্রোধী মহর্ষি দুর্বাসা আমার পিতার কাছে ভিক্ষার জন্য আসেন। আমি সেবা দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট করি। আমার আচরণ ও হৃদয় শুদ্ধ ছিল। তাঁর ক্রোধের কোনো স্থান আমি রাখিনি, আমার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি আমাকে বরপ্রদান করেন, তিনি বলেন—'আমার প্রদত্ত বর তোমাকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।' তাঁর কথা শুনে শাপের ভয়ে আমি বলি—'আপনার আদেশ আমি মেনে নেব।' তখন তিনি বলেন—'ভদ্রে ! তুমি যে যে দেবতাকে আবাহন করবে, তাঁরা সকলেই তোমার অধীন হবেন।' এই বলে তিনি অন্তর্ধান করেন। তাঁর কথায় আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হই, কোনো অবস্থাতেই আমি তাঁর বরদানের কথা ভুলতে পারি না। একদিন আমি আমার মহলের ছাদে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সেই সময় সূর্যদেবের উদয় হয়। মহর্ষি দুর্বাসার কথা স্মরণ করে আমি তাঁর দিকে আকাঙ্ক্ষাভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি। ভগবান সূর্য তখন আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তিনি দুটি দেহ ধারণ করেছিলেন, একটির দ্বারা সমস্ত ভুবন আলোকিত করে ছিলেন, অন্যটির দ্বারা আমার কাছে উপস্থিত ছিলেন। সূর্যদেবকে সেইরূপে দেখে আমি কম্পিত হই। তিনি আমাকে বলেন—'দেবী ! আমার কাছে বরপ্রার্থনা করো' ; আমি তাঁকে প্রণাম করে বলি—'সূর্যদেব ! আমি কিছু চাই না, আপনি কৃপা করে চলে যান।' তিনি বলেন—'দেবী ! আমাকে আবাহন করলে, তা ব্যর্থ হয় না। তুমি কোনো একটি বর প্রার্থনা করো, নাহলে আমি তোমাকে এবং তোমার বরদাতা ব্রাহ্মণকে ভস্ম করে ফেলব।' তখন আমি বললাম—'প্রভু ! আমার একটি আপনার মতো পুত্র হোক।' এই কথা বলতেই সূর্যদেব আমাকে মোহিত করে নিজ তেজের দ্বারা আমার দেহে প্রবিষ্ট হলেন এবং বললেন—'দেবী ! তোমার একটি পুত্র হবে।' তারপর তিনি আকাশে চলে গেলেন। আমি তখন থেকে পিতার কাছে এই খবর লুকিয়ে রাখার জন্য মহলের ভেতরেই থাকতে আরম্ভ করি এবং যখন আমার পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তখন গোপনে তাকে নদীতে ভাসিয়ে দিই। কর্ণই আমার সেই পুত্র। তার জন্মের পর আমি ভগবান সূর্যদেবের কৃপায় কন্যাভাব প্রাপ্ত হই। আমার সেই কাজ পাপ হোক বা অপাপ, আমি আপনাকে জানালাম। যদি পাপ হয় আপনিই তা দূর করতে পারেন। এখন আমি সেই পুত্র কর্ণকে দেখতে চাই। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অন্তরের কথাও আপনি জানেন, সুতরাং তাঁর ইচ্ছাও এখন পূর্ণ করা উচিত।'

কুন্তীর সব কথা শুনে শ্রেষ্ঠ বেদবিদ মহর্ষি ব্যাসদেব বললেন—'পুত্রী ! তুমি সত্য কথাই বলেছ। এসবই হওয়ার ছিল ; এতে তোমার কোনো অপরাধ নেই ; কারণ

তখন তুমি নিতান্ত বালিকা ছিলে। দেবতাগণ অণিমাদি ঐশ্বর্যসম্পন্ন হন, তাঁরা অন্যের দেহে প্রবেশ করতে পারেন। তাঁরা সংকল্প, বাক্য, দৃষ্টি, স্পর্শ এবং হর্ষোৎপাদন দ্বারা পুত্র উৎপন্ন করতে সক্ষম। দেবধর্মের দ্বারা মনুষ্য ধর্ম দূষিত হয় না—এই কথা জেনে তুমি তোমার মানসিক চিন্তা ত্যাগ করো।'

ধৃতরাষ্ট্র ও অন্যান্যদের পূর্বজন্মের পরিচয় এবং ব্যাসদেবের মৃত বীরদের উপস্থিত করে তাঁদের আত্মীয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করানো

মহর্ষি ব্যাস তখন গান্ধারীকে বললেন—'কন্যা গান্ধারী ! আজ রাত্রে তুমি তোমার পুত্রগণ ও ভ্রাতাগণকে দর্শন করবে। কুন্তী কর্ণকে, সুভদ্রা অভিমন্যুকে এবং দ্রৌপদী তার পিতা, পুত্র এবং ভ্রাতাদের দর্শন করবে। তোমাদের সেই মহাত্মা ক্ষত্রিয় ব্যক্তিদের জন্য শোক করা উচিত নয় ; কারণ এরা সব ক্ষত্রিয়ধর্মে তৎপর থেকে মৃত্যুলাভ করেছে। এসবই দেবতাদের কাজ এবং এইভাবেই হওয়ার ছিল ; সব দেবতাই তাঁদের নিজ নিজ অংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। গন্ধর্বদের রাজা ধৃতরাষ্ট্রই তোমার পতিরূপে ইহলোক অবতীর্ণ হয়েছে। দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান বিষ্ণুর অংশে মহারাজ পাণ্ডু জন্ম নিয়েছিল। বিদুর এবং যুধিষ্ঠির ধর্মের অংশাবতার, দুর্যোধনকে কলিযুগ এবং শকুনিকে দ্বাপর বলে জেনো। দুঃশাসন ইত্যাদি সকল ভ্রাতারা রাক্ষস ছিল। মহাবলী ভীম মরুদ্‌গণ থেকে উৎপন্ন। অর্জুনকে পুরাতন ঋষি নর এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণ বলে জেনো, নকুল ও সহদেব অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অবতার। যুদ্ধে যে অভিমন্যুকে ছয় মহারথী মিলে বধ করেছে, সেই সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু সাক্ষাৎ চন্দ্রের অংশ ছিল এবং কর্ণরূপে সাক্ষাৎ সূর্যদেব অবতীর্ণ হয়েছিলেন। দ্রৌপদীর সঙ্গে উৎপন্ন ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্নির অংশ ছিল আর শিখণ্ডী ছিল রাক্ষস। দ্রোণাচার্য ছিল বৃহস্পতির অংশ এবং অশ্বত্থামা ভগবান শংকরের অংশে উৎপন্ন। গঙ্গানন্দন ভীষ্ম মনুষ্যভাব প্রাপ্ত একজন বসু ছিলেন। এইভাবে যেসব দেবতা কার্যবশত মনুষ্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা নিজেদের অবতার গ্রহণের উদ্দেশ্য পূর্ণ করে পুনরায় স্বর্গে গমন করেছেন। তোমাদের হৃদয়ে পারলৌকিক ভয়ের জন্য চিরকাল ধরে যে দুঃখ পূর্ণ হয়ে আছে, তা আজ দূর করে দেবে। এখন সকলে গঙ্গাতীরে চলো, সেখানেই সকলে মৃত পুত্রদের দর্শন করবে।'

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! মহর্ষি ব্যাসের কথায় সকলে হর্ষধ্বনি করতে করতে প্রসন্নতা সহকারে গঙ্গাতীরের দিকে রওনা হলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁর মন্ত্রী, পাণ্ডব, মুনিগণ এবং গন্ধর্ব সমুদয়ের সঙ্গে গঙ্গাতীরে গেলেন। ধীরে ধীরে সেই জনসমুদ্র গঙ্গাতীরে পৌঁছল এবং সকলে নিজ নিজ পছন্দমতো স্থান গ্রহণ করলেন। মৃত রাজাদের দর্শন করার আশায় সকলে রাত্রের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। তারপর সূর্য অস্ত গেলে, সন্ধ্যা হলে, সকলেই নিজ নিজ সায়ংকালীন নিত্য কর্ম সমাপন করে ভগবান ব্যাসের কাছে গেলেন। ধর্মাত্মা রাজা ধৃতরাষ্ট্র পবিত্র এবং একাগ্রচিত্তে পাণ্ডব ও ঋষিদের সঙ্গে ব্যাসদেবের কাছে বসলেন। কুরুনারীগণ গান্ধারীর কাছে বসলেন। নগরের লোকেরা নিজ পছন্দমতো স্থানে বসলেন।

তারপর মহাতেজস্বী মুনি ব্যাসদেব ভাগীরথীর পবিত্র

জলে নেমে পাণ্ডব-কৌরব পক্ষের সমস্ত যোদ্ধা এবং

বিভিন্ন দেশের রাজাদের আবাহন করলেন। সেই সময় জলের মধ্যে সেইরূপ তুমুল ধ্বনি শোনা গেল, যেরূপ কুরুক্ষেত্রে কৌরব-পাণ্ডব সেনা একত্রিত হলে শোনা গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পরেই ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্য হাজার হাজার বীর সৈনিকদের সঙ্গে জলের বাইরে এলেন। পুত্র এবং সেনাসহ রাজা বিরাট, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র, সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু, রাক্ষস ঘটোৎকচ, কর্ণ, দুর্যোধন, শকুনি, দুঃশাসনাদি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ, জরাসন্ধ পুত্র সহদেব, ভগদত্ত, জলসন্দ, ভূরিশ্রবা, শল, শল্য, ভ্রাতাগণ সহ বৃষসেন, রাজকুমার লক্ষণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডীর পুত্র, কনিষ্ঠ ভ্রাতাসহ ধৃষ্টকেতু, অচল, বৃষক, রাক্ষস অলায়ুধ, বাহ্লীক, সোমদত্ত, চেকিতান এবং আরও বহু বীর দেদীপ্যমান দেহধারণ করে জল থেকে উত্থিত হলেন। যুদ্ধের সময় সকল বীরগণের যেমন যেমন বেশ, ধ্বজা ও বাহন ছিল, তাঁরা সেইভাবেই উপস্থিত ছিলেন। সকলেই দিব্য বসন-ভূষণে সজ্জিত ছিলেন। তাঁরা এই সময় শত্রুতা, অহংকার, ক্রোধ ও মাৎসর্য ত্যাগ করেছিলেন। গন্ধর্বগণ তাঁদের যশ ও বন্দীগণ স্তুতি গান করছিলেন।

সত্যবতীনন্দন মহর্ষি ব্যাস প্রসন্ন হয়ে নিজ তপের প্রভাবে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্য চক্ষু প্রদান করেন, যশস্বিনী গান্ধারীও দিব্য জ্ঞানসম্পন্না ছিলেন। তাঁরা দুজনে যুদ্ধে মৃত পুত্রদের ও অন্যান্য আত্মীয়দের দেখলেন, সে এক অদ্ভুত, অচিন্ত্য এবং রোমাঞ্চকর দৃশ্য। প্রজারা সকলে অত্যাশ্চর্য হয়ে এক দৃষ্টিতে সেই ঘটনা দেখতে লাগল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র ব্যাসদেবের কৃপায় আনন্দমগ্ন হয়ে পুত্রদের দেখতে লাগলেন।

তারপর ক্রোধ ও পাপশূন্য হয়ে সেই সব নরশ্রেষ্ঠ বীর ব্রহ্মর্ষিদের দ্বারা সৃষ্ট উত্তম প্রণালী অনুসারে একে অন্যের সঙ্গে প্রীতি সহকারে মিলিত হলেন। সকলের মনই তখন আনন্দপূর্ণ ছিল। পুত্র পিতা-মাতার সঙ্গে, স্ত্রী পতি-পুত্রের সঙ্গে, ভাই ভাইয়ের সঙ্গে মিলিত হতে লাগলেন। পাণ্ডবরা সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পাঁচপুত্রকে হর্ষান্বিত হয়ে আলিঙ্গন করলেন। পরে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তাঁরা কর্ণের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করলেন। এইভাবে তাঁরা সকলে গুরুজন, বান্ধব ও পুত্রদের সঙ্গে মিলিত হলেন। সারারাত তাঁরা একসঙ্গে থাকায় সকলেই খুব আনন্দিত হলেন। সেই সময় কারো মনে কোনোপ্রকার দুঃখ-শোক-ভয়-উদ্বেগ বা অপযশের স্থান ছিল না। সকলেরই মনের দুঃখ দূরীভূত হয়েছিল। সারারাত একসঙ্গে থাকার পর তাঁরা একে অপরকে আলিঙ্গন করে ফিরে যেতে উদ্যত হলেন। ব্যাসদেব তখন তাঁদের সকলকে বিসর্জন দিলেন, তাঁরা মুহূর্তের মধ্যে গঙ্গার জলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন এবং যে যার প্রাপ্ত লোকে চলে গেলেন। কেউ ব্রহ্মলোকে, কেউ দেবলোকে, কিছু লোক বরুণ, কুবের, সূর্যলোকে গেলেন। কতজন গেলেন রাক্ষস ও পিশাচলোকে। এইভাবে সকলে নানা বিচিত্র গতি প্রাপ্ত করলেন। তাঁরা যেখান থেকে এসেছিলেন, সেখানেই ফিরে গেলেন।

তাঁরা সকলে অদৃশ্য হলে মহামুনি ব্যাসদেব জলে দণ্ডায়মান বিধবা নারীদের বললেন—'দেবীগণ ! তোমাদের মধ্যে যারা নিজ পতির সঙ্গে যেতে চাও, আলস্য ত্যাগ করে তারা গঙ্গায় ডুব দাও।' তাঁর কথা শুনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন সতী নারীগণ গঙ্গায় ডুব দিলেন এবং মনুষ্য দেহ ত্যাগ করে পতিকে অনুগমন করলেন। এইভাবে পতিব্রতা পালনকারী সুশীলা ক্ষত্রিয় নারীগণ দিব্য বস্ত্রাভূষণ পরিহিত হয়ে দিব্যদেহ নিয়ে দিব্য বিমানে করে নিজ নিজ যোগ্য স্থানে গমন করলেন। সেই সময় যার যার মনে যে যে কামনা ছিল, ধর্মবৎসল ভগবান ব্যাস তা পূর্ণ করলেন। সংগ্রামে মৃত রাজাদের পুনরাগমনের বৃত্তান্ত শুনে বিভিন্ন দেশের মানুষেরা অত্যন্ত আশ্চর্য ও আনন্দিত হলেন। যারা কৌরব-পাণ্ডবদের এই প্রিয়জন সমাগমের বৃত্তান্ত শ্রবণ করবে, তারা ইহলোকে ও পরলোকে প্রিয়বস্তু প্রাপ্ত করবে এবং অনায়াসে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মিলিত হবে আর কোনো দুঃখ-শোক তাদের স্পর্শ করবে না। যে বিদ্বান ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে এই প্রসঙ্গ শোনাবে, সে ইহলোকে যশ এবং পরলোকে সদ্গতি লাভ করবে। স্বাধ্যায়পরায়ণ, তপস্বী, সদাচারী, জিতেন্দ্রিয়, পাপরহিত, সরল, শুদ্ধ, শান্ত, অহিংসক, সত্যবাদী, আস্তিক, শ্রদ্ধাবান, ধৈর্যশীল মানুষ এই আশ্চর্যজনক পর্ব শুনে অতি উত্তম গতি লাভ করবে।

জনমেজয়ের পরীক্ষিতের দর্শন লাভ এবং যুধিষ্ঠিরাদির হস্তিনাপুরে ফিরে যাওয়া

জনমেজয় বললেন—ব্রহ্মন্ ! বরদাতা ভগবান ব্যাসদেব যদি আমার পিতাকেও সেই রূপ, বেশ ও অবস্থায় আমাকে দর্শন করিয়ে দেন তাহলে আপনার বলা সব কথাতেই আমার বিশ্বাস হবে এবং আমি কৃতার্থ হয়ে আজীবন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব। আজ মহর্ষির কৃপায় আমার ইচ্ছাও পূর্ণ হওয়া উচিত।

রাজা এইভাবে বলায় পরম প্রতাপশালী মহর্ষি ব্যাসদেব তাঁকে কৃপা করে তাঁর পিতা পরীক্ষিৎকে সেই যজ্ঞ-ভূমিতে ডেকে পাঠালেন। রাজা দেখলেন—পিতা সেই রূপ, বেশ এবং অবস্থায় আকাশ থেকে নেমে এলেন। তাঁর সঙ্গে মহাত্মা শমীক এবং তাঁর পুত্র শৃঙ্গ ঋষিও ছিলেন। রাজা পরীক্ষিতের মন্ত্রীকেও তাঁদের সঙ্গে দেখা গেল। রাজা পরীক্ষিৎ তখন প্রসন্ন হয়ে যজ্ঞান্তস্নানের পূর্বে তাঁর পিতাকে স্নান করিয়ে পরে নিজে স্নান করলেন। স্নানের পর তিনি যাযাবর-কুলে উদ্ভূত জরৎকারুপুত্র আস্তীককে বললেন—'বিপ্রবর ! আমার মনে হচ্ছে যে আমার এই যজ্ঞ নানাপ্রকার আশ্চর্যের কেন্দ্র হচ্ছে ; কারণ শোকবিনাশকারী আমার পিতা ও আজ এখানে উপস্থিত হয়েছেন।'

আস্তীক বললেন—রাজন্ ! যাঁর যজ্ঞে তপস্যার নিধি পুরাণপুরুষ মহর্ষি ব্যাসদেব বিদ্যমান, তাঁর দুই লোকেই জয় হয়। তুমি এই বিচিত্র উপাখ্যান শুনেছ, তোমার শত্রু সর্পেরা ভস্ম হয়ে তোমার পিতার গতি প্রাপ্ত হয়েছে। তোমার সত্যপরায়ণতার জন্য কোনোভাবে তক্ষকের প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। তুমি সমস্ত ঋষিদের পূজা করেছ, মহাত্মা ব্যাসদেবের প্রভাব দর্শন করেছ এবং এই পাপনাশক কথা শুনে মহান ধর্ম লাভ করেছ। উদার হৃদয়সম্পন্ন সাধুগণের দর্শনে তোমার হৃদয়ের বন্ধন খুলে গেছে—তোমার সর্ব সন্দেহ দূরীভূত হয়েছে। এখন ধর্ম সমর্থনকারী, সদাচারী মহাত্মা—যাঁদের দর্শনে সর্বপাপ নাশ হয়, তাঁদের তোমার প্রণাম করা উচিত।

সৌতি বললেন—বিপ্রবর ! আস্তীকের কথা শুনে রাজা জনমেজয় মহর্ষি ব্যাসদেবকে বারবার পূজা ও আপ্যায়ন করলেন। তারপর মুনিবর বৈশম্পায়নকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ব্রহ্মন্ ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং যুধিষ্ঠির পুত্র-পৌত্র ও আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পরে কী করলেন ?'

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্রদের দর্শনরূপ মহাচমৎকার দেখে শোকরহিত হয়ে আশ্রমে ফিরে এলেন। অন্য সকলে এবং মহর্ষিগণও তাঁর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে নিজ নিজ স্থানে চলে গেলেন। মহাত্মা পাণ্ডবগণ সৈনিক ও নারীগণ সমভিব্যাহারে ধৃতরাষ্ট্রকে অনুসরণ করলেন। আশ্রমে পৌঁছে লোকপূজিত মহর্ষি ব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—'মহাভাগ ! তুমি ধর্মজ্ঞ প্রাচীন ঋষিদের কাছ থেকে নানাপ্রকার ধর্মকথা শুনেছো। এখন আর শোক কোরো না ; কারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রারব্ধের বিধানে দুঃখ পায় না। পরম বুদ্ধিমান রাজা যুধিষ্ঠির তার সমস্ত ভ্রাতা, সুহৃদ এবং নারীদের সঙ্গে নিজে তোমার সেবা করছে। এবার ওদের ফিরে যেতে বলো। তারা গিয়ে রাজ্যভার গ্রহণ করুক, এরা একমাসের অধিককাল এই বনে এসে রয়েছে।'

ব্যাসদেবের কথা শুনে রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে ডেকে বললেন—'অজাতশত্রো ! তোমার কল্যাণ হোক, তুমি ভাইদের সঙ্গে আমার কথা শোনো ! তোমার জন্যই আমার সমস্ত শোক অপনীত হয়েছে। এবার তুমি আর দেরি না করে রাজধানীতে ফিরে যাও। তোমাদের দুই মাতাই শুকনো পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করছেন, এঁরা আর বেশিদিন জীবিত থাকবেন না। ভগবান ব্যাসের তপোবলে এবং তোমাদের আগমনে আমি পরলোকবাসী দুর্যোধনাদি পুত্রদের দর্শন করেছি ; সুতরাং আমার জীবনের প্রয়োজন শেষ হয়েছে। এবার আমি কঠোর তপস্যা করব, তুমি আমাকে অনুমতি দাও। আজ থেকে পিতৃপুরুষের পিণ্ড, যশ এবং কুলের ভার, সবই তোমার ওপর ; অতএব পুত্র ! আজ অথবা কাল তুমি আর দেরি না করে ফিরে যাও। তুমি আমার জন্য অনেক কিছু করেছ।'

রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কথা শুনে যুধিষ্ঠির বললেন—'জ্যেষ্ঠতাত ! আপনি ধর্মজ্ঞ, আমাকে ত্যাগ করবেন না ; আমি সর্বতোভাবে নিরপরাধ। আমার সব ভ্রাতা এবং সেবক এখান থেকে চলে যাক, আমি সংযম ও ব্রত পালন করে আপনার এবং দুই মাতার সেবা করব।' তাঁর কথা শুনে গান্ধারী বললেন—'পুত্র ! এমন কথা বোলো না। আমি যা বলি শোনো। তুমি অনেক করেছ। তুমি আমাদের খুব ভালোভাবেই আদর-যত্ন করেছ। এখন মহারাজ যা আদেশ করেন, সেইমতো কাজ করো ; কারণ পিতার নির্দেশ মানা করা তোমার কর্তব্য।'

গান্ধারীর আদেশ শুনে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর অশ্রুপূর্ণ নয়নে কুন্তীকে বললেন—'মাতা ! রাজা এবং যশস্বিনী গান্ধারী দেবী আমাকে গৃহে ফিরে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু আমার মন আপনার ওপর পড়ে আছে। যাওয়ার কথাতেই আমার অত্যন্ত দুঃখ হচ্ছে, কী করে যাব ? আমি আপনাদের তপস্যাতে বাধা সৃষ্টি করতে চাই না ; কেননা তপস্যার থেকে বড় আর কিছু নেই। তপস্যার দ্বারা পরব্রহ্ম লাভ হয়। এখন আমার হৃদয় আগের মতো রাজ-কাজে ব্যাপৃত হয় না, এইরূপ তপস্যা করার ইচ্ছা হয়। সমস্ত পৃথিবী আমার শূন্য মনে হয়, সুতরাং শুধু ধর্মপালনের জন্য আমি এখানে থেকে যেতে চাই। আপনার কল্যাণময়ী দৃষ্টিতে আমাদের সকলকে অনুগৃহীত করুন।'

তাঁর কথা শুনে সহদেবের চোখে জল ভরে এল। তিনি রাজা যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'ভ্রাতা ! আমার মাকে ছেড়ে

যাওয়ার সাহস নেই। আপনি শীঘ্র ফিরে যান। আমি এঁর সঙ্গে থেকে তপস্যায় শরীর শুষ্ক করব। আমি মহারাজ এবং দুই মাতার সেবায় ব্যাপৃত থাকতে চাই।' তাঁর কথা শুনে কুন্তী সহদেবকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন—'পুত্র! এমন কথা বোলো না, আমার কথা শোনো, গৃহে ফিরে যাও। তোমরা থাকলে আমার তপস্যায় বিঘ্ন হবে, তোমাদের মমতায় আবদ্ধ হয়ে আমি উত্তম তপস্যা থেকে চ্যুত হব ; সুতরাং পুত্র ! তোমরা ফিরে যাও, আমরা আর অল্পদিনই বেঁচে থাকব।'

কুন্তী এইভাবে নানা কথা বলে তাদের সান্ত্বনা দিলেন। তখন মাতা এবং মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি নিয়ে পাণ্ডবগণ তাঁদের প্রণাম করে বললেন—'রাজন্ ! আপনার আশীর্বাদ নিয়ে আমরা রাজধানীতে ফিরে যেতে প্রস্তুত।' ধর্মরাজের কথা শুনে রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের আশীর্বাদ করে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। তারপর মহাবলী ভীমকে সান্ত্বনা দিলেন। ভীমও তাঁর আদেশ সর্বান্তকরণে মেনে নিলেন। ধৃতরাষ্ট্র অর্জুন-নকুল-সহদেবকেও আলিঙ্গন করে তাঁদের আশীর্বাদ করে বিদায় জানালেন। তারপর তাঁরা সকলে গান্ধারীর পদধূলি নিলেন এবং তাঁর অনুমতি ভিক্ষা করলেন। মাতা কুন্তীকে প্রণাম করলে তিনি সকলকে আলিঙ্গন করে মস্তক আঘ্রাণ করলেন, সকলে তাঁদের পরিক্রমা করলেন। দ্রৌপদী এবং অন্যান্য কুলনারীগণ সকলকে প্রণাম করলেন। দুই শ্বশ্রূমাতা তাঁদের আলিঙ্গন করে আশীর্বাদ জানালেন। তাঁরা বধূদের নানাপ্রকার কর্তব্যের উপদেশ দিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। তারপর সকলে রওনা হলেন। কিছুক্ষণ পরে সারথিদের হাঁক-ডাক শোনা গেল। রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতা, কুলনারী ও সৈনিক সকলকে নিয়ে হস্তিনাপুর ফিরে গেলেন।

দেবর্ষি নারদের কাছে ধৃতরাষ্ট্র ও অন্যান্যদের মৃত্যুর খবর জেনে যুধিষ্ঠিরাদির শোক এবং তিনজনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! পাণ্ডবরা তপোবন থেকে ফিরে আসার দু-বছর পরে একদিন দেবর্ষি নারদ রাজা যুধিষ্ঠিরের কাছে এলেন। যুধিষ্ঠির তাঁকে সসম্মানে পূজা করলেন। তারপর আসন গ্রহণ করে দেবর্ষি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর যুধিষ্ঠির বললেন—'মুনিবর ! অনেকদিন আমরা আপনার দর্শন লাভ করিনি ; সব কুশল তো ? এখন আপনি কোন্ কোন্ দেশ ঘুরে এলেন ? আপনার কী সেবা করব, বলুন ? আপনিই আমাদের পরম গতি।'

দেবর্ষি নারদ বললেন—রাজন্ ! তুমি ঠিকই বলেছো। বহুদিন পর তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। এখন আমি

তপোবন থেকে আসছি। পথে ভগবতী গঙ্গা এবং বহু তীর্থ দর্শন করতে করতে এসেছি।

যুধিষ্ঠির বললেন—'মুনিবর ! গঙ্গাতীরে বসবাসকারী মানুষ আমাকে এসে বলেন যে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আজকাল অত্যন্ত কঠোর তপস্যায় ব্যাপৃত ; আপনি কি তাঁদের দেখেছেন, তাঁরা কুশলে আছেন তো ? গান্ধারী, কুন্তী, সঞ্জয় এবং আমার জ্যেষ্ঠতাত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এখন কেমন আছেন ? আমি তাঁদের কথা সব শুনতে চাই। যদি আপনি তাঁদের দেখে থাকেন, তাহলে কৃপা করে বলুন।

নারদ বললেন—মহারাজ ! আমি সেই তপোবনে যা দেখেছি ও শুনেছি, সেসব বৃত্তান্ত বিস্তারিতভাবে জানাচ্ছি, তুমি স্থিরচিত্তে শোনো—তোমরা ওখান থেকে চলে আসার পর তোমার জ্যেষ্ঠতাত গান্ধারী ও কুন্তীর সঙ্গে গঙ্গাদ্বারে (হরিদ্বারে) চলে যান। সঞ্জয় এবং যজ্ঞকারী পুরোহিতও অগ্নিহোত্রের সামগ্রী নিয়ে তাঁদের সঙ্গে যান। সেখানে পৌঁছে তোমার জ্যেষ্ঠতাত তীব্র তপস্যা শুরু করেন। তিনি মুখে পাথরের টুকরো নিয়ে বায়ু-ভক্ষণ করতেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে কখনো দেখা যেত, কখনো তিনি অদৃশ্য থাকতেন। তাঁর কোনো নির্দিষ্ট স্থান ছিল না। তিনি বনের চতুর্দিকে বিচরণ করতেন। গান্ধারী ও কুন্তী তাঁর পিছনে থাকতেন। সঞ্জয়ও তাঁদের অনুসরণ করতেন। উচ্চ-নীচ স্থানে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে সাহায্য করতেন, গান্ধারীকে কুন্তীদেবী।

একদিন ধৃতরাষ্ট্র গঙ্গা কিনারে বিচরণ করতে করতে গঙ্গাজলে নেমে স্নান করে আশ্রমের দিকে এগিয়ে চললেন। এমন সময় অত্যন্ত জোরে হাওয়া প্রবাহিত হল এবং তাতে ভয়ংকর দাবাগ্নি জ্বলে উঠল। সমস্ত জঙ্গল ধূ ধূ করে জ্বলতে লাগল, মৃগদল পুড়তে লাগল, বন্য শূকরেরা জলাশয়ে আশ্রয় নিল। সমস্ত বন লেলিহান আগুনে জ্বলে উঠল, এঁরা গভীর সংকটে পড়লেন, ধৃতরাষ্ট্রের দেহ উপবাসের কারণে দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল, তিনি ছুটতে পারলেন না। তোমার দুই মাতাও অত্যন্ত দুর্বল হয়েছিলেন ; তাঁরা দৌড়তে অক্ষম ছিলেন। সেই সময় আগুন এগিয়ে আসায় রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁর সারথিকে বললেন—'সঞ্জয় ! তুমি এমন স্থানে চলে যাও, যাতে এই দাবাগ্নি তোমাকে দগ্ধ করতে না পারে। আমরা এখানে আমাদের পরমগতি লাভ করব।' তাঁর কথা শুনে সঞ্জয় ভয় পেয়ে বলল—'মহারাজ ! এই লৌকিক অগ্নিতে আপনাদের মৃত্যু হওয়া ঠিক নয় (আপনাদের দেহে দাহ-সংস্কার তো যজ্ঞের অগ্নিতে হওয়া উচিত) ; কিন্তু এখন দাবানল থেকে মুক্তিলাভের কোনো উপায় দেখছি না। কৃপা করে বলুন এখন কী করা উচিত ?' সঞ্জয়ের প্রশ্নের উত্তরে ধৃতরাষ্ট্র আবার বললেন—'সঞ্জয় ! আমরা স্বেচ্ছায় গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করে এসেছি। সুতরাং আমাদের পক্ষে এই প্রকার মৃত্যু অনিষ্টকারী নয়। জল, অগ্নি বা বায়ু সংযোগে অথবা উপবাস করে প্রাণত্যাগ করা তপস্বীদের পক্ষে প্রশংসনীয় বলে মনে করা হয় ; সুতরাং তুমি দেরি না করে শীঘ্র চলে যাও।' এই বলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিজ মন একাগ্র করে কুন্তী ও গান্ধারীকে নিয়ে পূর্বাভিমুখে বসলেন। তাঁকে সেই অবস্থায় দেখে সঞ্জয় তাঁদের পরিক্রমা করে বললেন—'মহারাজ ! আপনি নিজেকে যোগযুক্ত করুন।' তাঁর কথায় রাজা সমাধিস্থ হলেন, ইন্দ্রিয়াদি রোধ করে কাঠের মতো নিশ্চল হয়ে রইলেন। তারপর দেবী গান্ধারী, তোমার মাতা কুন্তী এবং পিতৃব্য রাজা ধৃতরাষ্ট্র—তিনজনে দাবাগ্নিতে পুড়ে

ভস্ম হয়ে গেলেন ; কিন্তু সঞ্জয় প্রাণে বেঁচে গেলেন। আমি তাঁকে গঙ্গাতীরে তপস্বী পরিবৃত থাকতে দেখেছি। সঞ্জয় সেই তপস্বীদের ডেকে সব জানিয়ে নিজে হিমালয় পর্বতে চলে গেছে। মহামনা ধৃতরাষ্ট্র এবং তোমার দুই মাতা এইভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন। বনে বিচরণ করার সময় অকস্মাৎ তাঁদের মৃতদেহ আমার দৃষ্টিগোচর হয়। রাজার এইরূপ মৃত্যুর বৃত্তান্ত শুনে সমস্ত তপস্বী সেইস্থানে

একত্রিত হন, কিন্তু কেউই তাঁদের জন্য শোক করেননি। কারণ তাঁদের মনে ওঁদের সদ্‌গতির বিষয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তা ছিল না। যুধিষ্ঠির ! আমি সেখানেই তাঁদের দগ্ধ হওয়ার সমাচার শুনেছি। তোমাদেরও তাঁদের জন্য শোক করা উচিত নয় ; কারণ ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং কুন্তী স্বেচ্ছায় দাবাগ্নিতে শরীর আহুতি দিয়েছেন।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! রাজা ধৃতরাষ্ট্রের পরলোক-গমনের সংবাদ শুনে পাণ্ডবরা অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হলেন এবং তাঁদের অন্তঃপুর মহা দুঃখে ভরে উঠল। সকলেই কাঁদতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির চোখের জল মুছে নারদকে বললেন—'ব্রহ্মন্ ! আমরা জীবিত থাকতেই কঠোর তপস্যারত মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্রের বনে যে অনাথের ন্যায় মৃত্যু হল, এ অত্যন্ত দুঃখের কথা ! যশস্বিনী গান্ধারীর জন্য আমার তত শোক হয়নি ; কারণ তিনি পতিব্রতাধর্ম পালন করে নিজ পতির লোকে গমন করেছেন। আমি মাতা কুন্তীকে স্মরণ করে শোক-সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছি, যিনি তাঁর পুত্রদের সমৃদ্ধশালী ঐশ্বর্য ত্যাগ করে বনে থাকা পছন্দ করেছিলেন। হায় ! সেই মহাবনে মন্ত্রদ্বারা পবিত্র যজ্ঞাগ্নি থাকতেও আমার পিতা কীভাবে লৌকিক অগ্নিতে দাহ হলেন ?'

নারদ বললেন—রাজন্ ! ধৃতরাষ্ট্র অগ্নিতে দাহ হননি। আমি শুনেছি যে, বায়ুপান করে থাকা রাজর্ষি যখন গঙ্গাতীরের তপোবনে প্রবেশ করছিলেন, সেই সময় তিনি যাজককেদর দ্বারা ইষ্টি সম্পাদিত হবার পর আহবনীয় আদি অগ্নিকে সেখানেই পরিত্যাগ করেছিলেন। তাঁর যাজকেরা সেই অগ্নিকে নির্জন বনে রেখে নিজ নিজ স্থানে চলে গিয়েছিলেন। তপস্বীরা বলেন যে সেই অগ্নিই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে বনে আগুন ধরায় এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্র আদি সেই অগ্নিতেই দগ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র এইভাবে তাঁরই স্থাপন করা বৈদিক অগ্নিতে ভস্ম হয়েছেন এবং পরমগতি লাভ করেছেন। অতএব তুমি তাঁদের জন্য শোক কোরো না। গুরুজনদের সেবা করায় তোমার মাতা শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি লাভ করেছেন—এতে কোনোই সন্দেহ নেই। এখন তোমরা সব ভ্রাতারা গিয়ে তাঁদের তিনজনকে জলাঞ্জলি দাও।

তারপর রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতা এবং কুলবধূদের নিয়ে নগরের বাইরের গঙ্গাতীরে গেলেন, নগরের প্রজারাও রাজভক্তির দ্বারা প্রেরিত হয়ে এক বস্ত্র ধারণ করে গঙ্গাতীরে গেলেন ; সকলে গঙ্গায় স্নান করে যুযুৎসুকে সঙ্গে নিয়ে মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীদেবীর নামে পৃথকভাবে গোত্র ইত্যাদি উচ্চারণ করে জলে অঞ্জলি দিলেন। তারপর অশৌচ-নিবৃত্তির জন্য কার্য করতে পাণ্ডবরা নগরের বাইরে থাকলেন। যেখানে রাজা ধৃতরাষ্ট্র দগ্ধ হয়েছিলেন, যুধিষ্ঠির বিধিনিয়ম জানা বিশ্বাসযোগ্য ব্রাহ্মণ পাঠিয়ে—সেই স্থানে (হরিদ্বারে) শ্রাদ্ধকর্ম করার নির্দেশ দিয়ে দানযোগ্য নানাবস্তু তাদের অর্পণ করলেন। শৌচ-সম্পাদনের জন্য দশাদি কর্ম করার পর পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির দ্বাদশ দিনে ধৃতরাষ্ট্র ও মাতাদের উদ্দেশ্যে বিধিবৎ শ্রাদ্ধ করলেন এবং ব্রাহ্মণদের পর্যাপ্ত দক্ষিণা প্রদান করলেন। ধৃতরাষ্ট্রের জন্য সোনা, রূপা, গাভী এবং বহুমূল্য শয্যাদান করলেন। এইভাবে মাতা গান্ধারী এবং কুন্তীর উদ্দেশ্যেও পৃথকভাবে দান করলেন। সেই সময় যে, যে বস্তু যতটা আকাঙ্ক্ষা করেছিল, তাকে সেই বস্তুই তত মাত্রায় দান করা হয়। এইভাবে শ্রাদ্ধকর্ম ও দান করে যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে প্রবেশ করলেন। যাদের হরিদ্বারে প্রেরণ করা হয়েছিল, তারাও রাজার নির্দেশানুসারে শ্রাদ্ধ করে তিনজনের অস্থি সংগ্রহ করে ফুল-চন্দনে পূজা করে গঙ্গায় বিসর্জন করে। পরে হস্তিনাপুরে ফিরে তারা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে সমস্ত সমাচার নিবেদন করে। দেবর্ষি নারদ রাজা যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিয়ে নিজ অভীষ্ট স্থানে চলে গেলেন। এইভাবে (যুদ্ধ সমাপ্ত হলে) রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁর জ্ঞাতি-ভাই, আত্মীয়-কুটুম্ব, মিত্র-বন্ধুদের দান দিয়ে পনেরো বছর হস্তিনাপুরে বাস করেন এবং তিন বছর বনে তপস্যা করে মৃত্যুবরণ করেন।

॥ আশ্রমবাসিকপর্ব সমাপ্ত ॥

মৌসলপর্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর সখা অর্জুন, তাঁর লীলা প্রকাশকারিণী ভগবতী সরস্বতী এবং তাঁর প্রবক্তা ভগবান ব্যাসকে নমস্কার করে অধর্ম ও অশুভ শক্তির পরাভবকারী চিত্তশুদ্ধিকারী মহাভারত গ্রন্থের পাঠ করা উচিত।

যুধিষ্ঠিরের অলক্ষণ দর্শন এবং দ্বারকাতে উৎপাত দেখে শ্রীকৃষ্ণের যাদবগণকে তীর্থযাত্রায় যাওয়ার নির্দেশ দান

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! মহাভারত যুদ্ধের পর ছত্রিশতম বৎসর আরম্ভ হলে রাজা যুধিষ্ঠির নানাপ্রকার অলক্ষণ দেখতে লাগলেন। প্রচণ্ড বেগে ঝড়-তুফান এবং পাথর বর্ষণ হতে লাগল। পাখিরা ডানদিকে মণ্ডলাকারে উড়তে লাগল। নদীগুলির জল বালিতে গতি হারাল এবং সর্বদিক কুয়াশায় আচ্ছন্ন হল। আকাশ থেকে উল্কাবর্ষণ হতে লাগল। সূর্যমণ্ডল ধুলায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। সূর্যোদয়ের সময় সূর্যে তেজ থাকত না এবং তার মণ্ডলে কবন্ধ (মস্তকবিহীন শরীর) দেখা যেত। সূর্য ও চন্দ্রের চারদিকে ভয়ানক বলয় দৃষ্টিগোচর হত। তার পাশে লাল, কালো ও ধূসর—তিনটি রং দেখা যেত। আরও নানা ভীতিপ্রদ উৎপাত দেখা যাচ্ছিল। এর কিছুদিন পরেই যুধিষ্ঠির খবর পেলেন যে 'মুষল দ্বারা সমস্ত বৃষ্ণিবংশের সংহার হয়েছে, শুধু শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামই তার থেকে রক্ষা পেয়েছেন।' রাজা যুধিষ্ঠির এই সংবাদ শুনে ভ্রাতাদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—'এখন আমাদের কী করা উচিত ?' ব্রহ্মদণ্ডের প্রভাবে বৃষ্ণিবংশের বিনাশের খবর শুনে পাণ্ডবরা অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তাঁরা দুঃখশোকে হতাশ হয়ে গেলেন।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—বিপ্রবর ! বৃষ্ণি, অন্ধক এবং ভোজবংশের বীরদের কে অভিশাপ দিয়েছিলেন, যাতে তাঁদের সংহার হল কৃপা করে এই প্রসঙ্গ আপনি বিস্তারিতভাবে বলুন।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! কোনো এক সময়ের কথা—মহর্ষি বিশ্বামিত্র, কণ্ব এবং তপোধন নারদ দ্বারকাতে গিয়েছিলেন। তাঁদের দেখে দৈবের বশে সারণ ইত্যাদি বীর শাম্বকে নারীবেশে সাজিয়ে তাঁদের কাছে নিয়ে গিয়ে বলেন—'মহর্ষিগণ ! এ মহাতেজস্বী বভ্রুর স্ত্রী। বভ্রু পুত্রের জন্য অত্যন্ত লালায়িত। আপনারা ভালোভাবে দেখে

বলুন, এর গর্ভে কী জন্মগ্রহণ করবে ?' এই বলে তাঁরা যখন মিথ্যাদ্বারা ঋষিদের অপমান করেন তখন মুনিরা ক্রোধান্বিত হয়ে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে বললেন—'মূর্খগণ ! এই শ্রীকৃষ্ণপুত্র শাম্ব বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশ বিনাশ করার জন্য এক ভয়ংকর মুষল প্রসব করবে, যার দ্বারা তোমাদের মতো দুরাচারী, ক্রূর এবং ক্রোধীরা নিজেদের সমস্ত কুল ধ্বংস করে ফেলবে, শুধুমাত্র বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের ওপর এটি কার্যকরী হবে না। বলরাম নিজেই শরীর ত্যাগ করে সমুদ্রে প্রবেশ করবেন। মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ যখন ভূমিতে শয়ন করবেন, তখন জরা নামক ব্যাধ তাঁকে বাণে বিদ্ধ করবে।' এই কথা বলে মুনিগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এই সংবাদ শুনে মধুসূদন বৃষ্ণিবংশীয়দের সেই সংবাদ জানালেন। তিনি সকলের বিনাশ সম্বন্ধে অবগত ছিলেন ; তাই তিনি যাদবদের বললেন 'ঋষিদের এই কথা অবশ্যই সত্য হবে।' এই বলে তিনি গৃহে ফিরে গেলেন। যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জগতের ঈশ্বর, তা সত্ত্বেও তিনি যদুবংশীয়দের পরিণাম রদ করতে চাইলেন না।

পরদিন শাম্ব একটি মুষল প্রসব করলেন। যাদবেরা উগ্রসেনকে সেই সংবাদ জানালেন। রাজা সেই খবরে অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হলেন, তিনি সেই মুষলটি চূর্ণ করিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করালেন। তারপর উগ্রসেন, শ্রীকৃষ্ণ, বলভদ্র এবং বভ্রুর আজ্ঞানুসারে নগরে ঘোষণা করা হল যে 'এখন থেকে কোনো বৃষ্ণিবংশীয় বা অন্ধক বংশীয় নগরবাসী যেন গৃহে মদ তৈরি না করে। কোনো ব্যক্তি গোপনে যদি এইরূপ পানীয় তৈরি করে, তাহলে তাকে আত্মীয়-বন্ধুসহ শূলে চড়ানো হবে।' এই ঘোষণা শুনে সমস্ত দ্বারকাবাসী রাজার ভয়ে মদ প্রস্তুত না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! এইভাবে বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয়গণ আসন্ন সংকট নিবারণের জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা নিচ্ছিল ; কিন্তু কাল ক্রমশ তাদেরকে ঘিরে ধরছিল। তার আকৃতি অতি ভয়ংকর, বিকট বেশ, দেহের বর্ণ কালো-হলুদ। সে মুণ্ডিত মস্তকে পুরুষ বেশে বৃষ্ণিদের ঘরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে যেত। তাকে দেখতে পেলে ধনুর্ধর বীরেরা বাণবর্ষণ করত, কিন্তু সে ছিল অশরীরী, তাই বাণ তাকে বিদ্ধ করতে পারত না। প্রতিদিন ভয়ংকর ঝড় উঠতে লাগল। ইঁদুররা সংখ্যায় এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে রাস্তায় যত্রতত্র ঘুরে বেড়াত, রাত্রে মানুষের নখ, চুল কেটে নিত, ঘরে সর্বক্ষণ তাদের চিঁ চিঁ শব্দ শোনা যেত। কালের প্রেরণায় বৃষ্ণি ও অন্ধকদের গৃহে সাদা পাখা আর রক্তবর্ণ পা সম্পন্ন পায়রা ঘুরে বেড়াত। গাভীর গর্ভে গর্দভ, ঘোড়ার গর্ভে হাতি, কুকুরের দ্বারা বিড়াল এবং নেউলের পেট থেকে ইঁদুরের জন্ম হতে লাগল। সেই সময় যদুবংশীয়রা পাপকাজ করতে লজ্জা পেত না। তারা দেবতা, ব্রাহ্মণ, পিতৃপুরুষ ও গুরুজনদেরও অপমান করত। শুধু বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ তাদের অপমানের হাত থেকে রক্ষা পেতেন। যখন শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি হত, তখন যদুবংশীয়দের গৃহের চারদিকে গাধার ভীষণ ডাক শোনা যেত। এইভাবে কালের বিপরীত গতি দেখে এবং পক্ষের ত্রয়োদশ দিনে অমাবস্যা জেনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশীদের বললেন—'বীরগণ ! মহাভারত যুদ্ধের সময় যেমন যোগ হয়েছিল, এবার আমাদের সংহারের জন্য সেই যোগ উপস্থিত হয়েছে।' এই বলে শ্রীকৃষ্ণ কালের অবস্থান বিচার করতে লাগলেন। ভাবতে ভাবতে তাঁর মনে পড়ল 'পুত্র-পরিজন মারা যাওয়ার পর পুত্রশোকে সন্তপ্ত গান্ধারী যদুবংশীদের যে শাপ দিয়েছিলেন, মনে হয় সেই সময় উপস্থিত—ছত্রিশতম বছর আগত।' এই ভেবে গান্ধারীর শাপ সত্য করার জন্য তিনি যদুবংশীয়দের তীর্থযাত্রার আদেশ দিলেন। ভগবানের আদেশে রাজপুরুষেরা সমস্ত নগরে ঘোষণা করল যে, 'সকলে সমুদ্রতীরে প্রভাসতীর্থে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হও।'

যদুবংশের সংহার

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! দ্বারকার নারীগণ রাত্রে স্বপ্ন দেখতেন যে, এক কৃষ্ণবর্ণা নারী সাদা দাঁত বার করে হাসতে হাসতে তাদের মাথার সিঁদুর মুছে দিয়ে নগরে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। পুরুষেরা স্বপ্ন দেখতেন যে ভয়ংকর এক গৃধ্র এসে বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশের মানুষদের ধরে ধরে খাচ্ছে। অত্যন্ত ভীষণ এক রাক্ষস তাঁদের বসন-ভূষণ-ধ্বজা কবচ চুরি করে পালাচ্ছে। তখন বৃষ্ণি ও অন্ধক মহারথীগণ তাঁদের পরিবারসহ তীর্থযাত্রা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তারপর তাঁরা রথ, ঘোড়া, হাতিতে করে নগর থেকে বার হলেন। সমস্ত যাদব নারীপুরুষ প্রভাস ক্ষেত্রে পৌঁছে নিজ নিজ স্থানে আশ্রয় নিলেন। যোগবেত্তা উদ্ধব যখন শুনলেন যে যদুবংশীয় বীরেরা প্রভাসক্ষেত্রে সমুদ্রতীরে বাস করছেন, তখন তিনি সেখানে এসে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিদায় নিলেন। তাঁর যাওয়ার সময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে হাত জোড় করে প্রণাম করলেন। ভগবান যদুবংশীয়দের বিনাশের কথা জানতেন, তাই তিনি গমনোদ্যত উদ্ধবকে সেখানে থাকতে অনুরোধ করেননি।

তারপর একদিন যাদব গোষ্ঠীতে উপবিষ্ট সাত্যকি মদের নেশায় কৃতবর্মাকে উপহাস ও অসম্মান করে বললেন—'হার্দিক্য ! এমন কে বীর আছে যে নিজেকে ক্ষত্রিয় বলে মনে করে, অথচ তোমার মতো রাত্রিবেলা ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন মানুষকে হত্যা করে ? তুমি যে অন্যায় করেছে, কোনো যদুবংশীয় বীর কখনো তা ক্ষমা করবে না।' সাত্যকির কথা শুনে প্রদ্যুম্নও তা অনুমোদন করে কৃতবর্মাকে অপমান করলেন। তাঁদের কথা শুনে কৃতবর্মা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বাঁ হাত তুলে সাত্যকিকে অপমান করে বললেন—'আরে ! ভূরিশ্রবার যখন হাত কেটে গিয়েছিল এবং তিনি আমৃত্যু উপবাসের সিদ্ধান্ত নিয়ে রণভূমিতে বসেছিলেন, সেই অবস্থায় বীর হয়েও তুমি তাঁকে কী করে নৃশংসভাবে হত্যা করলে ?' তাঁর কথা শুনে সাত্যকি ক্রোধে অধীর হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—'আমি সত্য শপথ করে বলছি আজ এই পাপীকে হত্যা করে দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীর কাছে পাঠিয়ে দেব।' এই বলে সাত্যকি শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে লাফিয়ে উঠে এসে তরবারি দিয়ে কৃতবর্মার মাথা দেহের থেকে আলাদা করে দিলেন। তারপর তিনি অন্য বীরদেরও মৃত্যুমুখে পাঠাতে লাগলেন। তাই দেখে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বাধা দেবার জন্য ছুটলেন।

ইতিমধ্যে কালের প্রেরণায় ভোজ ও অন্ধকবংশের বীরেরা সাত্যকিকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরলেন। তাঁদের ক্রুদ্ধ হয়ে সাত্যকিকে আক্রমণ করতে দেখে রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন ক্রোধপূর্ণ হয়ে সাত্যকিকে রক্ষা করার জন্য ভোজবংশীয় বীরদের আক্রমণ করলেন। অন্যদিকে সাত্যকি অন্ধক-বংশীয়দের সঙ্গে যুদ্ধে মেতে উঠলেন। দুই বীর অত্যন্ত উৎসাহ ও পরিশ্রমে বিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন কিন্তু বিপক্ষের সংখ্যা বেশি থাকায় তাঁরা তাঁদের পরাজিত করতে পারলেন না এবং শ্রীকৃষ্ণের সামনেই দুজনে মৃত্যুবরণ করলেন। নিজ পুত্র প্রদ্যুম্ন এবং সাত্যকিকে মারা যেতে দেখে ক্রোধান্বিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ একমুষ্টি ঘাস ছিঁড়ে নিলেন। তিনি হাতে নিতেই সেই ঘাস বজ্রের ন্যায় লৌহ মূষলে পরিণত হল। তখন তাঁর সামনে যারা ছিল, তাঁদের সকলকেই ভগবান সেই মূষলের দ্বারা মৃত্যুমুখে পৌঁছে দিলেন। সেই সময় কালের প্রেরণায় অন্ধক, ভোজ, শিনি এবং বৃষ্ণিবংশের বীরেরা সেই হাঙ্গামায় একে অপরকে মূষলের আঘাতে ধরাশায়ী করতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে যে কেউই এরকম ঘাস হাতে নিচ্ছিলেন, সেটিই বজ্রের মতো হয়ে যাচ্ছিল। জনমেজয় ! এসবই ব্রাহ্মণদের শাপের প্রভাব যে তৃণও মূষলে পরিণত হয়ে যাচ্ছিল। সেই তৃণের দ্বারা যাকেই প্রহার করা যাচ্ছিল, সেই অভেদ্য বস্তুও তৃণের আঘাতে বিদ্ধ হচ্ছিল। তার দ্বারা পুত্র পিতাকে, পিতা পুত্রকে হত্যা করছিল। মত্ত যদুবংশীয়েরা নিজেদের মধ্যে

যুদ্ধ করে ধরাশায়ী হতে লাগল। আগুনে প্রাণ দেওয়া পতঙ্গের মতো অন্ধকবংশের যোদ্ধাগণসহ অন্যান্যরা প্রাণত্যাগ করতে লাগল, তবুও কেউ সেখান থেকে পালিয়ে গেল না। শ্রীকৃষ্ণের সামনেই শাম্ব, চারুদেষ্ণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, গদের মৃত্যু হল। তা দেখে তাঁর ক্রোধ বৃদ্ধি পেল, শঙ্খ, চক্র, গদাধারণকারী প্রভু তখন অন্য জীবিত বীরদের সংহার করলেন। তা দেখে মহাতেজস্বী বভ্রু এবং দারুক তাঁর কাছে গিয়ে বললেন—'প্রভু! এখন সকলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে। এদের অধিকাংশই আপনার হাতে মারা গেছেন। এখন বলদেবের অনুসন্ধান করা উচিত। চলুন, আমরা তিনজনে ঐদিকে যাই, যেদিকে বলরাম গিয়েছেন।'

—০—

বলরাম ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরমধাম-গমন

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্! তারপর দারুক, বভ্রু ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ—এই তিনজনে বলরামের চরণ চিহ্ন ধরে রওনা হলেন। কিছু দূর গিয়ে তাঁরা অনন্ত পরাক্রমশালী বলভদ্রকে এক বৃক্ষের নীচে বিরাজ করতে দেখলেন, তিনি একান্তে বসে কিছু চিন্তা করছিলেন। তাঁর কাছে পৌঁছে শ্রীকৃষ্ণ দারুককে নির্দেশ দিলেন যে 'তুমি শীঘ্র কুরুদের রাজধানী হস্তিনাপুরে গিয়ে অর্জুনকে যাদবদের এই মহাসংহারের সংবাদ জানাও। ব্রাহ্মণদের শাপে যদুবংশীয়দের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে অর্জুন যেন শীঘ্রই দ্বারকায় আসে।' শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে দারুক রথে করে কুরুদেশে রওনা হলেন। তাঁর যাওয়ার পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কাছে দণ্ডায়মান বভ্রুকে বললেন—'আপনি নারীদের রক্ষা করার জন্য শীঘ্র দ্বারকায় যান। এমন না হয় যে ধনলোভে ডাকাতরা তাদের মেরে ফেলে!' বভ্রু তাঁর ভ্রাতা ও বন্ধুদের মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হয়েছিলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশে যেই তিনি দ্বারকাপুরী গমন করতে উদ্যত হলেন, অমনি ব্রাহ্মণের শাপের প্রভাবে উৎপন্ন হওয়া এক মূষল ব্যাধের লৌহময় মুদ্গর থেকে তাঁর ওপরে এসে পড়ল এবং সেই আঘাতে বভ্রু মৃত্যুবরণ করলেন। বভ্রুকে মৃত দেখে অত্যন্ত তেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বললেন—'ভ্রাতা! আপনি এখানেই আমার জন্য প্রতীক্ষা করুন; আমি নারীদের আত্মীয় স্বজনের কাছে সমর্পণ করে আসছি। এই বলে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরীতে গিয়ে তাঁর পিতা বসুদেবকে বললেন—'তাত! আপনি অর্জুনের জন্য অপেক্ষা করুন এবং নারীদের রক্ষা করুন। বলরাম বনের ভেতর আমার জন্য প্রতীক্ষা করে আছেন, আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি। আমি স্বচক্ষে যদুবংশীয়দের বিনাশ দেখেছি. বীরশূন্য এই দ্বারকাপুরী আর আমি দেখতে পারছি না।'

এই কথা বলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতার চরণে প্রণাম করে শীঘ্র রওনা হয়ে গেলেন। তার মধ্যেই নগরের নারী ও শিশুদের তীব্র ক্রন্দন ও আর্তনাদের শব্দ শোনা গেল। যুবতীদের করুণ ক্রন্দনধ্বনি শুনে শ্রীকৃষ্ণ ফিরে এসে তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—'দেবীগণ! নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন শীঘ্রই এই নগরে আসবেন। তিনি তোমাদের সংকট থেকে রক্ষা করবেন।' এই বলে তিনি চলে গেলেন। বনে গিয়ে তিনি বলরামকে দর্শন করলেন, তিনি যোগযুক্ত হয়ে সমাধিতে বসেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সামনেই তাঁর মুখ দিয়ে এক শ্বেত বর্ণের বিশাল সর্প বেরিয়ে সমুদ্রের দিকে চলে গেল। তার হাজার হাজার মাথা ছিল এবং মুখ ছিল রক্ত বর্ণের। সমুদ্র স্বয়ং সশরীরে উপস্থিত হয়ে সেই ভগবান অনন্তকে স্বাগত জানালেন। সেই সঙ্গে দিব্য নাগ এবং নদীগুলিও তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। কর্কোটক, বাসুকি, তক্ষক, পৃথুশ্রবা, অরুণ, কুঞ্জর, মিশ্রী, শঙ্খ, কুমুদ,

পুণ্ডরীক, ধৃতরাষ্ট্র, হ্লাদ, ক্রাথ, শিতিকণ্ঠ, উগ্রতেজা, চক্রমন্দ, অতিষণ্ড, দুর্মুখ এবং অম্বরীষ প্রভৃতি নাগও তাঁর সেবায় উপস্থিত ছিলেন। রাজা বরুণও স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁরা সকলে এগিয়ে এসে অনন্ত ভগবানকে স্বাগত, অভিনন্দন এবং পাদ্য-অর্ঘ্যের দ্বারা পূজা করলেন। ভাই বলরাম পরমধাম গমন করলে সম্পূর্ণ গতিবিধি জানা দিব্যদর্শী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই শূন্য বনে বিচরণ করতে লাগলেন। বনে বিচরণ করতে করতে শ্রীকৃষ্ণ একস্থানে বসে চিন্তায় মগ্ন হলেন। পূর্বে গান্ধারী দেবী যে শাপ দিয়েছিলেন, সেই কথা স্মরণ করে তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর অন্তর্ধানের উপযুক্ত সময় আগত। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত অর্থের তত্ত্বজ্ঞ এবং অবিনাশী দেবতা ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি ত্রিলোক রক্ষার নিমিত্ত পরমধামে গমনের উদ্দেশ্যে মন-বাক্য-ইন্দ্রিয়াদি সংযমপূর্বক মহাযোগ (সমাধি) অবলম্বন করে মাটিতে শুয়ে পড়লেন। সেই সময় জরা নামক এক ব্যাধ হরিণের উদ্দেশ্যে সেখানে এসে যোগে নিদ্রিত শ্রীকৃষ্ণের পায়ে বাণের আঘাতে ক্ষয়ের সৃষ্টি করল। সে মৃগবধ করতে এসে শ্রীকৃষ্ণকেই মৃগ বলে ভুল করে। বাণবিদ্ধ করে সে শিকার ধরতে এলে যোগস্থ চতুর্ভুজ সমন্বিত পীতাম্বরধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সে দেখতে পেল। জরা নিজেকে অপরাধী ভেবে শঙ্কিত হৃদয়ে ভগবানের পদপ্রান্তে পড়ল। মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ তাকে আশ্বস্ত করে নিজ কান্তিতে আকাশ, পৃথিবী ব্যাপ্ত করে ঊর্ধ্বলোকে (নিজ পরম ধামে) গমন করলেন। অন্তরীক্ষে পৌঁছলে ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমার, রুদ্র, আদিত্য, বসু, বিশ্বদেব, মুনি, সিদ্ধ এবং অপ্সরাসহ প্রধান প্রধান গন্ধর্বগণ এগিয়ে এসে তাঁকে স্বাগত জানালেন। তারপর অনন্ত তেজস্বী, জগৎ সৃষ্টিকারী, অবিনাশী এবং যোগশাস্ত্রের আচার্য ভগবান নারায়ণ অনন্ত তেজে পৃথিবী এবং আকাশকে প্রজ্বলিত করে নিজ পরম ধাম—অপ্রমেয় পদ প্রাপ্ত হলেন। তাঁর পরম ধামে যাত্রা করার সময় দেবতা, ঋষি, চারণ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, সিদ্ধ ও সাধ্যগণ বিনীতভাবে তাঁর পূজা করেন। দেবতাগণ অভিনন্দন, মুনিগণ ঋগ্বেদের মন্ত্রোচ্চারণ, গন্ধর্বদের স্তবপাঠ এবং ইন্দ্র প্রীতিপূর্বক তাঁকে স্বাগত-সম্ভাষণ করেন।

দ্বারকায় এসে অর্জুনের বসুদেবের সঙ্গে আলোচনা এবং বসুদেবের নিধন

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্! দারুক কুরুদেশে গিয়ে মহারথী পাণ্ডবদের জানাল যে সমস্ত যদুবংশীয় বীর নিজেদের মধ্যে মুষলদ্বারা মারামারি করে নিহত হয়েছে। বৃষ্ণি, ভোজ, অন্ধক এবং কুকুর বংশের বীরদের বিনাশ হওয়ার কথা শুনে পাণ্ডবরা অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা অর্জুন সহসা একথা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর মাতুল বসুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। দারুকের সঙ্গে বৃষ্ণিদের গৃহে পৌঁছে তিনি দেখলেন দ্বারকা নগরী বিধবা নারীর ন্যায় শ্রীহীন হয়ে রয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ষোলো হাজার রানি অর্জুনকে দেখে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তাঁদের দেখে অর্জুনের চোখেও জল ভরে এল। পতি-পুত্র-হীনা সেই অবলা নারীদের দিকে তিনি তাকাতে পারছিলেন না। দ্বারকা নগরী এবং শ্রীকৃষ্ণের পত্নীদের এই দুরবস্থা দেখে অর্জুন মাটিতে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। সত্রাজিতের কন্যা সত্যভামা এবং রুক্মিণী ও অন্যান্য পাটরানিরাও অর্জুনের কাছে এসে কাঁদতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁরা অর্জুনকে সোনার সিংহাসনে বসিয়ে তাঁর চারপাশে চুপ করে বসলেন। সেইসময় পাণ্ডুনন্দন অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নানাগুণের কথা বলে সেই দুঃখিনী নারীদের

সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। তারপর তিনি তাঁর মাতুল বসুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তাঁর মহলে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন মহাত্মা বসুদেব পুত্রশোকে শোকার্ত হয়ে মাটিতে পড়ে আছেন। মাতুলের এই অবস্থা দেখে অর্জুন কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দুই পা ধরলেন। বসুদেব

দুহাতে অর্জুনকে তাঁর বুকে জড়িয়ে ধরে তাঁর সব পুত্র, পৌত্র, ভাই, দৌহিত্র, মিত্রদের স্মরণ করে কাঁদতে লাগলেন।

বসুদেব বললেন—অর্জুন ! যে বীরেরা শতশত দৈত্য এবং রাজাদের পরাজয় করেছিল, আজ আর তারা কেউ নেই, এতেও আমার প্রাণ নির্গত হয়নি। যারা তোমার প্রিয় শিষ্য ছিল এবং যাদের তুমি অত্যন্ত সম্মান করতে, বৃষ্ণিবংশের বীরদের মধ্যে যে দুজনকে অতিরথ বলা হত এবং তুমি যাদের প্রশংসা করতে শ্রীকৃষ্ণের সেই স্নেহভাজন প্রদ্যুম্ন এবং সাত্যকিই বৃষ্ণিবংশীয়দের বিনাশের প্রধান কারণ হয়েছিল। আর আমি কেনই বা সাত্যকি, কৃতবর্মা, অক্রূর ও প্রদ্যুম্নের নিন্দা করছি ? প্রকৃতপক্ষে ঋষিদের শাপই এই সর্বনাশের প্রধান কারণ। যে জগদীশ্বর কেশী, কংস, চেদিরাজ, শিশুপাল, নিষাদরাজ একলব্য, কলিঙ্গ, মগধ, গান্ধার, কাশীরাজ ও মরুভূমির রাজাদের যমলোকের অতিথি করেছিলেন ; যিনি পূর্ব, দক্ষিণ এবং পার্বত্য-প্রান্তের নরেশদের সংহার করেছেন, সেই মধুসূদন অনীতির জন্য উপস্থিত এই সংকটকে বালকের ন্যায় উপেক্ষা করেছেন। তুমি, দেবর্ষি নারদ এবং অন্যান্য মহর্ষিরাও শ্রীকৃষ্ণকে পাপ সম্পর্করহিত সনাতন পরমেশ্বর বলে মেনে থাকেন ; সেই পরমাত্মা নির্বিবাদে তাঁর আত্মীয়স্বজনদের হত্যাকাণ্ড দেখলেন এবং উদাসীন হয়ে রইলেন। মনে হয় আমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ জগদীশ্বর, গান্ধারী এবং ঋষিদের বাক্য অন্যথা করতে চাননি। অর্জুন ! সকলের চোখে দেখা ঘটনা হল তোমার পৌত্র পরীক্ষিৎ অশ্বত্থামার হাতে নিহত হয়েও শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে জীবিত হয়েছিল। এতো শক্তিশালী হয়েও তোমার সখা নিজের আত্মীয়-কুটুম্বকে রক্ষা করেননি। যখন পুত্র, পৌত্র, ভাই, মিত্র—সকলে একে অন্যের হাতে মরে ধরাশায়ী হয়ে যায়, সেই অবস্থায় তাদের দেখে শ্রীকৃষ্ণ এসে আমাকে বলে—'পিতা ! এই কুল আজ শেষ হয়ে গেল। অর্জুন দ্বারকাপুরীতে আসবেন ; তিনি এলে তাঁকে বৃষ্ণিবংশ মহানাশের খবর জানাবেন। অর্জুন মহাতেজস্বী। যদুবংশীয়দের নিধনের খবর শুনে তিনি শীঘ্রই যে এখানে এসে পড়বেন, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আমি যা, অর্জুনও তাই, অর্জুন যে, আমিও সেই। অর্জুন যা বলেন, তাই করবেন। যেসব নারীর সন্তান প্রসবকাল সমাগত, অর্জুন তাদের ওপর বিশেষ নজর দেবেন এবং তিনিই আপনার ঔর্ধ্বদেহিক সংস্কার করবেন। অর্জুন এখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেই চতুঃপার্শ্বের প্রাচীর ও অট্টালিকাসহ এই নগরী সমুদ্র গ্রাস করবে। আমি কোনো পবিত্রস্থানে অবস্থান করে ব্রত-নিয়ম পালন করে বলরামের সঙ্গে কালের প্রতীক্ষা করব।' অচিন্ত্য পরাক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলে নারী ও বালকদের সঙ্গে আমাকে এখানেই রেখে নিজে কোনো অজ্ঞাতস্থানে চলে গেলেন। তখন থেকে আমি তোমার দুই ভ্রাতা মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম এবং অন্যান্য আত্মীয়দের কথা স্মরণ করে শোকমগ্ন হয়ে আছি। আহার করতে পারিনি। আমি আর আহারও গ্রহণ করব না এবং এই জীবনও রাখব না। পাণ্ডুনন্দন ! সৌভাগ্যের কথা যে, তুমি এখানে এসে গেছ। এখন শ্রীকৃষ্ণের কথানুসারে কাজ করো। এই রাজ্য, নারীরা এবং রত্নসামগ্রী সবই তোমার অধীন। এবার আমি নিশ্চিন্তে প্রাণত্যাগ করব।

মাতুলের কথা শুনে অর্জুন মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি বসুদেবকে বললেন—'মাতুল ! বৃষ্ণিবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ এবং ভ্রাতাদের না থাকায় এই পৃথিবী আমি আর দেখতে পারছি না। রাজা যুধিষ্ঠির, আর্য ভীমসেন, নকুল, সহদেব এবং

দ্রৌপদীও আর এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকা সহ্য করবেন না, আমাদের সকলেরই এক হৃদয়। রাজা যুধিষ্ঠিরেরও পরলোক-গমনের সময় এসে গেছে। এখন আমি বৃষ্ণিবংশীয় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাদের নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে চলে যাব।' তারপর তিনি দারুককে বললেন—'আমি বৃষ্ণিবংশের বীর মন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।' তারপর তিনি শোক জ্ঞাপন করতে করতে সুধর্মা-সভায় প্রবেশ করে এক সিংহাসনে উপবেশন করলেন। সেইসময় রাজ্যের অঙ্গভূত সমস্ত অমাত্যগণ (মন্ত্রী আদি) এবং বেদবেত্তা ব্রাহ্মণেরা তাঁর চতুষ্পার্শ্বে উপবেশন করলেন ; তাঁরা সকলেই, দীন, মোহগ্রস্ত ও অচেতন-প্রায় হয়েছিলেন, অর্জুনের অবস্থা আরও কাহিল। তিনি সভাসদদের বললেন—'আমি বৃষ্ণি এবং অন্ধক বংশের লোকদের নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে চলে যাব ; কারণ সমুদ্র এখন এই নগরীকে গ্রাস করবে। সুতরাং আপনারাও ধন-সামগ্রীসহ প্রস্তুত হন। ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র বজ্রকে আপনাদের রাজা করে দেওয়া হবে। আজ থেকে সপ্তম দিনে সূর্যোদয় হলেই আমরা এই নগর থেকে রওনা হয়ে যাব। সুতরাং আপনারা শীঘ্র প্রস্তুত হোন।'

অর্জুনের নির্দেশে সমস্ত মন্ত্রী তাঁদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শীঘ্রই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহলে অর্জুন সেই রাত কাটালেন। পরদিন প্রভাতে বসুদেব নিজ চিত্ত সমাহিত করে যোগের দ্বারা উত্তমগতি লাভ করলেন। তাঁর মহলে ক্রন্দনের রোল উঠল। সব নারী বিস্রস্ত বেশে, আলুলায়িত কেশে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। অর্জুন এক বহুমূল্য পালঙ্ক সাজিয়ে তাতে বসুদেবের মরদেহ শোয়ালেন, তারপর বহু মানুষ তাঁকে কাঁধে করে নগরের বাইরে নিয়ে গেলেন। সেই সময় সমস্ত দ্বারকাবাসী এবং আশপাশের বহুলোক দুঃখশোকে মগ্ন হয়ে বসুদেবের শবানুগমন করল। তাঁর মৃতদেহকে অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্যবহৃত ছাতা এবং অগ্নিহোত্রের অগ্নি নিয়ে যাজক ব্রাহ্মণগণ অনুগমন করছিলেন। তাঁদের পেছনে বসুদেবের পত্নীগণ বস্ত্রালংকারে সজ্জিত হয়ে হাজার হাজার পুত্রবধূদের সঙ্গে যাচ্ছিলেন। বসুদেবের জীবিতকালে যে স্থান তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল, সেইস্থানে তাঁর দাহকার্য সমাপন করা হল। চিতায় অগ্নিসংযোগ করা হলে বসুদেবের চার পত্নী দেবকী, ভদ্রা, রোহিণী ও মদিরা চিতায় গিয়ে বসলেন এবং বসুদেবের সঙ্গেই উত্তমগতি প্রাপ্ত করে পরলোক গমন করলেন। পাণ্ডুনন্দন অর্জুন মালা-চন্দন দ্বারা বিভূষিত করে অগ্নি সংস্কার কার্য সমাপন করলেন। দাহকার্য সমাপ্ত হলে বজ্র এবং বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়গণ চিতায় জল সমর্পণ করলেন। পরে যেখানে বৃষ্ণিদের সংহার হয়েছিল, অর্জুন সেই স্থানে গিয়ে বীরদের মৃতদেহ দেখে শোকমগ্ন হলেন এবং তাদের সকলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করলেন। বিধিমতো সকলের মৃত্যোত্তর কার্য সমাপন হলে সপ্তম দিনে অর্জুন দ্বারকা থেকে ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে রওনা হলেন। তাঁর সঙ্গে ঘোড়া, বলদ, উটের গাড়ি ও রথে করে শোকদুর্বল বৃষ্ণিবংশীয় বীরদের পিতা-পুত্র ও পত্নীরা চললেন। অর্জুনের নির্দেশে তাঁদের পরিচারক, ঘোড়সওয়ার এবং অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—সকলেই শ্রীকৃষ্ণের ষোলো হাজার পত্নী ও তাঁদের পৌত্র বজ্রের সঙ্গে চললেন। সেই বিশাল বাহিনী জনসমুদ্রের ন্যায় অর্জুনের সঙ্গে চলল। তাঁরা সকলে নগরের বাইরে গেলে হাঙর-কুমীর-পরিবৃত সমুদ্র দ্বারকানগরী গ্রাস করল।

এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে দ্বারকাবাসীগণ দ্রুত চলতে লাগলেন। সেই সময় তাঁরা বারংবার বলতে লাগলেন—'দৈবের লীলা কী অদ্ভুত।' অর্জুন সুন্দর সুন্দর স্থানে শিবির স্থাপন করে এগোতে লাগলেন। চলতে চলতে তাঁরা সমৃদ্ধিশালী পঞ্চনদের দেশে এসে পৌঁছলেন। সেই দেশ গবাদি পশু এবং ধনধান্যে পরিপূর্ণ ছিল। অর্জুন সেইস্থানে শিবির স্থাপন করলেন। একাকী অর্জুনের সংরক্ষণে এই বিশাল জনসমুদ্র দেখে সেখানকার তস্করদের মনে লোভ উৎপন্ন হল, তারা সব আভীর জাতির লোক। একত্রিত হয়ে তারা পরামর্শ করল—'ভাই! দেখ, ধনুর্ধর অর্জুন আমাদের গুরুত্ব না দিয়ে একাই এই বালক-বৃদ্ধ-নারীদের নিয়ে যাচ্ছেন। এদের সব সৈনিককেও হতোদ্যম বলে মনে হচ্ছে। (এদের এখন আক্রমণ করা উচিত)।' এরূপ সিদ্ধান্ত নিয়ে লুটপাট করার জন্য লাঠিসোঁটা নিয়ে হাজার হাজার লোকে সিংহগর্জন করে বৃষ্ণিবংশীয়দের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের পেছন দিক থেকে আক্রমণ করতে দেখে কুন্তীনন্দন অর্জুন তাঁর পদাতিক সৈন্যদের সঙ্গে সহসা পেছনে ঘুরে দাঁড়ালেন এবং হাসতে হাসতে বললেন—'পাপীগণ ! যদি বাঁচতে চাও তাহলে ফিরে যাও, নাহলে আমার বাণে বিদ্ধ হয়ে অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হবে।'

বীরবর অর্জুনের কথা শুনে তারা সেই কথায় গুরুত্ব দিল না এবং বারংবার বারণ করা সত্ত্বেও তারা এঁদের আক্রমণ করল। তখন অর্জুন তাঁর দিব্য গাণ্ডীব ধনুকে বাণ

চড়ালেন, কিন্তু তিনি যখন তাঁর অস্ত্রশস্ত্র স্মরণ করতে গেলেন, তখন তাঁর কিছুই মনে পড়ল না। তাতে অর্জুন অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। গজারোহী এবং রথী সৈনিকরাও ডাকাতদের হাত থেকে নিজেদের লোকদের রক্ষা করতে পারল না। এদের মধ্যে নারীরাই সংখ্যাধিকা ছিলেন, ডাকাতরা তাঁদের আক্রমণ করলে, অর্জুন তাঁদের রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলেন। সব যোদ্ধাদের সামনেই ডাকাতেরা সুন্দরী নারীদের টেনে নিয়ে যেতে লাগল। অনোর এই দুর্দশা দেখে বহু নারী চুপচাপ নিজেদের ডাকাতের হাতে সমর্পণ করল। অর্জুন তা লক্ষ্য করে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বৃষ্ণিবংশীয় যোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে গাণ্ডীব ধনুক থেকে বাণবর্ষণ করে ডাকাত সংহার করতে আরম্ভ করলেন ; কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে তাঁর বাণ ফুরিয়ে গেল। বাণের অভাবে অর্জুন অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে ধনুকের আঘাতেই ডাকাত বধ করতে লাগলেন। জনমেজয় ! তখন পার্থের সামনেই ডাকাত ও লুণ্ঠনকারীরা বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় সুন্দরীদের লুঠ করে নিয়ে গেল। অর্জুন এটি দৈবের বিধান মনে করে দুঃখে শোকে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন। তাঁর অস্ত্রজ্ঞান বিলুপ্ত হয়েছিল, বাহুতে আগের মতো শক্তি ছিল না, ধনুক ঠিকমতো ধরতে পারছিলেন না এবং অক্ষয়-বাণও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছিল। এসবই দৈবের লীলা ভেবে অর্জুন অত্যন্ত বিষণ্ণ হলেন এবং লুণ্ঠনকারীদের অনুসরণ না করে ফিরে এলেন। তারপর অন্য যারা সঙ্গে ছিলেন তাঁদের এবং তস্করদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া ধনরত্ন নিয়ে তিনি কুরুক্ষেত্রে এলেন। এইভাবে অর্জুন বৃষ্ণিবংশীয়দের অবশিষ্ট পরিবারদের নিয়ে এসে, তাদের সেইখানে বসতি করে দিলেন। কৃতবর্মার পুত্রকে মার্তিকাবৎ রাজ্য প্রদান করলেন এবং ভোজরাজের পরিবারের নারীদের তাঁর সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর অন্যসব বালক-বৃদ্ধ-নারীদের সঙ্গে করে ইন্দ্রপ্রস্থে এসে তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা করলেন। অর্জুন সাত্যকির প্রিয় পুত্রকে সরস্বতীর তীরের (সারস্বত) দেশের অধিকারী করলেন এবং বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য প্রদান করলেন। বজ্র বহু বাধা দিলেও অক্রূরের পত্নীগণ বনে তপস্যা করতে চলে গেলেন। রুক্মিণী, গান্ধারী, শৈব্যা, হৈমবতী ও জাম্ববতী দেবী অগ্নিতে প্রবেশ করলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া সত্যভামা ও অন্যান্য দেবীগণ তপস্যা করার জন্য বনে গেলেন। যেসব দ্বারকার লোক পার্থের সঙ্গে এসেছিলেন, তাঁদের যথাযোগ্য ভাগ করে অর্জুন বজ্রের কাছে তাঁদের সমর্পণ করলেন। এইরূপ সময়োচিত ব্যবস্থা করে চোখের জল ফেলতে ফেলতে তিনি মহর্ষি ব্যাসদেবের আশ্রমে গিয়ে তাঁকে দর্শন করলেন।

—o—

অর্জুন ও ব্যাসদেবের আলাপ-আলোচনা

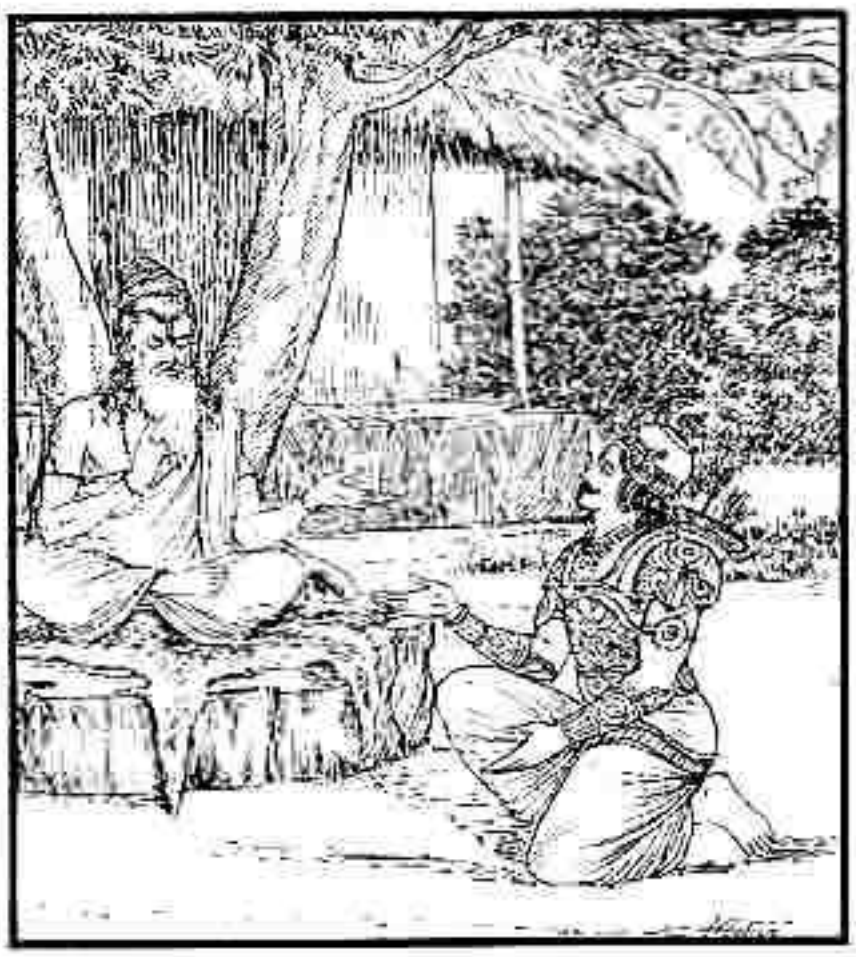

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! মহান ব্রতধারী এবং ধর্মজ্ঞ ব্যাসদেবের কাছে গিয়ে 'আমি অর্জুন' বলে ধনঞ্জয় তাঁর পদস্পর্শ করে প্রণাম করলেন। তাঁকে দেখে মহামুনি ব্যাস প্রসন্ন হয়ে বললেন—'পুত্র ! তোমাকে স্বাগত জানাই ; এসো, বোসো।' অর্জুনের চিত্ত অশান্ত ছিল, তিনি বিষণ্ণ মনে বারবার দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলেন। তাঁর অবস্থা দেখে ব্যাসদেব জিজ্ঞাসা করলেন—'পার্থ ! তোমার ওপর অশুদ্ধ জল পড়েনি তো ? তুমি রজস্বলা নারীর সঙ্গে সমাগম বা ব্রহ্মহত্যা করনি তো ? যুদ্ধে পরাস্ত হওনি তো ? তোমাকে এতো শ্রীহীন দেখাচ্ছে কেন ? যদি আমার শোনার যোগ্য হয়, তাহলে শীঘ্র সব বলো।'

অর্জুন বললেন—মুনিবর ! যাঁর সুন্দর দেহ মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ এবং নেত্র কমলদলের মতো বিশাল, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলরামসহ পরমধামে গমন করেছেন। ব্রাহ্মণদের

শাপে মুষল-যুদ্ধে বৃষ্ণিবীরেরা বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে। প্রভাসক্ষেত্রে রোমাঞ্চকারী সংগ্রামে সব বীরই নিহত হয়েছে। মহাবলী ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধকবংশীয় বীরেরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে মারা গেছে। সময়ের বিপরীত আচরণ দেখুন, যাদের বাহু সুদীর্ঘ বিশাল ছিল এবং যাঁরা গদা ও নানা অস্ত্রের আঘাত অক্লেশে সহ্য করতেন, সেই বীরসকল ঘাসের আঘাতে মারা গেলেন ? সেই অনন্ত তেজস্বী বীরদের বিনাশের দুঃখ আমি সহ্য করতে পারছি না। যদুবংশের সংহারের কথা ভেবে আমার মনে হচ্ছে যেন সমুদ্র শুকিয়ে গেছে, পর্বত ভেঙে পড়েছে, আকাশ নেমে এসেছে এবং আগুন শীতল হয়ে গেছে ! এ ঘটনা বিশ্বাসযোগ্য নয়, তবুও তা সত্য। এছাড়া আর একটি ঘটনা আরও দুঃখদায়ক। পঞ্চনদ নিবাসী আভীরেরা আমার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে আমার চোখের সামনেই বৃষ্ণিবংশীয় অসংখ্য নারীকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। আমার কাছে ধনুক থাকা সত্ত্বেও আমি শরসন্ধান করতে পারিনি। আগের মতো আমার বাহুবল নেই, অস্ত্রজ্ঞান বিলুপ্ত হয়েছে, আমার সব বাণ মুহূর্তের মধ্যে বিনষ্ট হয়ে গেছে। যাঁর স্বরূপ অপ্রমেয়, যিনি শঙ্খ-চক্র-গদাধারণকারী, চতুর্ভুজ, পীতাম্বরধারী, শ্যামসুন্দর তথা কমলের ন্যায় নয়নবিশিষ্ট যে পরমপুরুষ গোবিন্দ তাঁর অনন্ত প্রভা প্রসার করে আমার রথের অগ্রভাগে অবস্থান করে শত্রুসেনা ভস্ম করতেন, তাঁকে আমি আর দেখতে পাই না। তাঁর দর্শন না পেয়ে আমার অত্যন্ত দুঃখ হচ্ছে, মাথা ঘুরছে, চিত্ত উদ্বিগ্ন হয়েছে, আমি এক মুহূর্তও শান্তি পাচ্ছি না। বীরবর জনার্দন ছাড়া আমি আর বেঁচে থাকতে পারছি না। তাঁর অন্তর্ধানের কথা শুনে আমার দিকভ্রম হয়েছে। আমার আত্মীয় বিনাশ তো হয়েছেই, আমার পরাক্রমও নষ্ট হয়ে গেছে। শূন্য হৃদয়ে এখন আমি এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি। আপনি কৃপা করে আমাকে উপদেশ দিন, আমার কল্যাণ কীসে হবে ?

ব্যাসদেব বললেন—কুরুশ্রেষ্ঠ ! বৃষ্ণি এবং অন্ধকবংশের মহারথীরা ব্রাহ্মণদের শাপে দগ্ধ হয়ে বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে, তুমি তাদের জন্য শোক কোরো না। তাদের এমনই ভবিতব্য ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদিও তাদের এই বিপদ থেকে মুক্ত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা উপেক্ষা করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ত্রিলোকের সমস্ত প্রাণীর গতিই উলটে দিতে পারতেন ; তাহলে যাদবদের শাপ বিনষ্ট করা তাঁর কাছে এমন কোনো বড় ব্যাপার ছিল না। যিনি স্নেহবশত তোমার রথের অগ্রভাগে অবস্থান করতেন (সারথির কাজ করতেন), সেই বাসুদেব কোনো সাধারণ মানুষ নন, তিনি সাক্ষাৎ গদা-চক্রধারী আদি-ঋষি নারায়ণ। সেই বিশাল চক্ষুসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীকে ভারমুক্ত করে পরমধামে গমন করেছেন। বীরবর ! তুমিও ভীম এবং নকুল-সহদেবের সাহায্যে দেবতাদের মহান কার্য সম্পন্ন করেছ। আমার মনে হয় তোমরা তোমাদের সমস্ত কর্তব্য পূর্ণ করেছ। তোমরা সর্বপ্রকারে সাফল্যলাভ করেছ। এবার তোমাদের পরলোক গমনের সময় হয়েছে এবং তাই তোমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর। যখন উদ্ভবের সময় হয় তখন এইভাবেই মানুষের বুদ্ধি, তেজ ও জ্ঞানের বিকাশ হয় আর যখন বিপরীত সময় উপস্থিত হয় তখন এইসব বিনষ্ট হয়ে যায়। কালই এই সবের মূল। সংসারের উৎপত্তির বীজও কাল। তোমার অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজনও পূর্ণ হয়েছে ; তাই সেগুলি যেমন এসেছিল, তেমনই চলে গেছে। এখন তোমাদের উত্তমগতি লাভ করার সময় উপস্থিত। আমার মনে হয় এতেই তোমাদের কল্যাণ হবে।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! অমিত তেজস্বী ব্যাসদেবের কথার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব বুঝে অর্জুন তাঁর নির্দেশে হস্তিনাপুর গেলেন এবং সেখানে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের সমস্ত সংবাদ বিস্তারিতভাবে জানালেন

॥ মৌষলপর্ব সমাপ্ত ॥

মহাপ্রাস্থানিকপর্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর সখা অর্জুন, তাঁর লীলা প্রকাশকারিণী ভগবতী সরস্বতী এবং তাঁর প্রবক্তা ভগবান ব্যাসকে নমস্কার করে অধর্ম ও অশুভ শক্তির পরাভবকারী চিত্তশুদ্ধিকারী মহাভারত গ্রন্থের পাঠ করা উচিত।

দ্রৌপদীসহ পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থান

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্মন্! বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশের বীরদের মধ্যে মুষল-যুদ্ধের সংবাদ শুনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরমধাম গমনের পর পাণ্ডবেরা কী করলেন?

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্! কুরুরাজ যুধিষ্ঠির যখন বৃষ্ণিবংশীয়দের এইরূপ মহাসংহারের সংবাদ শুনলেন তখন মহাপ্রস্থানের সিদ্ধান্ত নিয়ে অর্জুনকে বললেন—'মহামতে! কালই সমস্ত প্রাণীকে বিনাশের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমি এখন কালের বন্ধন মেনে নিচ্ছি, তুমিও সেই সম্বন্ধে নিজের চিন্তা প্রকাশ করতে পারো।' ভ্রাতার কথায় অর্জুনও কালের অনিবার্যতা বলে তাঁর কথা অনুমোদন করলেন। অর্জুনের মনোভাব জেনে ভীমসেন এবং নকুল সহদেবও তাঁর বক্তব্য সমর্থন করলেন। যুধিষ্ঠির তখন যুযুৎসুকে আহ্বান করে তাঁর ওপর সমস্ত রাজ্যের দেখাশোনার ভার সমর্পণ করলেন এবং পরীক্ষিৎকে তাঁর রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করলেন। তারপর তিনি দুঃখিত চিত্তে সুভদ্রাকে বললেন—'মা! তোমার পৌত্র পরীক্ষিৎ কৌরবদের রাজা হবে এবং যদুবংশে যারা বেঁচে আছেন শ্রীকৃষ্ণ পৌত্র বজ্রকে তাঁদের রাজা করা হয়েছে। পরীক্ষিতের রাজ্য হবে হস্তিনাপুরে আর বজ্রের ইন্দ্রপ্রস্থে। তুমি রাজা বজ্রকেও দেখাশোনা করবে।' তারপর ভ্রাতাদের সঙ্গে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের, বৃদ্ধ মাতুল বসুদেবের এবং বলরাম ও অন্যান্যদের তর্পণ করলেন এবং অন্য সকলের নামে বিধিবৎ শ্রাদ্ধ করলেন। তারপর দ্বৈপায়ন ব্যাস, নারদ, মার্কণ্ডেয়, ভরদ্বাজ ও যাজ্ঞবল্ক্যকে সাদরে আমন্ত্রণ করে ভগবৎপ্রীত্যর্থ তাঁদের স্বাদু অন্ন পরিবেশন করলেন এবং ভগবৎনাম কীর্তন করতে করতে উত্তম ব্রাহ্মণদের নানা প্রকার রত্ন, বস্ত্র, গ্রাম, ঘোড়া, রথ প্রদান করলেন। তারপর গুরুবর কৃপাচার্যের পূজা করে নগরনিবাসী-সহ পরীক্ষিৎকে তাঁর সেবায় সমর্পণ করলেন। পরে সমস্ত প্রজাদের আহ্বান করে রাজর্ষি যুধিষ্ঠির তাদের মহাপ্রস্থান বিষয়ক সিদ্ধান্ত জানালেন। তাঁর কথা শুনেই নগর ও নগরপ্রান্তের লোকেরা উদ্বিগ্ন হয়ে বলল—

'মহারাজ ! আপনি এমন কাজ করবেন না (আমাদের ছেড়ে কোথাও যাবেন না)।' ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাদের নানাভাবে বুঝিয়ে রাজি করালেন এবং ভ্রাতাদের নিয়ে চলে যাওয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলেন। তখন যুধিষ্ঠির তাঁর বস্ত্রালংকার ছেড়ে বল্কল ধারণ করলেন। ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব এবং যশস্বিনী দ্রৌপদীও তাই করলেন। সকলে বল্কল বস্ত্র ধারণ করে ব্রাহ্মণদের দ্বারা বিধিপূর্বক উৎসর্গকালীন ইষ্টি করিয়ে অগ্নিকে জলে বিসর্জন দিলেন এবং মহাযাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন। পূর্বে পাশা খেলায় পরাস্ত হয়ে পাণ্ডবেরা যেমন বনগমন করেছিলেন, তেমনই দ্রৌপদীসহ তাঁদের যেতে দেখে নগরের নারীরা কাঁদতে লাগলেন ; কিন্তু পঞ্চভ্রাতা এই যাত্রায় অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। সকল পাণ্ডব, দ্রৌপদী ও একটি কুকুর—একসঙ্গে যেতে লাগল। তাঁরা যখন হস্তিনাপুর নগরীর বাইরে গেলেন তখন নগরনিবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বহুদূর পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে গেল ; কিন্তু কোনো ব্যক্তিই রাজা যুধিষ্ঠিরকে ফেরার কথা বলতে পারল না। ধীরে ধীরে সমস্ত পুরবাসী ও কৃপাচার্য প্রমুখ যুযুৎসুর সঙ্গে ফিরে এলেন। নাগকন্যা উলূপী গঙ্গায় প্রবেশ করলেন, চিত্রাঙ্গদা মণিপুর নগরে চলে গেলেন এবং বাকি মায়েরা পরীক্ষিৎকে নিয়ে রাজ্যে ফিরে এলেন।

মহাত্মা পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীদেবীসহ উপবাস করতে করতে পূর্বদিকে রওনা হলেন। তাঁরা সকলেই যোগযুক্ত, মহাত্মা ও ত্যাগ-ধর্ম পালনকারী ছিলেন। তাঁরা বহুদেশ, নদী, সমুদ্র যাত্রা করলেন। প্রথমে যুধিষ্ঠির, তাঁর পেছনে ভীম, ভীমের পেছনে অর্জুন, তারপর ক্রমশ নকুল ও সহদেব চলছিলেন। নারীশ্রেষ্ঠা দ্রৌপদী সবার পেছনে ছিলেন। এইভাবে তাঁরা ক্রমশ লালসাগরের তীরে পৌঁছলেন। অর্জুন দিব্য রত্ন মনে করে তখনও তাঁর গাণ্ডীব ধনুক এবং অক্ষয় তূণীর পরিত্যাগ করেননি। সেখানে পৌঁছে তাঁরা দেখলেন পুরুষরূপধারী সাক্ষাৎ অগ্নিদেব তাঁদের পথরোধ করে উপস্থিত। সাত প্রকার জ্বালারূপ জিহ্বায় সুশোভিত অগ্নিদেব পাণ্ডবদের বললেন—

'মহাবাহু যুধিষ্ঠির ! ভীমসেন এবং অর্জুন, নকুল, সহদেব ! তোমাদের জানা উচিত যে আমি অগ্নি। এখন তোমরা আমার কথা মন দিয়ে শোনো। আমি নর স্বরূপ অর্জুন এবং নারায়ণ স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবেই খাণ্ডববন দহন করেছিলাম। এখন অর্জুনের এই উত্তম অস্ত্র গাণ্ডীব ধনুক এখানেই পরিত্যাগ করে বনে যাওয়া উচিত ; কেননা এর আর কোনো প্রয়োজন নেই। এই গাণ্ডীব ধনুক সর্ব প্রকার ধনুকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আমি এটি অর্জুনের জন্যই বরুণের কাছ থেকে চেয়ে এনেছিলাম, এখন এটি আবার বরুণকেই ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।'

তাঁর কথা শুনে সকলেই অর্জুনকে সেই ধনুক ত্যাগ করতে বললেন। অর্জুন তাঁদের কথামতো ধনুক ও তূণীর জলে ফেলে দিলেন। তখন অগ্নিদেব অন্তর্ধান করলেন এবং পাণ্ডবেরা দক্ষিণাভিমুখে চললেন। যেতে যেতে তাঁরা লবণসমুদ্রের উত্তর তীর দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগোতে লাগলেন। তারপর পশ্চিম দিকে ঘুরে অগ্রসর হয়ে তাঁরা সমুদ্রে নিমজ্জিত দ্বারকাপুরীকে দেখলেন। পরে যোগ ও ধর্মস্থিত পাণ্ডবগণ পৃথিবী পরিক্রমা পূর্ণ করার ইচ্ছায় সেখান থেকে উত্তর দিকে যাত্রা করলেন।

পথে দ্রৌপদী ও সহদেবাদি চার পাণ্ডবের পতন

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! নিয়মপালনকারী যোগযুক্ত পাণ্ডবগণ পশ্চিম থেকে উত্তর দিকে এসে মহাগিরি সুমেরু দর্শন করলেন। সমস্ত পাণ্ডব একাগ্রচিত্তে অত্যন্ত দ্রুতভাবে এগোচ্ছিলেন। তাঁদের পেছনে আসতে আসতে দ্রৌপদী মাটিতে পড়ে গেলেন। তাঁকে পড়ে যেতে দেখে মহাবলী ভীম ধর্মরাজকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ভ্রাতা ! রাজকুমারী দ্রৌপদী কখনো কোনো পাপ করেনি ; তাহলে সে কেন নীচে পড়ে গেল বলুন ?'

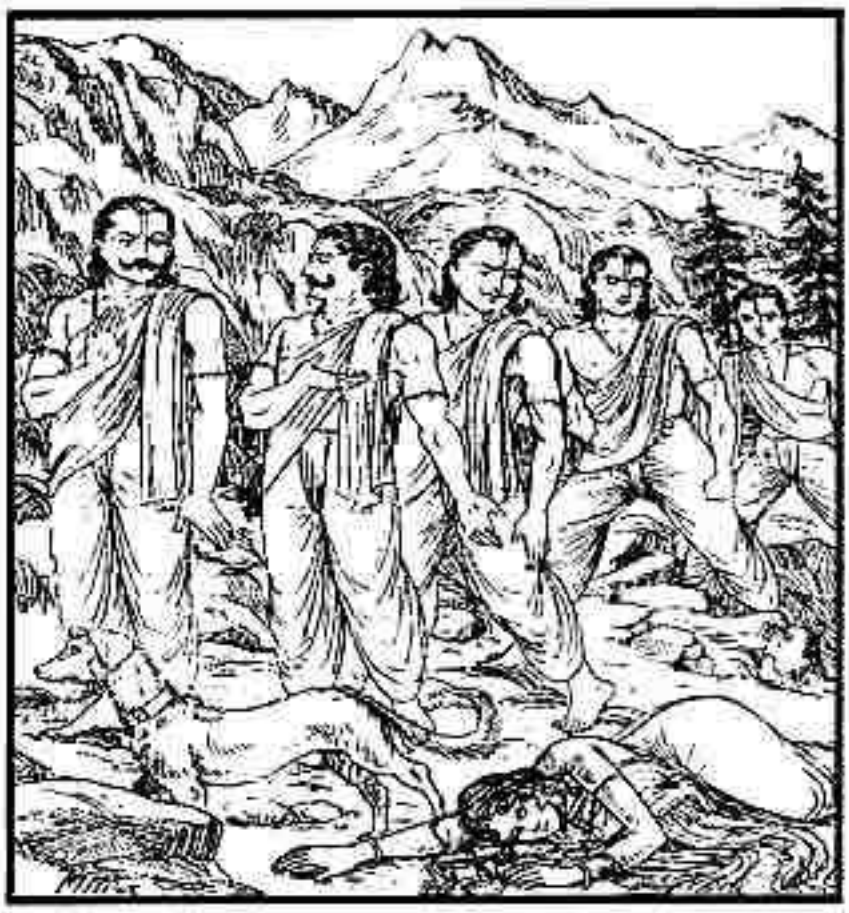

যুধিষ্ঠির বললেন—'নরশ্রেষ্ঠ ! এর মনে অর্জুনের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ছিল, আজ সে তারই ফল ভোগ করছে।'

একথা বলে ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর দিকে না তাকিয়ে নিজ চিত্ত একাগ্র করে এগিয়ে চললেন। কিছুক্ষণ পরে সহদেবও পড়লেন। তাঁকে পড়ে যেতে দেখে ভীম রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ভ্রাতা ! মাদ্রীনন্দন সহদেব, যে সর্বদা আমাদের সেবায় ব্যাপৃত থাকত এবং অহংকারকে কাছে আসতে দিত না, সে কেন আজ ধরাশায়ী হল ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—রাজকুমার সহদেব মনে করতে তার মতো বিদ্বান কেউ নেই, সেই দোষের জন্যই আজ তার পতন হল।

দ্রৌপদী ও সহদেবের পতন দেখে ভ্রাতৃপ্রেমিক শূরবীর নকুল শোকে ব্যাকুল হয়ে পড়ে গেলেন। তাই দেখে ভীম পুনরায় রাজাকে প্রশ্ন করলেন—'ভ্রাতা ! জগতে যার রূপের সমকক্ষ কেউ ছিল না, যে কখনো ধর্মে কোনো ত্রুটি করেনি এবং সর্বদা আমাদের আদেশ পালন করত, আমাদের সেই প্রিয় ভ্রাতা নকুলের কেন পতন হল ?' ভীমসেনের জিজ্ঞাসার উত্তরে যুধিষ্ঠির নকুলের সম্পর্কে বললেন—'ভীম ! নকুল সর্বদা ভাবত তার মতো রূপবান কেউ নেই, তার মনে সবসময় এই কথা থাকত। তাই আজ তার পতন হল। তাদের তিনজনকে পড়ে যেতে দেখে অর্জুন অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হলেন এবং তিনিও অনুতপ্ত হয়ে পড়ে গেলেন। দুর্ধর্ষ বীর অর্জুনকে পড়তে এবং মরণাপন্ন হতে দেখে ভীম পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন—'ভ্রাতা ! মহাত্মা অর্জুন কখনো পরিহাস করেও মিথ্যা বলেছে, একথা আমার মনে পড়ে না ; তাহলে এ কোন্ কর্মের ফল, যার জন্য তারও পতন হল ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—অর্জুনের নিজের বীরত্বের অহংকার ছিল। সে বলেছিল যে 'আমি একদিনেই শত্রুদের ভস্ম করে ফেলব' কিন্তু তা করেনি। তাই আজ ওকে ধরাশায়ী হতে হল। শুধু তাই নয়, সে সমস্ত ধনুর্ধরদেরও অপমান করেছিল (যার ফল তাকে পেতে হচ্ছে) ; তাই নিজের কল্যাণকামী ব্যক্তিদের এরূপ করা উচিত নয়।

এই বলে যুধিষ্ঠির এগিয়ে চললেন। তারপরেই ভীমসেনেরও পতন হল। পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ডেকে বললেন—'রাজন্ ! আমাকে একটু দেখুন। আমি আপনার প্রিয় ভীমসেন, ধরাশায়ী। আপনি যদি আমার পতনের কারণ জানেন, তাহলে বলুন।'

যুধিষ্ঠির বললেন—ভীম ! তুমি অত্যধিক আহার করতে এবং অন্যদের ছোট করে নিজের শক্তির অহংকার করতে ; সেইজন্যই তোমার পতন হল।

এই কথা বলে মহাবাহু যুধিষ্ঠির তাঁর দিকে না তাকিয়েই এগিয়ে চললেন। শুধু একটি কুকুর সর্বক্ষণ তাঁকে অনুসরণ করছিল।

যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্র ও ধর্মের সঙ্গে কথাবার্তা এবং সশরীরে স্বর্গারোহণ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় তখন আকাশ ও পৃথিবীতে তুমুল শব্দের ধ্বনি তুলে দেবরাজ ইন্দ্র রথ নিয়ে সেখানে হাজির হলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'কুন্তীনন্দন ! তুমি এই রথে আরোহণ করো।' যুধিষ্ঠির তখন তাঁর পড়ে যাওয়া ভ্রাতাদের দিকে তাকিয়ে শোকসন্তপ্ত হয়ে ইন্দ্রকে বললেন—'দেবেশ্বর ! আমার ভ্রাতারা পথে পড়ে রয়েছে। এরাও যাতে আমার সঙ্গে যায়, সেই ব্যবস্থা করুন ; আমি এদের ছেড়ে স্বর্গেও যেতে চাই না। রাজকুমারী দ্রৌপদী অত্যন্ত কোমল, তাঁকেও আমাদের সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করুন।'

ইন্দ্র বললেন—ভরতশ্রেষ্ঠ ! তোমার ভ্রাতারা তোমার আগেই স্বর্গে গিয়েছে ; দ্রৌপদীও তাদের সঙ্গে আছে। ওখানে গেলে সকলের সঙ্গেই তোমার সাক্ষাৎ হবে। সুতরাং তাদের জন্য শোক কোরো না। তারা মনুষ্য দেহ ত্যাগ করে স্বর্গগমন করেছে ; কিন্তু তুমি এই দেহ ধারণ করেই স্বর্গে যেতে পারো।

যুধিষ্ঠির বললেন—দেবরাজ ! এই কুকুরটি আমার অত্যন্ত ভক্ত, সর্বদা সে আমার সঙ্গে রয়েছে ; সুতরাং একেও আমার সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করুন।

ইন্দ্র বললেন—রাজন্ ! তুমি অমরত্ব, আমার সমান ঐশ্বর্য, পূর্ণ লক্ষ্মী এবং অনেক বড় সিদ্ধি লাভ করেছ ; সেই সঙ্গে স্বর্গীয় সুখও লাভ করেছ। অতএব এই কুকুরটিকে পরিত্যাগ করে আমার সঙ্গে চলো। এতে কোনো নির্দয়তা নেই।

যুধিষ্ঠির বললেন—দেবেশ ! আর্য পুরুষের দ্বারা নিম্ন শ্রেণীর কাজ হওয়া কঠিন ; আমি এমন লক্ষ্মী কখনো লাভ করতে চাই না, যার জন্য ভক্তকে ত্যাগ করতে হয়।

ইন্দ্র বললেন—ধর্মরাজ ! কুকুরের জন্য স্বর্গলোকে কোনো স্থান নেই। তাদের যারা আশ্রয় দেয়, তারাও স্বর্গলোকে স্থান পায় না। তারা যে যজ্ঞ করে, রাক্ষস তার পুণ্য হরণ করে ; তাই ভেবে-চিন্তে কাজ করো। এই কুকুরটিকে ছেড়ে দাও এতে তোমার কোনো নিষ্ঠুর কাজ করা হবে না।

যুধিষ্ঠির বললেন—মহেন্দ্র ! ভক্তকে ত্যাগ করলে যে পাপ হয়, তার কোনোদিন শেষ হয় না, জগতে তা ব্রহ্মহত্যার সমান বলে মানা হয়। সুতরাং আমি নিজের সুখের জন্য কখনো কোনোভাবে এই কুকুরটিকে ত্যাগ করতে পারব না। যে ভয় পেয়েছে, ভক্ত, 'আমার অন্য কোনো আশ্রয় নেই'—এই বলে আর্তভাবে যে শরণ গ্রহণ করে, নিজেকে রক্ষা করতে অক্ষম, দুর্বল এবং নিজের প্রাণ রক্ষা করতে ইচ্ছুক, তেমন মানুষকে প্রাণ গেলেও আমি পরিত্যাগ করব না—এ আমার চিরকালের ব্রত।

ইন্দ্র বললেন—বীরবর ! মানুষ যা কিছু দান, স্বাধ্যায়, হোম ইত্যাদি পুণ্যকর্ম করে, তাতে যদি কুকুরের দৃষ্টি পড়ে তবে তার ফল ক্রোধবশ নামক রাক্ষস হরণ করে ; অতএব এই কুকুরটিকে ত্যাগ করো, তাহলে তুমি দেবলোক প্রাপ্ত হবে। তুমি ভ্রাতাদের এবং প্রিয় পত্নী দ্রৌপদীকে পরিত্যাগ করে তোমার পুণ্যকর্মের ফলস্বরূপ দেবলোক লাভ করেছ, তাহলে এই কুকুরকে কেন ছেড়ে দিচ্ছ না। সবকিছু ছেড়ে এখন কুকুরের মোহে আবদ্ধ হলে কেন ?

যুধিষ্ঠির বললেন—দেবরাজ ! জগতে একথা নিশ্চিত যে মৃতব্যক্তির সঙ্গে কারো মিলনও হয় না, বিরোধও নয়। দ্রৌপদী এবং আমার ভ্রাতাদের জীবিত করা আমার সাধ্যাতীত ; তাই তারা মারা যাওয়ায় আমি তাদের ত্যাগ করেছি, জীবিতাবস্থায় নয়। শরণাগতকে ভয় দেখানো, নারী হত্যা, ব্রাহ্মণের ধন হরণ এবং মিত্রের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা—এই চার অধর্ম একদিকে আর অন্যদিকে ভক্তকে পরিত্যাগ করা, আমার মনে হয় এই একটিই ওই চার অধর্মের সমান।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! (কুকুরের দেহ ধারণ করে আগত) ধর্মস্বরূপ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং তাঁর স্তুতি করে মধুর বাক্যে বললেন—"রাজেন্দ্র ! তুমি তোমার সদাচার, বুদ্ধি এবং সমস্ত প্রাণীর প্রতি দয়ার জন্য তোমার পিতার নাম উজ্জ্বল করেছ। পুত্র ! আমি আগে একবার দ্বৈতবনেও তোমার পরীক্ষা নিয়েছিলাম, যখন তোমার সকল ভ্রাতাই জল আনতে গিয়ে মারা পড়েছিল। সেই সময় তুমি কুন্তী ও মাদ্রী—উভয় মাতার মধ্যে সমানভাব রেখে নিজ সহোদর ভাই ভীম ও অর্জুনের প্রাণ না চেয়ে শুধু নকুলকে বাঁচাতে চেয়েছিলে। এখনও 'এই কুকুরটি আমার ভক্ত' মনে করে তুমি দেবরাজ ইন্দ্রের রথও পরিত্যাগ করেছ। অতএব স্বর্গলোকে তোমার সমকক্ষ কেউ নেই। তাই তুমি তোমার এই দেহেই অক্ষয়লোক প্রাপ্ত হয়েছ, তুমি পরম উত্তম দিব্য গতি লাভ করেছ।"

এই কথা বলে ধর্ম, ইন্দ্র, মরুদ্‌গণ, অশ্বিনীকুমার, দেবতা এবং দেবর্ষিগণ পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে রথে বসিয়ে নিজ নিজ বিমানে আরোহণ করে স্বর্গলোকে রওনা হলেন। তাঁরা সকলেই নিজ ইচ্ছানুসারে বিচরণকারী, রজোগুণশূন্য, পুণ্যাত্মা, পবিত্র বাণীযুক্ত, বুদ্ধিসম্পন্ন এবং সিদ্ধ ছিলেন। ইন্দ্রের রথে বসে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর তেজে পৃথিবী এবং আকাশকে দেদীপ্যমান করে অত্যন্ত বেগে ওপর দিকে যেতে লাগলেন। সেইসময় সমস্ত লোকের বৃত্তান্ত জানা, বচনকুশল, মহাতপস্বী নারদ দেবমণ্ডলে অবস্থান করে উচ্চৈঃস্বরে বললেন—'যত রাজর্ষি এই স্বর্গে এসেছেন, তাঁরা সকলেই এখানে উপস্থিত, কিন্তু কুরুরাজ যুধিষ্ঠির নিজ সুযশে তাঁদের সমস্ত কীর্তি আচ্ছাদিত করে বিরাজমান হয়েছেন। নিজ যশ, তেজ এবং সদাচাররূপ সম্পদে ত্রিলোক আবৃত করে নিজ ভৌতিক শরীরে স্বর্গলোকে আসার সৌভাগ্য পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির ব্যতীত আর কেউ প্রাপ্ত হয়েছেন—একথা আমি কখনো শুনিনি। যুধিষ্ঠির ! পৃথিবীতে থাকার সময় তুমি আকাশে নক্ষত্র ও তারারূপে যত জ্যোতি দেখেছ, সেগুলিই এই দেবতাদের হাজার হাজার লোক ; তাদের দিকে তাকাও।'

নারদের কথা শুনে ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির দেবগণ ও নিজ পক্ষের রাজাদের অনুমতি নিয়ে বললেন—'আমার ভ্রাতারা ভালো-মন্দ যে স্থান লাভ করেছে, আমিও সেই স্থান লাভ করতে চাই। তাদের ছাড়া, অন্য কোনো লোকে যাওয়ার আমার ইচ্ছা নেই।' তাঁর কথা শুনে ইন্দ্র কোমল স্বরে বললেন—'মহারাজ ! তুমি নিজ শুভ কর্মদ্বারা প্রাপ্ত এই স্বর্গলোকে নিবাস করো। মনুষ্যলোকের স্নেহপাশকে কেন এখনও টেনে আনছ ? তুমি এমন উত্তম সিদ্ধিলাভ করেছ যা অন্যের পক্ষে দুর্লভ। তোমার ভ্রাতারা সেই স্থান লাভ করতে পারেনি। এখনও মনুষ্যলোকের চিন্তা তোমার সঙ্গ ছাড়েনি ? এটি স্বর্গলোক ; স্বর্গবাসী দেবর্ষি এবং সিদ্ধদের দিকে দৃষ্টি দাও।'

দেবেন্দ্রের এরূপ কথা শুনে যুধিষ্ঠির আবার বললেন—'দেবরাজ ! আমার ভ্রাতাদের ছাড়া এখানে থাকার ইচ্ছা আমার নেই। আমার ভ্রাতারা যেখানে গেছে, যেখানে সত্ত্বগুণসম্পন্না দ্রৌপদী বিরাজমান, সেখানেই আমি যেতে চাই।'

॥ মহাপ্রাস্থানিকপর্ব সমাপ্ত ॥

স্বর্গারোহণপর্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর সখা অর্জুন, তাঁর লীলা প্রকাশকারিণী ভগবতী সরস্বতী এবং তাঁর প্রবক্তা ভগবান ব্যাসকে নমস্কার করে অধর্ম ও অশুভ শক্তির পরাভবকারী চিত্তশুদ্ধিকারী মহাভারত গ্রন্থের পাঠ করা উচিত।

স্বর্গে নারদ ও যুধিষ্ঠিরের কথাবার্তা এবং যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শন

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর ! আমার প্রপিতামহ পাণ্ডবগণ যখন স্বর্গে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন তাঁদের এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের কোন্ কোন্ স্থান প্রাপ্তি হল ?

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! তোমার প্রপিতামহ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বর্গে গিয়ে দেখলেন যে দুর্যোধন স্বর্গীয় শোভাসম্পন্ন হয়ে দেবতা ও সাধ্যগণের সঙ্গে এক দিব্য সিংহাসনে বসে সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হয়ে শোভা পাচ্ছেন। তাঁর সেই ঐশ্বর্য দেখে যুধিষ্ঠির সহসা পেছন ফিরে উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগলেন—'দেবগণ ! যার জন্য আমরা আমাদের সমস্ত সুহৃদ এবং বন্ধুদের সংহার করেছি, যার প্রেরণায় নিত্য ধর্মাচরণকারিণী আমাদের পত্নী পাঞ্চাল-রাজকুমারী দ্রৌপদীকে পূর্ণ সভাগৃহে গুরুজনদের সামনে টেনে আনা হয়েছিল, সেই দুর্যোধনের সঙ্গে এই স্বর্গলোকে আমি থাকতে চাই না।' তাঁর কথা শুনে দেবর্ষি নারদ হেসে উঠলেন, তিনি বললেন—'বীরবর ! স্বর্গে আসার পর মৃত্যুলোকের শত্রুতা-বিবাদ থাকে না, সুতরাং মহারাজ দুর্যোধনের বিষয়ে তোমার এরূপ বলা কখনো উচিত নয়। স্বর্গলোকে যত বিশিষ্ট রাজা আছেন, তাঁরা এবং সমস্ত দেবতাও এখানে রাজা দুর্যোধনকে বিশেষ সম্মান করেন। একথা সত্য যে ইনি সর্বদাই তোমাদের কষ্টপ্রদান করেছেন কিন্তু যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করায় ইনি বীরলোক প্রাপ্ত হয়েছেন। অতএব এঁর দ্বারা দ্রৌপদী যে ক্লেশ প্রাপ্ত হয়েছে, তা ভুলে এঁর সঙ্গে ন্যায়পূর্বক ব্যবহার করো। এ হল স্বর্গলোক, এখানে এলে পূর্বের শত্রুতা থাকে না।'

নারদের কথা শুনে রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—

'ব্রহ্মন্ ! যারা মহান ব্রতধারী, মহাত্মা, সত্যপ্রতিজ্ঞ, বিশ্ববিখ্যাত বীর এবং সত্যবাদী ছিল, আমার সেই ভ্রাতারা কোন্ লোক প্রাপ্ত হয়েছে ? তাদের আমি দেখতে চাই। সত্যে দৃঢ় থাকা কুন্তীপুত্র কর্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্রদেরও আমি দেখতে আকাঙ্ক্ষা করি। এরা ছাড়া যেসব রাজা ক্ষত্রিয় ধর্ম অনুসারে যুদ্ধে অস্ত্রাঘাতে মারা গেছে, তারা এখন কোথায় ? তাদের তো এখানে দেখতে পাচ্ছি না ! রাজা বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, পাঞ্চাল রাজকুমার শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র এবং দুর্ধর্ষ বীর অভিমন্যুর সঙ্গেও আমি সাক্ষাৎ করতে চাই।'

পুনরায় যুধিষ্ঠির দেবতাদের বললেন—"দেবগণ ! এখানে যুধামন্যু এবং উত্তমৌজা—এই দুই ভ্রাতাকে কেন দেখতে পাচ্ছি না ? যেসব মহারথী রাজাগণ ও রাজকুমারগণ সমরাগ্নিতে নিজেদের আহুতি দিয়েছেন, যাঁরা আমার জন্য যুদ্ধে নিহত হয়েছেন, সেই সিংহের ন্যায় পরাক্রমী বীরেরা কোথায় ? তাঁরাও কি এই লোকে অধিকার লাভ করেছেন ? সেইসব মহারথীও যদি এখানে এসে থাকেন, তাহলে আমি সেই মহাত্মাদের সঙ্গে এখানে থাকব ; কিন্তু তাঁরা যদি এই শুভ এবং অক্ষয় লোক লাভ না করে থাকেন, তাহলে আমি আমার ভ্রাতা-বন্ধু-আত্মীয়দের ছাড়া এখানে সুখে থাকতে পারব না। যুদ্ধের পর আমি যখন আমার মৃত আত্মীয়দের জলাঞ্জলি দিচ্ছিলাম, তখন আমার মাতা কুন্তী আমাকে বলেছিলেন—'পুত্র ! কর্ণের জন্যও জলাঞ্জলি প্রদান করো।' মায়ের কথা শুনে যখন আমি বুঝতে পারি যে মহাত্মা কর্ণ আমারই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, তখন থেকে আমার মনে বড়ই দুঃখ হয়। এইকথা ভেবে আমার আরও অনুতাপ হয় যে মহামনা কর্ণের দুটি চরণ আমার মাতা কুন্তীর মতো দেখেও আমি কেন তাঁর অনুগামী হইনি। কর্ণ যদি আমাদের সঙ্গে থাকতেন, তাহলে ইন্দ্রও যুদ্ধে আমাদের পরাস্ত করতে পারতেন না। সেই সূর্যনন্দন কর্ণ যেখানেই থাকুন, আমি তাঁর দর্শনলাভ করতে চাই। আমার প্রাণের থেকে প্রিয় ভীমসেন, অর্জুন, নকুল, সহদেব এবং ধর্মপরায়ণা দ্রৌপদীকেও দেখতে চাই। এখানে থাকার আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই। আমি আপনাদের সত্যকথাই জানাচ্ছি। ভ্রাতাদের থেকে পৃথক হয়ে আমার স্বর্গ হতে কী পাওয়ার আছে ? যেখানে আমার ভ্রাতারা আছে, সেখানেই আমার স্বর্গ। এই লোককে আমি স্বর্গ বলে মনে করি না।"

দেবতারা বললেন—রাজন্ ! ভ্রাতাদের প্রতি যদি তোমার এতোই প্রীতি, তাহলে চলো, বিলম্ব কোরো না। আমরা দেবরাজের নির্দেশে সর্বভাবে তোমার ইচ্ছা পূরণ করতে চাই।

এই কথা বলে দেবতারা দেবদূতকে নির্দেশ দিলেন—'তুমি যুধিষ্ঠিরকে এঁর সুহৃদদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাও।' এরপর রাজা যুধিষ্ঠির এবং দেবদূত দুজনে একসঙ্গে সেই স্থানে চললেন, যেখানে পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমসেন প্রমুখ ছিলেন। আগে আগে দেবদূত ও তাঁর পেছনে যুধিষ্ঠির যাচ্ছিলেন। তাঁরা দুজনে এমন এক পথে এলেন, যা অত্যন্ত বন্ধুর ; তার ওপর দিয়ে চলাই মুশকিল। পাপাচারী ব্যক্তিরাই সেই পথে যাতায়াত করে। সেখানে সর্বত্র অন্ধকার ঘনিয়ে ছিল। চতুর্দিক থেকে দুর্গন্ধ আসছিল, এদিক-ওদিক পচা মৃতদেহ পড়ে ছিল। যেখানে সেখানে অস্থি-চুল ছড়িয়ে ছিল। কাক-

শকুন ঘুরে বেড়াচ্ছিল। নানা আকারের প্রেত চারদিকে ঘুরছিল। প্রেতেদের কারো দেহ থেকে রক্ত-মাংস বেরিয়েছিল, কারো হাত-পা বা মাথা ছিল না। ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে সেই পথ পার হয়ে এলেন। তিনি দেখলেন সেখানে ফুটন্ত জলের তীব্র স্রোতা নদী প্রবাহিত, তার অপর পারে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন। অপরদিকে তীক্ষ্ণ ক্ষুরার ন্যায় পাতাবহুল অসিপত্র নামক বন। কোথাও গরম বালি ছড়ানো, কোথাও তপ্ত লোহার বিশাল কড়াই রাখা রয়েছে। সবদিকে লোহার পাত্রে তেল ফোটানো হচ্ছে। যত্রতত্র তীক্ষ্ণ কাঁটায় ভরা সেমল বৃক্ষ,

যাতে হাত দেওয়া কঠিন। এই সব ব্যতীত সেই স্থানে পাপীদের যেমন কষ্ট দেওয়া হচ্ছিল, যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টি সেইদিকেও পড়ল। সেখানকার দুর্গন্ধে বিরক্ত হয়ে তিনি দেবদূতকে জিজ্ঞাসা করলেন—'সুধী ! এমন পথ দিয়ে আমাদের আর কতদূর যেতে হবে ? আমার ভ্রাতারা কোথায় ?'

ধর্মরাজের কথা শুনে দেবদূত ঘুরে দাঁড়ালেন এবং বললেন—''পথ চলা সমাপ্ত, এই পর্যন্তই আপনার আসবার ছিল। মহারাজ ! দেবতারা আমাকে বলেছিলেন যে 'যুধিষ্ঠির যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বেন, তখন তাঁকে ফিরিয়ে আনবে।' সুতরাং এখন আমি আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আপনি যদি ক্লান্ত হয়ে থাকেন, তাহলে আমার সঙ্গে আসুন।'' যুধিষ্ঠির সেই দুর্গন্ধে অবশ হয়ে যাচ্ছিলেন, তাই ভীত হয়ে ফেরবার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি যখনই সেই স্থান থেকে ফিরতে উদ্যত হলেন, তখনই তাঁর কানে চারদিক থেকে দুঃখী জীবদের ডাক শোনা গেল—'ধর্মনন্দন ! আপনি আমাদের ওপর কৃপা করে এখানে একটু দাঁড়ান। আপনি আসতেই পরম পবিত্র সুগন্ধ হাওয়া প্রবাহিত হয়েছে, তাতে আমরা খুব তৃপ্তি পেয়েছি। কুন্তীনন্দন ! বহু দিন পরে আজ আপনার দর্শন পেয়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেছি ; সুতরাং আরও কিছুক্ষণ দাঁড়ান। আপনি থাকলে এখানকার কষ্ট আমাদের বেদনা দেয় না।' এইভাবে সেই কষ্ট পাওয়া দুঃখী জীবদের নানাপ্রকার আর্তবাক্য শুনে রাজা যুধিষ্ঠিরের অত্যন্ত দয়া হল। তিনি সহসা বলে ফেললেন—'ওঃ বেচারাদের বড় কষ্ট।' বলে তিনি সেখানেই দাঁড়িয়ে গেলেন। আবার আগের মতো দুঃখী জীবদের আর্তনাদ শুনতে লাগলেন ; কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন না একথা কে বলছে। যখন কিছুতেই তিনি তাদের পরিচয় জানতে পারলেন না তখন তিনি সেই দুঃখী জীবদের সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনারা কে আর এখানে কেন থাকেন ?' তার জিজ্ঞাসায় চারদিক থেকে উত্তর আসতে লাগল—'আমি কর্ণ', 'আমি ভীমসেন', 'আমি অর্জুন', 'আমি নকুল', 'আমি সহদেব', 'আমি ধৃষ্টদ্যুম্ন', 'আমি দ্রৌপদী' এবং 'আমরা দ্রৌপদীর পুত্র'। এইভাবে সকলে নিজ নিজ নাম বলে বিলাপ করতে লাগল। এই সব শুনে রাজা যুধিষ্ঠির মনে মনে ভাবতে লাগলেন—'দৈবের এ কেমন বিধান ?' আমার মহাত্মা ভ্রাতা ভীমসেন, কর্ণ, দ্রৌপদীর পুত্রেরা, অন্য ভ্রাতারা এবং দ্রৌপদী এমন কী পাপ করেছে যে তাদের এই দুর্গন্ধপূর্ণ ভয়ানক স্থানে থাকতে হচ্ছে ? তারা সকলেই পুণ্যাত্মা ছিল। আমি যতদূর জানি, তারা কোনো পাপ করেনি ; তাহলে কোন্ কর্মের ফলে তারা এই নরকে পড়ে আছে ? আমার ভ্রাতারা সমস্ত ধর্মের জ্ঞাতা, শূরবীর, সত্যবাদী এবং শাস্ত্রের অনুগামী। তারা ক্ষত্রিয় ধর্মে তৎপর থেকে বড় বড় যজ্ঞ করেছে এবং বহু দক্ষিণা প্রদান করেছে। তবুও কেন তাদের এই দুর্গতি হল ? আমি ঘুমিয়ে আছি, না জেগে ? আমার চেতনা আছে, না নেই ? এ আমার চিত্ত বিকার অথবা ভ্রম নয় তো ?'

এইরূপ নানা কথা ভাবতে ভাবতে রাজা যুধিষ্ঠির দেবদূতকে বললেন—''তুমি যাঁর দূত, তাঁর কাছে ফিরে যাও ; আমি সেখানে যাবো না। তোমার প্রভুকে গিয়ে বলো—যুধিষ্ঠির ওখানেই থাকবে।'' আমি এখানে থাকলে আমার ভাই-বন্ধুরা একটু শান্তি পাবে। যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে দেবদূত দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে ফিরে গেলেন এবং যুধিষ্ঠির যা বলেছিলেন এবং যা করতে চাইছিলেন, সবই দেবরাজকে নিবেদন করলেন।

ইন্দ্র ও ধর্মের যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা প্রদান এবং পার্থিব শরীর ত্যাগ করে যুধিষ্ঠিরের দিব্যলোকে গমন

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সেখানে দাঁড়াবার পর এক মুহূর্ত না যেতেই ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতা সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। সাক্ষাৎ ধর্মও দেহধারণ করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। সেই তেজঃপূর্ণ দেবতারা আসতেই সেখানকার সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে গেল। পাপীদের কষ্ট পাওয়ার দৃশ্য দেখা গেল না। শীতল মৃদুগতি সুগন্ধবায়ু প্রবাহিত হতে লাগল। ইন্দ্রসহ মরুদ্‌গণ, বসু, অশ্বিনীকুমার, সাধ্য, রুদ্র, আদিত্য এবং অন্যান্য স্বর্গবাসী দেবতা সিদ্ধ এবং মহর্ষিগণ মহাতেজস্বী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে সমবেত হলেন। ইন্দ্র তখন

যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—'মহারাজ ! এতক্ষণ যা হয়েছে, তা হয়েছে, এখন আর এতে কষ্ট পাওয়ার প্রয়োজন নেই। এসো, আমার সঙ্গে চলো। তুমি পরম সিদ্ধিলাভ করেছ, সেই সঙ্গে অক্ষয়লোকও প্রাপ্ত হয়েছ। তোমাকে যে নরকদর্শন করতে হল, তার জন্য দুঃখ কোরো না। মানুষ নিজের জীবনে শুভ এবং অশুভ—দু-প্রকার কর্মরাশি সঞ্চিত করে। যে প্রথমে শুভকর্মের ফল ভোগ করে, তাকে পরে নরক ভোগ করতে হয় আর যে আগে নরকের কষ্ট সহ্য করে, সে পরে স্বর্গসুখ অনুভব করে। যার পাপকর্ম বেশি এবং পুণ্য অল্প, সে প্রথমে স্বর্গসুখ ভোগ করে (এবং যে পুণ্য অধিক এবং পাপ কম করে, সে প্রথমে নরক ভোগ করে পরে স্বর্গের আনন্দ লাভ করে)। সেই নিয়মানুসারে তোমার মঙ্গলের কথা চিন্তা করে আমি আগে তোমাকে নরক দর্শন করিয়েছি। তুমি অশ্বত্থামার মৃত্যুর কথা বলে ছলনা করে দ্রোণাচার্যকে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ বিশ্বাস করিয়েছিলে, তাই তোমাকেও ছলনা করে নরক দর্শন করানো হয়েছে। তোমার পক্ষের যত রাজা যুদ্ধে নিহত হয়েছে, তারা সকলেই স্বর্গলোকে পৌঁছে গেছে। মহান ধনুর্ধর ও শ্রেষ্ঠ শস্ত্রধারী কর্ণ, যার জন্য তুমি সর্বদা দুঃখিত হয়ে থাকো, সে-ও উত্তম সিদ্ধি লাভ করেছে। তোমার অন্য ভ্রাতারা এবং পাণ্ডবপক্ষের অন্য রাজারাও নিজ নিজ যোগ্য স্থান প্রাপ্ত করেছে। আমার সঙ্গে গিয়ে তাদের সকলকে দেখো এবং মানসিক চিন্তা পরিত্যাগ করে আমার সঙ্গে স্বর্গে বিহার করো। তোমার কৃত পুণ্যকর্ম ও তপ-দানের ফল ভোগ করো। রাজসূয়যজ্ঞে জয় করা সমৃদ্ধিশালী লোক স্বীকার করো এবং তপস্যার মহান ফল ভোগ করো। যুধিষ্ঠির ! তোমার প্রাপ্ত সম্পূর্ণ লোক রাজা হরিশ্চন্দ্রের লোকের ন্যায় সমস্ত রাজাদের লোকের থেকে উচ্চে, সেখানেই তুমি অবস্থান করবে। রাজর্ষি মান্ধাতা, রাজা ভগীরথ, দুষ্মন্তকুমার ভরত যেখানে গিয়েছেন, সেই লোকে নিবাস করে তুমিও দিব্যসুখ ভোগ করবে। মহারাজ ! দেখো, ত্রিভুবন পবিত্রকারিণী দেবনদী মন্দাকিনী সামনেই দেখা যাচ্ছে ; তার পবিত্র জলে স্নান করে তুমি দিব্যলোকে যেতে পারবে। ওই জলে ডুব দিলেই তোমার মানব-স্বভাব দূর হবে ; তোমার মনের শোক-সন্তাপ, গ্লানি এবং শত্রুতা ইত্যাদি সকল দোষ অপসৃত হবে।'

দেবরাজের কথা শেষ হলে শরীর ধারণ করে আসা সাক্ষাৎ ধর্ম বললেন—'পুত্র ! তোমার ধর্মবিষয়ক অনুরাগ, সত্যভাষণ, ক্ষমা এবং ইন্দ্রিয়সংযম ইত্যাদি গুণাবলির জন্য আমি তোমার ওপর অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। আমার দ্বারা এ তোমার তৃতীয় পরীক্ষা। কোনো যুক্তিতে আমরা কেউই তোমাকে তোমার স্বভাব থেকে বিচলিত করতে পারিনি। দ্বৈতবনে অরণীকাষ্ঠ অপহরণের পর যখন যক্ষরূপে তোমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম, সেটি তোমার প্রথম পরীক্ষা ছিল ; তাতে তুমি ভালোভাবেই উত্তীর্ণ হয়েছিলে। তারপর দ্রৌপদীসহ তোমার সব ভ্রাতাদের মৃত্যু হলে কুকুরের রূপ ধারণ করে তোমাকে আমি দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করেছিলাম। তাতেও তুমি সাফল্য লাভ করেছ। এটি তোমার তৃতীয় পরীক্ষা ছিল ; এইবারও তুমি সুখের আশা না করে ভ্রাতাদের হিতের জন্য নরকেই থাকতে চেয়েছিলে ; সুতরাং তুমি সর্বভাবে শুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়েছ। তোমার মধ্যে পাপের নামও নেই, অতএব তুমি স্বর্গের সুখ উপভোগ করো। তোমার ভ্রাতারা নরকের যোগ্য নয়। তুমি যে তোমার ভ্রাতাদের নরকভোগ করতে দেখেছ, তা দেবরাজ ইন্দ্রের সৃষ্টি করা মায়া। অর্জুন, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, সত্যবাদী শূরবীর কর্ণ এবং রাজকুমারী দ্রৌপদী—এরা কেউই নরকে যাওয়ার যোগ্য নয়। ভরতশ্রেষ্ঠ ! এসো, আমার সঙ্গে গিয়ে ত্রিলোকগামিনী গঙ্গাদেবীকে দর্শন করবে।'

জনমেজয় ! ধর্মের কথা শুনে তোমার প্রপিতামহ রাজর্ষি যুধিষ্ঠির ধর্ম এবং সমস্ত স্বর্গবাসী দেবতাদের সঙ্গে গিয়ে মুনিজনবন্দিত পরম পবিত্র দেবনদী গঙ্গাতে স্নান করলেন। স্নান করতেই তাঁর মানবদেহ পরিত্যক্ত হয়ে দেহ দিব্য হল। তাঁর হৃদয়ের শোক-দুঃখ, শত্রুতা সব দূর হল। তারপর তিনি দেবতা পরিবেষ্টিত হয়ে মহর্ষিদের স্তুতি শুনতে শুনতে ধর্মের সঙ্গে সেই স্থানে এলেন, যেখানে তাঁর চার পাণ্ডব ভ্রাতা এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা ক্রোধ পরিত্যাগ করে স্বর্গীয় আনন্দে বসবাস করছিলেন।

দিব্যলোকে যুধিষ্ঠিরের শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্যদের দর্শন লাভ, ভীষ্মাদির মূল স্বরূপে মিলন এবং মহাভারতের উপসংহার ও মাহাত্ম্য

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! দেবতা, ঋষি ও মরুদ্‌গণের মুখে নিজ প্রশংসা শুনতে শুনতে রাজা যুধিষ্ঠির ক্রমশ যেস্থানে কুরুশ্রেষ্ঠরা বিরাজ করছিলেন সেখানে (ভগবানের সেই পরমধামে) পৌঁছলেন। সেখানে গিয়ে যুধিষ্ঠির দেখলেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ব্রাহ্মবিগ্রহ ধারণ করে বিরাজমান। তাঁর স্বরূপ পূর্ব রূপেরই মতো, তাই পূর্বে দেখা রূপ হওয়ায় যুধিষ্ঠির অনায়াসেই তাঁকে চিনতে পারলেন, তাঁর শ্রীবিগ্রহ থেকে দিব্যজ্যোতি স্ফূরিত হচ্ছিল। চক্র ইত্যাদি দিব্যাস্ত্র দেবতাদের ন্যায় রূপ ধারণ করে তাঁর সেবায় উপস্থিত। তেজস্বী বীর অর্জুন ভগবানের আরাধনায় ব্যাপৃত। দেবপূজিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে উপস্থিত হতে দেখে তাঁকে যথাবৎ সম্মান করলেন। এরপর অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করতে যুধিষ্ঠির শ্রেষ্ঠ শস্ত্রধারী কর্ণকে দ্বাদশ আদিত্যের ন্যায় তেজোময় স্বরূপ ধারণ করে বিরাজমান দেখলেন। অন্য স্থানে ভীমসেনকে দেখা গেল, তিনি আগের মতোই শরীর ধারণ করে মূর্তিমান বায়ু দেবতার পাশে বসেছিলেন। তাঁর চারপাশে মরুদ্‌গণকে দেখা যাচ্ছিল, তাঁদের দিব্যবিগ্রহ উত্তম কান্তিতে দেদীপ্যমান। তিনিও উত্তম সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। নকুল ও সহদেব অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে বসেছিলেন। দুই ভ্রাতাও তাঁদের দিব্য-তেজে দেদীপ্যমান দেখাচ্ছিলেন।

তখন দেবরাজ ইন্দ্র বললেন—'যুধিষ্ঠির ! এই যে কমনীয় বিগ্রহযুক্ত পবিত্র গন্ধসম্পন্ন দেবীকে দেখা যাচ্ছে, ইনি সাক্ষাৎ ভগবতী লক্ষ্মী। ইনিই তোমাদের জন্য মনুষ্য লোকে গিয়ে অযোনিসম্ভূতা দ্রৌপদীরূপে অবতীর্ণা হয়েছিলেন। স্বয়ং ভগবান শংকর তোমাদের প্রসন্নতার জন্য এঁকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং ইনি দ্রুপদকুলে জন্মধারণ করে তোমাদের সেবা করেছিলেন। এদিকে এই যে অগ্নির ন্যায় পঞ্চ তেজস্বী গন্ধর্বকে দেখা যাচ্ছে, এঁরা তোমাদের পঞ্চ ভ্রাতার ঔরসে উৎপন্ন হওয়া দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র। এই পরম বুদ্ধিমান গন্ধর্বরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে দর্শন করো, ইনি তোমার পিতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। ওই দেখো, তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণ সূর্যের সঙ্গে চলে যাচ্ছেন। ওদিকে বৃষ্ণি, অন্ধক এবং ভোজবংশের সাত্যকি প্রভৃতি এবং মহাবলী বীরদের দেখো ; তাঁরা সাধ্য, বিশ্বদেব এবং মরুদ্‌গণের মধ্যে বিরাজমান। যাকে যুদ্ধে কেউ পরাজিত করতে পারেনি, সেই মহান ধনুর্ধর সুভদ্রাকুমার অভিমন্যুকে দেখো। সে চন্দ্রের সঙ্গে চন্দ্রেরই ন্যায় কান্তিযুক্ত হয়ে বিরাজমান। অন্য দিকে দেখো কুন্তী ও মাদ্রীর সঙ্গে তোমার পিতা পাণ্ডু বসে আছেন। তিনি বিমানে করে সর্বদা আমার কাছে আসা-যাওয়া করেন। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম বসুদের সঙ্গে এবং তোমাদের গুরু দ্রোণাচার্য বৃহস্পতির কাছে বসে আছেন—এঁদের দুজনকে দর্শন করো। তোমার পক্ষের অন্যান্য রাজারা গন্ধর্ব, যক্ষ এবং পুণ্যজনের সঙ্গে যাচ্ছে। কেউ কেউ গুহ্যকদের লোক প্রাপ্ত হয়েছে। এরা সকলে যুদ্ধে শরীর ত্যাগ করে নিজ নিজ পবিত্র বাণী, বুদ্ধি এবং কর্মের দ্বারা স্বর্গলোকের অধিকার লাভ করেছে।'

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্মন্ ! ভীষ্ম, দ্রোণ, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, বিরাট, দ্রুপদ, শঙ্খ, উত্তর, ধৃষ্টকেতু ও শকুনি প্রমুখ এবং তেজস্বী শরীর ধারণকারী অন্যান্য রাজারা কত সময় স্বর্গলোকে একসঙ্গে ছিলেন ? সেখানে তাঁরা সকলে সনাতন স্থান লাভ করেছিলেন, না কী অন্য কোনো গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন ? আমি আপনার কাছ থেকে এই সব সবিস্তারে শুনতে চাই।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! এটি দেবতাদের গূঢ় রহস্য, তুমি প্রশ্ন করায় তোমাকে বলছি। যাঁর অগাধ বুদ্ধি, যিনি সমগ্র কর্মের গতি জানেন এবং সর্বজ্ঞ, সেই মহাব্রতধারী সনাতন মুনি পরাশরনন্দন ব্যাসদেব আমাকে বলেছিলেন যে এই সকল বীর অন্ততোগত্বা নিজ মূল স্বরূপেই মিলিত হন। মহাতেজস্বী ভীষ্ম বসুদেব স্বরূপে প্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন, তাই অষ্ট বসুর নাম সুপ্রসিদ্ধ। (নাহলে ভীষ্মকে নিয়ে নয়জন হয়ে যেতেন)। আচার্য দ্রোণ বৃহস্পতিতে প্রবেশ করেছিলেন, কৃতবর্মা মরুদ্‌গণের মধ্যে মিশে গিয়েছিলেন, প্রদ্যুম্ন যেমন এসেছিলেন, তেমনই সনৎকুমারের শরীরে প্রবেশ করেছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র কুবেরের দুর্লভ লোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যশস্বিনী গান্ধারী দেবীও তাঁর সঙ্গে গমন করেছিলেন। রাজা পাণ্ডু তাঁর দুই পত্নী সহ ইন্দ্রভবনে স্থান পেয়েছিলেন। বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, নিষঠ, অক্রূর, শাম্ব, ভানু, কম্পা, বিদুরথ, ভূরিশ্রবা, শল,

ভূরি, কংস, উগ্রসেন, বসুদেব, উত্তর এবং শঙ্খ—এরা বিশ্বদেবে মিলিত হয়েছেন। চন্দ্রের মহাতেজস্বী পুত্র বর্চাই নরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু নামে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি ক্ষত্রিয়ধর্ম অনুসারে এমন যুদ্ধ করেছিলেন, যার কোনো তুলনা নেই। সেই ধর্মাত্মা মহারথী অভিমন্যু তাঁর অবতারের কাজ সম্পূর্ণ করে চন্দ্রেতে প্রবিষ্ট হয়েছেন। কুরুশ্রেষ্ঠ কর্ণ সূর্যে, শকুনি দ্বাপরে, ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্নির স্বরূপে প্রবেশ করেন। ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত পুত্র মহাবলী যাতুধানের (রাক্ষসদের) সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। বিদুর এবং রাজা যুধিষ্ঠির ধর্মের সাযুজ্য প্রাপ্ত করেছিলেন। যিনি ব্রহ্মার অনুরোধে নিজ যোগশক্তির আশ্রয় নিয়ে এই পৃথিবী ধারণ করে থাকেন, সেই ভগবান অনন্ত (বলরাম) রসাতলে চলে গিয়েছিলেন। যিনি সনাতন দেবাধিদেব নারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ, তাঁর অংশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অবতারের প্রয়োজন পূর্ণ করে তিনি তাঁর মূল স্বরূপে স্থিত হয়ে যান। শ্রীকৃষ্ণের ষোলো হাজার পত্নী সময়মতো সরস্বতী নদীতে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করে অপ্সরারূপে ভগবানের সেবায় উপস্থিত হন। এইভাবে মহাভারতের যুদ্ধে মৃত বীর-মহারথী নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে দেবতা ও যক্ষদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। কেউ ইন্দ্রভবনে পৌঁছেছিলেন, কেউ কুবেরের। কত মহাপুরুষ বরুণলোক লাভ করেছিলেন। জনমেজয় ! আমি তোমাকে কৌরব ও পাণ্ডবদের সমস্ত চরিত্র বিস্তারিতভাবে শোনালাম।

সৌতি বললেন—দ্বিজবরগণ ! মহারাজ জনমেজয় তাঁর যজ্ঞে বৈশম্পায়নের মুখে এইরূপ মহাভারতের ইতিহাস শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তারপর যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞের বাকি কার্য সম্পূর্ণ করে যজ্ঞ সমাপ্ত করলেন। সর্পদের সংকট থেকে রক্ষা করে আস্তীক মুনিও অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। রাজা যজ্ঞ কর্মে আসা সমস্ত ব্রাহ্মণদের পর্যাপ্ত দক্ষিণা দিয়ে সন্তুষ্ট করলেন এবং ব্রাহ্মণেরাও রাজার কাছে যথোচিত সম্মান লাভ করে হৃষ্ট চিত্তে নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেলেন। তাঁদের বিদায় জানিয়ে রাজাও তক্ষশিলা থেকে হস্তিনাপুরে রওনা হলেন। জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে ব্যাসদেবের নির্দেশে মুনিবর বৈশম্পায়ন যে ইতিহাস বলেছিলেন, আমি তা আপনাদের কাছে বর্ণনা করলাম। এই পুণ্যময় ইতিহাস অত্যন্ত পবিত্র এবং উত্তম। সত্যবাদী, সর্বজ্ঞ, বিধি-বিধানের জ্ঞাতা, ধর্মজ্ঞ, সাধু, ইন্দ্রিয় সংযমী, শুদ্ধ, তপ-প্রভাবে পবিত্র অন্তঃকরণসম্পন্ন, সাংখ্য ও যোগের বিদ্বান এবং নানাশাস্ত্রে পারদর্শী মুনিবর ব্যাসদেব দিব্য দৃষ্টিতে সবকিছু দেখে মহাত্মা পাণ্ডব এবং অন্য তেজস্বী রাজাদের কীর্তি প্রসারিত করার জন্য এই ইতিহাস রচনা করেছেন। যে বিদ্বান প্রতিটি পর্বে এটি অপরকে পড়ে শোনায়, তার সমস্ত পাপ ধৌত হয়। সে স্বর্গের অধিকার এবং ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত করার যোগ্যতা লাভ করে। শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন দ্বারা বর্ণিত হওয়ায় এই উপাখ্যান 'কার্ষ্ণ বেদ' নামে প্রসিদ্ধ। যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে এই সম্পূর্ণ গ্রন্থ শ্রবণ করে, তার কোটি কোটি পাপ বিনাশ হয়। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকর্মে ব্রাহ্মণদের মহাভারতের সামান্য অংশও শোনায়, তার প্রদত্ত অন্ন-জল অক্ষয় হয়ে পিতৃপুরুষগণ লাভ করেন। মানুষ তাদের ইন্দ্রিয়াদি ও মনের দ্বারা সারাদিনে যে পাপ করে, সায়ংকালে সন্ধ্যার সময় মহাভারত পাঠ করলে সে সেই পাপ হতে মুক্তিলাভ করে এবং রাত্রিকালে যে পাপ তার দ্বারা হয়, প্রাতঃকালে উপসনাদির সময় মহাভারত পাঠ করলে তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে ভরত বংশীয়দের মহান জন্মকর্মের বর্ণনা আছে, তাই একে 'মহাভারত' বলা হয়। মহান এবং ভারী হওয়ার জন্যও এর নাম 'মহাভারত'। যে ব্যক্তি মহাভারতের ব্যুৎপত্তি জেনে যায়, সে সর্বপাপ হতে মুক্ত হয়। বেদবিদ্যার মহাসাগর এবং অষ্টাদশ পুরাণাদির নির্মাতা মহর্ষি বেদব্যাসের সিংহগর্জন শোনো। ইনি বলেন—'অষ্টাদশ পুরাণ, সমস্ত ধর্মশাস্ত্র এবং ষড়ঙ্গসহ চতুর্বেদ এক দিকে এবং অন্যদিকে শুধুমাত্র মহাভারত ; এটি একাই তাদের সমান।'

মুনিবর ভগবান শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন তিন বৎসরে সমস্ত মহাভারত পূর্ণ করেছিলেন। যে ব্যক্তি 'জয়' নামক এই মহাভারত ইতিহাস সর্বদা ভক্তিসহকারে শুনতে থাকে, সে শ্রী, কীর্তি ও বিদ্যালাভ করে। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের বিষয়ে মহাভারতে যা কিছু বলা হয়েছে, সে-সবই অন্যত্র উল্লিখিত আছে। যা এখানে নেই, তা কোথাওই নেই। মোক্ষলাভের ইচ্ছা রাখা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং গর্ভিণী নারীর এই 'জয়' নামক ইতিহাস শ্রবণ করা উচিত। মহাভারত শ্রবণ বা পাঠকারী মানুষ যদি স্বর্গলাভের ইচ্ছা করে, তাহলে সে স্বর্গলাভ করে এবং যুদ্ধে জয় লাভ করতে চাইলে জয়লাভ করে। তেমনই গর্ভিণী নারী মহাভারত শ্রবণ করলে সুযোগ্য পুত্র অথবা সৌভাগ্যশালিনী কন্যা লাভ করে। নিত্যমুক্ত স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ধর্মের কামনায় এই

ভারত-সন্দর্ভ রচনা করেছেন। প্রথমে তিনি ষাট লাখ শ্লোকের মহাভারত সংহিতা রচনা করেছিলেন ; তার মধ্যে ত্রিশ লাখ শ্লোকের সংহিতা দেবলোকে প্রচারিত হয়েছে, পনেরো লাখের দ্বিতীয় সংহিতা পিতৃলোকে প্রচারিত হয়েছে, চোদ্দ লাখ শ্লোকের তৃতীয় সংহিতা যক্ষলোকে সমাদৃত হয়েছে এবং এক লাখ শ্লোকের চতুর্থ সংহিতা মনুষ্যলোকে প্রতিষ্ঠিত। দেবতাদের দেবর্ষি নারদ, পিতৃগণকে অসিত-দেবল, যক্ষ এবং রাক্ষসদের শুকদেব এবং মানুষদের বৈশম্পায়নই প্রথমবার মহাভারত-সংহিতা শুনিয়েছেন। শৌনক ! যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নিয়ে গভীর অর্থপূর্ণ ও বেদের সমকক্ষ ব্যাসপ্রণীত এই পবিত্র গ্রন্থ শ্রবণ করে, সে ইহজগতে সমস্ত মনোবাঞ্ছিত ভোগ এবং উত্তম কীর্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরম সিদ্ধিও লাভ করে—এই বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যে ব্যক্তি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে মহাভারতের এক অংশও শোনে বা অপরকে শোনায়, সে সমগ্র মহাভারত অধ্যয়নের পুণ্যফল লাভ করে এবং সেই পুণ্যের প্রভাবে উত্তম সিদ্ধি লাভ করে। যে ভগবান ব্যাসদেব এই পবিত্র সংহিতা বর্ণনা করে নিজ পুত্র শুকদেবকে পাঠ করিয়েছিলেন, তিনি মহাভারতের সারভূত উপদেশের বর্ণনা এইভাবে করেছেন : 'মানুষ ইহজগতে হাজার হাজার মাতাপিতা এবং অসংখ্য স্ত্রী-পুত্রাদির সংযোগ-বিয়োগ অনুভব করেছে, করে এবং করতে থাকবে[১]। অজ্ঞান ব্যক্তি প্রত্যহ হাজার হাজার হর্ষ ও ভয়ের সম্মুখীন হয় ; কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তির মনে এগুলির কোনো প্রভাব পড়ে না[২]। আমি দু-হাত তুলে চিৎকার করে এই কথা বলছি, কিন্তু কেউ আমার কথা শোনে না। ধর্মের দ্বারা মোক্ষ তো সিদ্ধ হয়ই, অর্থ-কামও সিদ্ধ হয়, তবুও লোকে কেন তা সেবন করে না[৩]। কামনার জন্য, ভয়ের জন্য, লোভের জন্য অথবা প্রাণরক্ষার জন্যও ধর্ম পরিত্যাগ করবে না। ধর্ম নিত্য আর সুখ-দুঃখ অনিত্য। সেইরূপ জীবাত্মা নিত্য এবং তার বন্ধনের হেতু অনিত্য[৪]। মহাভারতের সারভূত এই উপদেশ ভারত-সাবিত্রী নামে প্রসিদ্ধ। যে ব্যক্তি প্রত্যহ প্রভাতে এটি পাঠ করে, সে সম্পূর্ণ মহাভারত অধ্যয়নের ফল লাভ করে পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করে[৫]। যেমন সমুদ্র এবং হিমালয় পর্বত উভয়কেই রত্নের নিধি মনে করা হয়, তেমনই মহাভারতকেও নানাপ্রকার উপদেশপূর্ণ রত্নের ভাণ্ডার বলা হয়। যে বিদ্বান শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন দ্বারা রচিত মহাভারতরূপ এই পঞ্চম বেদ শোনায়, তার অর্থপ্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে এই ভারত-উপাখ্যান পাঠ করে, সে মোক্ষরূপ পরম সিদ্ধি লাভ করে। এই বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই।

॥ স্বর্গারোহণপর্ব সমাপ্ত ॥

---

[১] মাতাপিতৃসহস্রাণি পুত্রদারশতানি চ। সংসারেঽনুভূতানি যান্তি যাস্যন্তি চাপরে॥

[২] হর্ষস্থানসহস্রাণি ভয়স্থানশতানি চ। দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পণ্ডিতম্॥

[৩] ঊর্ধ্ববাহুর্বিরৌম্যেষ ন চ কশ্চিচ্ছৃণোতি মে। ধর্মাদর্থশ্চ কামশ্চ স কিমর্থং ন সেব্যতে॥

[৪] ন ত্রাতু কাময়া ভয়ান্ন লোভাদ্ধর্মং ত্যজেজ্জীবিতস্যাপি হেতোঃ।
নিত্যো ধর্মঃ সুখদুঃখে ত্বনিত্যে জীবো নিত্যো হেতুরস্য ত্বনিত্যঃ॥

[৫] ইমাং ভারতসাবিত্রীং প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ। স ভারতফলং প্রাপ্য পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥

মহাভারত শ্রবণবিধি, মাহাত্ম্য, এবং তার ফল

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর ! বিদ্বানদের কোন্ নিয়মে মহাভারত শ্রবণ করা উচিত ? মহাভারত শুনলে কী ফললাভ হয় ? প্রত্যেক পর্ব সমাপ্তির পরে কী দান করা উচিত ? এই কথার বক্তা কেমন হওয়া প্রয়োজন ?

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! মহাভারত শোনার যে নিয়ম এবং তা শ্রবণে যে ফললাভ হয়, সেসব বলছি ; শোনো। মানুষের নিজ মন ও ইন্দ্রিয়াদি সংযম করে, পবিত্র হয়ে, যথোক্ত বিধি-নিয়ম অনুসারে এই ইতিহাস শোনা এবং ক্রমশ এর সমাপ্তি করা উচিত। যে ব্যক্তি অন্তর-বাহিরে পবিত্র, শীলসম্পন্ন, সদাচারী, শুদ্ধবস্ত্র ধারণকারী, জিতেন্দ্রিয়, সংস্কারসম্পন্ন, সমস্ত শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ, শ্রদ্ধাযুক্ত, দোষদৃষ্টিরহিত, সৌভাগ্যশালী, মনকে বশে রাখেন এবং সত্যবাদী, তাঁকে দান ও মানের দ্বারা অনুগৃহীত করে বাচক বা বক্তা করা উচিত। বক্তার অত্যন্ত থেমে থেমেও কথা বলা উচিত নয় এবং খুব তাড়াতাড়িও বলা উচিত নয়। শান্তভাবে ধীর গতিতে সুস্পষ্ট উচ্চারণসহ মহাভারতের কথা বলা উচিত। মিষ্ট স্বরে, ভাবার্থ বুঝে কথা পাঠ করবে। ৬৩ অক্ষরের পাঠকে আটটি স্থানে বিভক্ত করে স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করবে। কথা শোনানোর সময় বক্তার সুস্থ এবং একাগ্রচিত্ত হওয়া প্রয়োজন ; তার বসার আসন এমন হবে যাতে সে সুখপূর্বক বসতে পারে। অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর নিত্যসখা নরস্বরূপ নররত্ন অর্জুন, তাঁদের লীলা প্রকাশকারী ভগবতী সরস্বতী এবং বক্তা মহর্ষি বেদব্যাসকে নমস্কার করে আসুরী সম্পদের উপর বিজয়প্রাপ্তিপূর্বক অন্তঃকরণ শুদ্ধকারী মহাভারত গ্রন্থ পাঠ করা উচিত।

রাজন্ ! মহাভারতের কথা আরম্ভ হয়ে গেলে প্রত্যেক পর্বে ক্ষত্রিয়দের জাতি, সত্যতা, তাদের দেশ, মাহাত্ম্য এবং ধর্ম জেনে ব্রাহ্মণদের যেসব বস্তু দান করা উচিত, তার বর্ণনা করছি, শোনো। প্রথমে ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্বস্তিবাচন করিয়ে কথা-পাঠের কার্য আরম্ভ করাবে। পরে পর্ব সমাপ্ত হলে নিজ ক্ষমতা অনুসারে সেই ব্রাহ্মণদের পূজা করবে। আদিপর্বের কথার সময় বক্তাকে নতুন বস্ত্র পরিধান করিয়ে চন্দন ইত্যাদির দ্বারা তাঁর পূজা করবে এবং রীতি অনুসারে তাঁকে মিষ্ট পায়েস আহারের জন্য প্রদান করবে। তারপর আস্তীকপর্বের কথা হওয়ার সময় ব্রাহ্মণকে মধু ও ঘৃতযুক্ত পায়েস, মিষ্টান্ন ও ফল-মূল দিয়ে তুষ্ট করবে। সভাপর্ব আরম্ভ হওয়ার সময় মালপোয়া, কচুরি এবং মিঠাইয়ের সঙ্গে পায়েস ভোজন করাবে। বনপর্বে ফল-মূল দ্বারা ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করবে। অরণী পর্বে পৌঁছে জলপূর্ণ কলস দান করবে এবং যিনি আহার করতে ভালোবাসেন, তাঁকে উত্তম ফল-মূল এবং সর্বগুণসম্পন্ন আহার প্রদান করবে। বিরাটপর্বে নানাপ্রকার বস্ত্রপ্রদান করবে এবং উদ্যোগপর্বে ব্রাহ্মণদের চন্দন ও ফুলমালায় বিভূষিত করে উত্তম আহার পরিবেশন করবে। ভীষ্মপর্বে উত্তম যান ও উত্তম ভোজন পরিবেশন করবে। দ্রোণপর্বে ব্রাহ্মণদের উত্তম ভোজন করাবে। কর্ণপর্বেও ব্রাহ্মণদের সমস্ত কামনা পূর্ণ করার সঙ্গে সঙ্গে সুখাদ্য প্রদান করা উচিত। শল্যপর্বে নিজ মনকে একাগ্র করে মিষ্ট ভাত, মালপোয়া, তৃপ্তিদায়ক ফল এবং মিঠাই-এর সঙ্গে সর্বপ্রকার অন্ন দান করা উচিত। গদাপর্বে মুগমিশ্রিত অন্ন প্রদান করা উচিত। স্ত্রীপর্বে সৎব্রাহ্মণদের নানাপ্রকার রত্ন প্রদান করে সন্তুষ্ট করবে। ঐষীকপর্বে প্রথমে ঘৃতমিশ্রিত অন্ন পরিবেশন করবে, পরে সর্বপ্রকার গুণাদিযুক্ত, স্বাদিষ্ট অন্ন ভোজন করাবে। শান্তিপর্বে ব্রাহ্মণদের হবিষ্য প্রদান করবে। আশ্বমেধিক পর্বে পৌঁছালে সকলকে তাঁদের রুচি অনুযায়ী আহার প্রদান করবে এবং আশ্রমবাসিকপর্বে হবিষ্য ভোজন করাবে। মৌসলপর্বে সর্বগুণসম্পন্ন অন্ন, চন্দন, মালা এবং অনুলেপন প্রদান করবে। মহাপ্রস্থানিকপর্বেও তাই করবে। তারপর স্বর্গারোহণ পর্বে ব্রাহ্মণদের পায়েস প্রদান করবে।

এইভাবে সব পর্বের সংহিতাগুলি সমাপ্ত করে শাস্ত্রবেত্তা ব্যক্তিদের উচিত মহাভারত গ্রন্থটিকে রেশম বস্ত্রে জড়িয়ে কোনো উত্তম স্থানে রাখা। স্নানাদির দ্বারা পবিত্র হয়ে শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে, ফুলের মালা ও অলংকার ধারণ করে চন্দন-মালা ইত্যাদি উপচার দ্বারা গ্রন্থটিকে পূজা করবে। পূজার সময় চিত্ত একাগ্র করে এবং শুদ্ধভাবে থেকে নানাপ্রকার উত্তম ভোক্ষ্য, ভোজ্য, পেয় ও পুষ্পাদি সামগ্রী অর্পণ করে সুবর্ণময় দক্ষিণা প্রদান করা প্রয়োজন। পুস্তকের ওপর তিন পল করে সোনা রাখা উচিত। তা না পারলে অন্তত দেড় পল করে সোনা রাখবে, তাও সম্ভব না হলে পৌণে এক পল সোনা রাখবে। অর্থ থাকতে কৃপণতা

করা উচিত নয়। যেসব বস্তু নিজের প্রিয়, সেইসব বস্তু ব্রাহ্মণকে দান করা উচিত। কথা-পাঠকারী নিজ গুরুর সমতুল্য, সুতরাং তাঁকে সর্বদা ভক্তিপূর্বক সন্তুষ্ট রাখা উচিত। সেই সময় সমস্ত দেবতা এবং ভগবান নর-নারায়ণের কীর্তন করা উচিত। তারপর উত্তম ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ জানিয়ে মালা-চন্দনে বিভূষিত করে তাঁদের নানাপ্রকার মনোবাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করা কর্তব্য এবং নানাপ্রকার ছোট বড় প্রয়োজনীয় বস্তু দিয়ে তাঁদের সন্তুষ্ট করা উচিত। এরূপ করলে মানুষ অতিরাত্র যজ্ঞের ফল লাভ এবং প্রত্যেক পর্বের সমাপ্তির পরে ব্রাহ্মণের পূজা করলে শ্রোতা যজ্ঞের ফল লাভ করে। কথা-পাঠকারীর বিদ্বান হওয়া আবশ্যক এবং প্রত্যেক পদ, অক্ষর এবং স্বর স্পষ্ট উচ্চারণ করে মহাভারতের কথা শোনানো উচিত। সম্পূর্ণ কথা সমাপ্ত হলে সৎব্রাহ্মণদের ভোজন করিয়ে তাদের যথাবৎ দক্ষিণা প্রদান করবে। পরে বক্তাকেও বস্ত্র ও অলংকার দ্বারা বিভূষিত করে উত্তম আহার পরিবেশন করবে। কথক সন্তুষ্ট হলেই উত্তম আনন্দ লাভ হয়। ব্রাহ্মণরা সন্তুষ্ট হলে শ্রোতার ওপর সমস্ত দেবতা প্রসন্ন হন ; তাই সাধুস্বভাব শ্রোতাদের উচিত, তাঁরা যেন ন্যায়সম্মতভাবে ব্রাহ্মণদের সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ করে তাঁদের যথোচিতভাবে পূজা করেন।

রাজন্ ! তোমার জিজ্ঞাসা অনুসারে আমি মহাভারত শোনার এবং তার পারায়ণ করার বিধি-নিয়ম জানালাম। এতে শ্রদ্ধা কোরো এবং যদি নিজের পরম কল্যাণ চাও তাহলে সর্বদা যত্ন সহকারে এটি পালন করতে থাকো। মানুষের সর্বদাই মহাভারত শ্রবণ ও কীর্তন করা উচিত। যার গৃহে মহাভারত গ্রন্থ থাকে, তার সর্বদা জয় হয়। ভারত পরম পবিত্র গ্রন্থ, তাতে নানাপ্রকার উপাখ্যান আছে। দেবতারাও ভারতগ্রন্থ পাঠ করেন। ভারত পরমপদস্বরূপ। এটি সকল শাস্ত্রের মধ্যে উত্তম। এর দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়—এটি আমি সত্য করে জানাচ্ছি। মহাভারত-ইতিহাস, পৃথিবী, গাভী, সরস্বতী, ব্রাহ্মণ এবং ভগবান বাসুদেবের কীর্তনকারী মানুষ কখনো বিপদে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। জনমেজয় ! বেদ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদির আদি-মধ্য ও অন্তে সর্বত্র ভগবান নারায়ণেরই যশগান করা হয়েছে। মহাভারতে নারায়ণের দিব্য কথাসমূহ এবং সনাতন শ্রুতি সমাবিষ্ট। যে ব্যক্তি পরমপদ লাভ করতে চায়, তার সর্বদা এগুলি শ্রবণ করা উচিত। মহাভারত পরম পবিত্র, ধর্মের স্বরূপ সাক্ষাৎ কারক এবং সর্বপ্রকার গুণসম্পন্ন। কল্যাণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের সর্বদা এটি অবশ্য শ্রবণ করা উচিত। মহাভারত শ্রবণের দ্বারা কায়-মনো-বাক্যে সঞ্চিত সমস্ত পাপ এমনভাবে নষ্ট হয়, যেমন সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয়ে থাকে। অষ্টাদশ পুরাণ শ্রবণে যে ফল হয়, তার সমস্ত ফল ভগবদ্ভক্ত পুরুষ শুধু মহাভারত শ্রবণ করলেই প্রাপ্ত হয়। নারী হোক বা পুরুষ, এর শ্রবণের দ্বারা সকলেই বৈষ্ণব পদ লাভ করে। শাস্ত্রোক্ত ফল প্রাপ্তির কামনাকারী ব্যক্তির উচিত, মহাভারত শ্রবণের পর বক্তাকে সোনার পাঁচটি সিকি দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করা এবং নিজ শক্তি অনুসারে কপিলা গাভীর শিং স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত করে তাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করে গো-বৎসসহ বক্তাকে দান করা। এরদ্বারা শ্রোতা কল্যাণ লাভ করে। এতদ্ব্যতীত বক্তার জন্য দুই হাতে বালা, কানের কুণ্ডল এবং ধন প্রদান করা উচিত। রাজন্ ! বক্তাকে ভূমিদান করা অবশ্য কর্তব্য ; কারণ ভূমিদানের সমান আর কোনো দান নেই এবং হবেও না। যে ব্যক্তি সর্বদা মহাভারত শুনতে এবং শোনাতে থাকে, সে সর্বপাপ মুক্ত হয়ে বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হয়। শুধু তাই নয়, সে নিজের একাদশ পূর্বপুরুষ এবং নিজের স্ত্রী-পুত্রকেও উদ্ধার করে। মহাভারত শোনার পর তার দশাংশ হোম করাও প্রয়োজন। আমি এইভাবে তোমার কাছে সব কিছু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলাম।

॥ মহাভারত শ্রবণবিধি সমাপ্ত ॥